প্রথম প্রকাশ : ৭ অক্টোবর, ১৯৫৭

প্রকাশক : গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
চলতি দুনিয়া প্রকাশনী
৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-১২

মুদ্রক : অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
সমীক্ষা প্রেস
৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত
বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৯৪৮-১৯৪৯ সালে অধুনালুপ্ত 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় আমি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, নিজের নামে নয়, ছদ্মনামে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। 'মার্কসবাদী' পত্রিকা ছিল তৎকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগত পত্রিকা। প্রয়াত ভবানী সেন ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটি যদিও বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হতো, তার পরিচালনা ভার ছিল পলিট ব্যুরোর হাতে। পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে ভবানী সেন পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। শ্রীনিখিল চক্রবর্তী এবং আমি তাঁকে সাহায্য করতাম। আমার কাজ ছিল ইংরেজি প্রবন্ধের তরজমা করা, বাইরে থেকে তরজমা করিয়ে আনার ব্যবস্থা করা এবং ভিতর থেকে ছাপার কাজের তদারক করা।

আমরা তখন কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্রীয় দপ্তরে বাস করি। ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনি হবার পর কেন্দ্রীয় দপ্তর বোম্বাই থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। 'মার্কসবাদী'র সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল গোপন কেন্দ্রে কিন্তু তা ছাপা হতো প্রকাশ্যে। পার্টির প্রকাশনালয়ের সঙ্গে যুক্ত কমরেডরা বাইরে থেকে পত্রিকাটির ছাপার কাজের তদারক করতেন। 'প্রুফ' দেখার সুযোগ আমাদের প্রায়ই হতো না। এই রকম একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে হতো বলে পত্রিকাটিতে (বিশেষ করে প্রথম সংখ্যায়) অজস্র ছাপার ভুল থেকে যেত, এমনকি ছাড়ও থাকতো। তার ফলে অন্যদের কথা তো দূরে থাক, স্বয়ং লেখকের কাছেও অনেক সময় অর্থোদ্ধার করা দুরূহ হতো।

যাই হোক, পত্রিকাটির বিস্তৃত ইতিহাস এখানে না বললেও চলবে, কেননা আমার বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে তা হবে অবান্তর। মোটের উপর কথা, হলো এই যে আমার প্রবন্ধ দুটি তৎকালে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি নিয়ে মার্কসবাদী মহলে তখন তুমুল তর্ক বেধে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে পত্রিকার সম্পাদক ভবানী সেনকে এই বিতর্কে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

আমার প্রবন্ধটি (বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা) প্রকাশিত হয়েছিল 'মার্কসবাদীর' চতুর্থ সংখ্যায় (জুলাই ১৯৪৯)। পঞ্চম সংখ্যায় রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানীবাবু আমার বক্তব্যকে মোটের উপর সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন।* এই প্রবন্ধে বিতর্কের অবসান তো হয়ই না, বরং উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। সে-বিতর্কের ঢেউ এমনকি অ-মার্কসবাদী তথা মার্কসবাদ-বিরোধী মহলেও গিয়ে লাগে। পরবর্তীকালে তারা এমনকি নির্বাচনী প্রচারেও এই সাহিত্য-বিতর্ককে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে এবং কমিউনিস্টরা রবীন্দ্রনাথকে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে বলে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

যাই হোক, আমার দুটি প্রবন্ধে এবং ভবানীবাবুর রচনাটিতে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, তা নিয়ে উত্তেজনা অনেক দূর গড়ালেও, শেষ পর্যন্ত তার কোনো মীমাংসা হয়নি।

ভবানীবাবুর সম্পাদনায় মার্কসবাদীর সাতটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় আটমাস পরে পত্রিকাটির অষ্টম এবং শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, যতদূর মনে পড়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। এই সংখ্যায় পূর্ববর্তী সাতটি সংখ্যার বারোটি রচনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এগুলি ছিল তৎকালীন পলিট ব্যুরোর দলিল।

এখানে বলে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি বদল হয়, পূর্বতন নেতৃত্বও হয় পদচ্যুত। পূর্বতন নেতৃত্ব-রচিত দলিলগুলির প্রত্যাহার তাই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে 'মার্কসবাদী' পত্রিকাটিতে যেসব রচনা প্রকাশিত

* ৪নং মার্কসবাদীতে প্রকাশ রায় 'বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনায়' যা যা লিখেছেন তার সমস্ত খুটিনাটিই যে নির্ভুল তা নয়, কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঠিক। ('বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা' : রবীন্দ্র গুপ্ত, মার্কসবাদী, সংখ্যা ৫, সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)

হয়েছিল সে সম্পর্কে অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশকের বক্তব্যে বলা হয় এই সব বিষয় সম্পর্কে "এখনো আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ আছে। তাই এ অবস্থায় সেগুলির উপর কোনো সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।...আগামী সংকলন কবে প্রকাশিত হবে তার প্রতিশ্রুতি প্রকাশকের পক্ষে এনে (এখন ?) দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আগামী সংকলনে 'মার্কসবাদীর' পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির একটি বিস্তৃত সমালোচনা থাকবে।"

কিন্তু অষ্টম সংখ্যার পর পত্রিকাটির আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি, প্রতিশ্রুত সমালোচনাও তাই আর দিনের আলো দেখেনি। অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি অতএব অন্তত কাগজে কলমে আজও অমীমাংসিতই থেকে গেছে।

অবশ্য এই সব প্রশ্নের চিরকালের জন্য কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়া সহজ ছিল না, হয়তো সম্ভবও নয়। কেন নয় এই সংকলনের অন্তর্গত প্রথম প্রবন্ধ 'মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা'তে আমি তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে নতুন করে তাই আর প্রসঙ্গটির অবতারণা করলাম না।

তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা না হোক আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক এবং তাত্ত্বিকেরা মোটের উপর একটা ঐকমত্যে পৌঁচেছিলেন যে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটির অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ছিল ভুল।

ভবানীবাবু বা আমি কেউই রবীন্দ্রনাথকে 'আস্তাকুঁড়ে' বিসর্জন দিতে চাইনি, আমাদের লেখার মধ্যে এরকম কোনো উক্তি কেউই খুঁজে পাবেন না, আমরা রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে চিরকালের ঐতিহ্যভুক্ত করার কথাই বলেছিলাম। কিন্তু তা করতে গিয়েও আমরা যেভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে প্রসঙ্গচ্যুত করে বিচার করেছিলাম তাতে আমরা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলাম। রবীন্দ্রবিদূষণ আমাদের অভিপ্রেত না হলেও, কার্যত তাই হয়েছিল। ভবানীবাবু পরে রবীন্দ্র-ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। আমার সে সুযোগ হয়নি, যোগ্যতারও অভাব আছে। তাছাড়া কথায়ই আছে চুন খেয়ে মুখ তাতলে দই দেখে ভয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু লিখতেও এখন আমার ভয় হয়। আজ এই সুযোগে তাই কৃতকর্মের জন্য সকলের কাছে অকপটে মার্জনা ভিক্ষা করি। আমি সত্যিই গুরুনিন্দার পাতকে পাতকী। ক্ষমা-প্রার্থনা করি শ্রীগোপাল

হালদারের কাছে, যাঁর পাদমূলে আমার মার্কসবাদে দীক্ষা। ক্ষমা প্রার্থনা করি কবি বিষ্ণু দে'র কাছে যাঁর সাহিত্য এবং জীবন বিগত ত্রিশ বছরে আমাদের মূল্যায়নকে হীনতম মিথ্যা বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে।

নিজের সপক্ষে আমার একটিই মাত্র বলার কথা, ঐ প্রবন্ধ দুটি আমি যখন রচনা করি তখন আমার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ। পঞ্চাশ পেরিয়ে সেই পঁচিশ বছরের যুবককে আজ অর্বাচীন বলে মনে হতে পারে কিন্তু উষ্মা এবং অপরিণত বুদ্ধি তো যৌবনেরই ধর্ম। কালধর্মকে অস্বীকার করবো কী করে! তা ছাড়া যে সময় এবং যে-পরিবেশে ঐ প্রবন্ধ দুটি রচিত তাতে এই ভ্রান্তিবিলাস হয়তো ছিল অপরিহার্য। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাড়ে তখন বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের ভূত অনড় হয়ে চেপে বসেছিল। এই প্রবন্ধগুলি ছিল সেই ভূতের নৃত্যেরই ফলশ্রুতি। আর সে ভূত আমাদের ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ নেমেছে, এমনটা হয়তো সত্য নয়! আজ মনে পড়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীরণদিভে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ বসু দিনের পর দিন আমাদের বোঝাতেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারলে বাঙলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অরুণ বসু এখন রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন আর শ্রীরণদিভে এখন সি. পি. এমের কেন্দ্রীয় নেতা। তাঁরা এখন ঐসব লেখা সম্পর্কে কী মত পোষণ করেন জানি না।

তবে আমার মনে আছে, ভবানীবাবুর লেখাটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু লেখাটি যথেষ্ট বামপন্থী মনে না হওয়ায় রণদিভে রচনাটি কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন ইংরেজি তাত্ত্বিক পত্রিকা 'কমিউনিস্ট'-এ প্রকাশ করেননি।

তবে সবকথা বলা হয়ে যাবার পরও একটা কথা বাকি থেকে যায়। আমাদের লেখার প্রায় অধিকাংশে সিদ্ধান্ত একদেশদশী এবং ভ্রান্ত হলেও দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে লেখাগুলিতে কিছু নতুনত্ব ছিল। তার সবটাই বোধ হয় বর্জনীয় নয়। বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্য বিচারের প্রয়াস এই ছিল প্রথম। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম বাঙলার কৃষক বিদ্রোহগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তৃতীয়ত, সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ন সংশোধন করা হয় এবং এটা করা হয় এমন একটা সময়ে যখনও এ-বিষয়ে মার্কসের লেখাগুলি এদেশে অপ্রাপ্য ছিল।

তর্কের উত্তেজনায় এই সদর্থক দিকগুলি তখন অনেকেরই চোখে পড়েনি

(শুধু বিষ্ণু দে তাঁর 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে সংকলিত একটি প্রবন্ধে এর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন), স্নানের জল সহ শিশুটিকেও ফেলে দেওয়ার ঝোঁক তখন প্রবল ছিল। আজ দীর্ঘ সাতাশ বছরের ব্যবধানে সেই আবিলতা যদি কেটে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে শুভ লক্ষণই বলতে হবে।

ভূমিকায় এত কথা বলতে হলো এই কারণে যে সম্প্রতি আমাদের সেই সাতাশ বছর আগেকার বাতিল লেখাগুলি এক বন্ধু ধুলোঝেড়ে গ্রন্থাকারে বের করে আমাকে বিব্রত করেছেন। বন্ধুবর অনুমতি নেবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশেও লেখার স্বত্ব লেখকের, তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নয়। উৎসাহের আতিশয্যে বন্ধুবর সেকথা বিস্মৃত হওয়ায় বাধ্য হয়ে আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে হলো এবং এই ভূমিকা লিখতে হলো।

'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক রচনাটি কিছুকাল পূর্বে একটি নকশালপন্থী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু তারা প্রকৃত লেখককে সনাক্ত করে নি। অতএব আমার তরফ থেকে কোনো কিছু বলবার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু পূর্বোক্ত সংকলনে লেখককে সনাক্ত করায় আমার বক্তব্য বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বর্তমান সংকলন থেকেই পাঠকেরা দেখতে পাবেন আমি আমার পূর্বমত পরিবর্তন করেছি।

পূর্বমত এই সংকলনে পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত হলো। লেখা দুটিতে কোনই পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু ছাপার ভুল শুধরে দেওয়া হয়েছে নতুন পুনর্মুদ্রনের ভুল সহ।

মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব কি এবং কিছু আছে কিনা তা নিয়ে মার্কসবাদী মহলেই যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। বছর কয়েক আগে তৎকালীন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রজের গারোদী বলেছিলেন, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব বলে কিছু নেই।[১] তখন তাঁর এই উক্তি নিয়ে ফরাসী দেশের মার্কসবাদী মহলে তুমুল তর্ক বেধে গিয়েছিল। সে আলোচনার ঢেউ এদেশেও এসে পৌঁচেছিল মনে আছে।

গারোদীর মত অবশ্য তখন মার্কসবাদী মহলে গৃহীত হয়নি। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব বলতে ইতিমূলকভাবে ঠিক কি বোঝায় সে সম্পর্কে তাঁরা যে একমত হতে পেরেছিলেন তা নয়। স্তালিন আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাহিত্য ও চিত্রকলা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী সরকারি সমর্থন লাভ করেছিল ফরাসী মার্কসবাদী মহলে তা কখনও গৃহীত হয়নি। হলে পিকাসো কি এলুয়ারের জন্য ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির দরজা বন্ধ হয়ে যেত। দস্তয়েভস্কি এতকাল সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দিত হয়ে এসেছেন। অথচ যখনও স্তালিনের অভ্রান্ততা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তখনও ফিঙ্কেলস্টাইনের মতো আমেরিকান মার্কসবাদী সমালোচক এ-বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন।[২]

সব মার্কসবাদীর ব্যক্তিগত রুচি এক রকমের হবে এমন হাস্যকর দাবি যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন তাঁরা অবশ্য কখনও করেননি। কিন্তু এটা শুধু রুচির প্রশ্ন নয়—এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, এটা দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রশ্ন। কোনো একটা বিশেষ বই ভালো কি মন্দ তা নিয়ে দুজন মার্কসবাদী সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতে পারেন, তাতে বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। সাহিত্যে গণিতের নিয়ম চলে না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ নেই। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাও অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু কোনো একটা বিশেষ বই আর একটা বইয়ের থেকে ভালো স্বতঃসিদ্ধের মতো করে তা বলা যায় না। সাহিত্য কিংবা শিল্পের রস পেতে গেলে রসিক হতে হয়, অরসিকেষু রস নিবেদন নিষ্ফল। কথাটা যত বুর্জোয়া শোনাচ্ছে তা নয়, স্বয়ং মার্কসই বলেছেন 'the finest music has no meaning for an unmusical ear.' সাহিত্য বা শিল্পরুচি সহজাত নয়, অনুশীলন সাপেক্ষ। যেহেতু পরিবেশ এবং মেধার তারতম্য হেতু একের সঙ্গে অপরের রসগ্রহণ ক্ষমতার তারতম্য চিরকাল থাকবে, কোনো একটা বিশেষ বই ভালো কি মন্দ তা নিয়ে এক মার্কসবাদীর সঙ্গে অপর মার্কসবাদীর মতানৈক্যের সম্ভাবনাও তাই কোনোদিন বিলুপ্ত হবে না। কিন্তু যখন পিকাসো একই সঙ্গে মার্কসবাদী মহলে নিন্দিত এবং অভিনন্দিত হন, দস্তয়েভস্কির মধ্যে একদল প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই দেখেন না কিন্তু অন্যদল তাঁর মধ্যে strains of humanism দেখতে পান তখন সেই মতপার্থক্যকে শুধু ভিন্ন রুচির তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন ধরে নিতেই হয় শিল্প-সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড এবং পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলে যে মতবিরোধ আছে তা মৌলিক।

'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নীতিকে কোনো দেশের মার্কসবাদীই অবশ্য অস্বীকার করেন না কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, ব্যাখ্যা করেন ভিন্ন ভাবে। সম্প্রতি ফরাসী কবি ও কমিউনিস্ট লুই আরাগঁ তো স্পষ্টই বলেছেন, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ কাকে বলে? যদি এই প্রশ্নের শেষ ও চিরন্তন উত্তর চান তাহলে এবিষয়ে প্রচলিত সূত্রগুলিকে মুখস্থ করতে হবে। কার্যত দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ জিনিসটিকে হরেকরকমে ব্যাখ্যা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে এই নাম দিয়ে যা লেখা হয় তা একটু খেলো ধরনের বাস্তববাদ, কিংবা হয়তো মোটেই বাস্তববাদ নয়।' একই প্রবন্ধে অন্যত্র তিনি

লিখেছেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নই বলুন আর অন্যত্রই বলুন, আমি তর্কাতীত সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নই যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কোনো বিশেষ থিসিস প্রমাণিত বলে বিবেচ্য।'[৩]

দুই.

সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য অনিবার্য ছিল। মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন কেউই সাহিত্যিক ছিলেন না। মার্কস এবং এঙ্গেলস ইওরোপের নানা দেশের সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন এবং রসোপভোগ করেছিলেন। তাঁদের লেখার ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় বিধৃত আছে। লেনিন রুশ সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্য ততো পড়েছেন বলে জানা নেই। দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজে তাঁকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যবোধ যে গভীর ছিল তলস্তয়-প্রসঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'টিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যদিও মার্কসবাদের মহান প্রবক্তারা গভীর সাহিত্যবোধের অধিকারী ছিলেন, নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁরা কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করে যেতে পারেননি। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের নানা প্রাসঙ্গিক উক্তিকে একত্র করে পরবর্তীকালের মার্কসীয় তাত্ত্বিকেরা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের কাঠামো গড়ে তুলেছেন।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে আলোচিত হয়েছে শিল্পের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও স্বরূপ। এই অংশটি প্রধানত দর্শন ও ইতিহাসের এলাকাভুক্ত এবং তথ্যনির্ভর। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মার্কস এঙ্গেলস ও লেনিন যথেষ্ট আলোচনা করেছেন যা থেকে তাঁদের মতামত সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানের সাক্ষ্যনির্ভর মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের এই অংশ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ কম এবং মতভেদ প্রায় নেইও। কিন্তু তবু মতভেদের কিছু বীজ এই অংশেই আছে।

মার্কসের মতে উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে সমাজের ভিত্তি (base) আর শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি তার উপরিতল (superstructure)। সামাজিক অস্তিত্ব চৈতন্যের নিয়ামক। ভিত্তিতে পরিবর্তন হলে সে পরিবর্তন উপরিতলে সংক্রামিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উপরিতলও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু পরিবর্তনটা দুয়ে দুয়ে চারের মতো সহজ সমীকরণসূত্রে হয় না। A Contribution to

Critique of Political Economy-র ভূমিকায় মার্কস লিখেছেন: "In considering such transformations a distinction should always be made between material transformation of the economic conditions of production which can be determined *with* the precision of natural science, and the legal, political, religious, aesthetic or philosophic—in short ideological forms…" তার কারণ এঙ্গেলসের ভাষায় Political, juridical, religious, literary, artistic, etc, development is based on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic base. It is not that the economic position is the *cause and alone active*, while everything else only has a passive effect. There is rather interaction on the basis of economic necessity, which *ultimately* always asserts itself. [Engels : Letter to Heinz Starkenburg. Italics in original]

মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্য খুবই প্রাঞ্জল তবু এই তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে বিরোধ বাধে, বিরোধ বাধে ভিত্তি এবং উপরিতলের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া নিয়ে। যেহেতু এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ল্যাবরেটরিতে অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় বা নিক্তি দিয়ে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ওজন করেও দেখা যায় না, সেহেতু এ তর্কের মীমাংসা সুদূরপরাহত। এই কথাগুলি মনে রাখলে অবশ্য নৈয়ায়িক তর্ক এড়ানো যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় তর্কের উত্তেজনায় তা কারুরই মনে থাকে না।

উত্তেজনাটা হয় আবার প্রধানত সোভিয়েত সাহিত্যের উৎকর্ষের মূল্যায়ন নিয়ে। সোভিয়েত সাহিত্য ভালো কি মন্দ সে আলোচনায় আপাতত না গিয়েও বলা যায়—সোভিয়েত দেশ সমাজবাদী দেশ, সমাজবাদ পুঁজিবাদের চেয়ে ভালো অতএব সোভিয়েত সাহিত্য পুঁজিবাদী সাহিত্য অপেক্ষা ভালো—সোভিয়েত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এই ধরনের যুক্তিসোপান অনুসরণ করা হলে যুক্তিশাস্ত্রকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের দ্বিতীয় অংশ এই তত্ত্বের প্রয়োগবিধি। শিল্প-সাহিত্য-সমালোচনা-পদ্ধতিকে এই অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মার্কসের কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, এঙ্গেলসের কয়েকটি চিঠি ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের প্রবন্ধ কয়টি এবং তাঁর কিছু প্রাসঙ্গিক উক্তি এবং মন্তব্য এরই ভিত্তিতে পরবর্তীকালের মার্কসীয় তাত্ত্বিকেরা মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। মুশকিল বেধেছে এইখানেই। এইসব মন্তব্য এবং উক্তির মধ্যে অনেকগুলি যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। এইসব উক্তির মধ্যে অনেকগুলির কোনো তত্ত্বগত ব্যাখ্যা মার্কসবাদের মহান প্রবক্তারা দিয়ে যাননি। ফলতঃ এর মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁদের নিছক ব্যক্তিগত মতামত এবং কোনগুলি তাঁদের সুচিন্তিত তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত (formulation) তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন সাধু সন্ত ছিলেন না, তাঁরা কোনো ধর্মতন্ত্রের প্রবর্তন করেন নি, একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই প্রতিপাদন করেছেন সুতরাং তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমতকে তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক এইটেই করা হয়েছে বলে মনে হয়।

লুনাচারস্কির স্মৃতিকথা[8] থেকে জানা যায় লেনিন সঙ্গীত ভালবাসতেন, কিন্তু সঙ্গীত তাঁর মনকে বিষাদে ভরে দিত। তিনি একদিন বলেছিলেন, Of course it is a pleasure to hear good music, but imagine it distresses me. It seems to work on me too much. এই উক্তি নিশ্চয়ই লেনিনের ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করে। কিন্তু এই উক্তিকে নিশ্চয়ই কেউ তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করবেন না। তথ্য হিসাবে একথা সত্য লেনিন শিল্প সাহিত্যে 'মডার্নিস্টিক' আন্দোলন পছন্দ করতেন না। ক্লারা জেটকিনের কাছে তিনি স্পষ্ট বলেছিলেনও, I can not consider the product of expressionism, futurism, cubism and other isms the highest manifestation of artistic genius. I do not understand them. I did not find any joy in them. লুনাচারস্কি এবং লেনিনের আরও অনেক সহকর্মী বিমূর্ত বা মডার্নিস্টিক চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর অনীহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। লুনাচারস্কি লিখেছেন, His tastes were, however, definite. He loved the Russian classics, liked realism in literature, in painting and so on.

বিশ্বমানবের মুক্তিযজ্ঞের এই পুরোহিতের উৎসর্গিত জীবন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। এ-সব সংবাদ সে-কৌতূহল কিছুটা মেটায়। লেনিনের

মতো মহামানবের ব্যক্তিগত রুচিও নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়। তবুও তা ব্যক্তিগত রুচিই, তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত নয়।

লেনিন কাজের মানুষ ছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তিনি বিশেষ পেতেন না। লুনাচারস্কি লিখেছেন, Lenin was too busy all his life to take up art seriously and he always admitted himself a layman in this respect. As he had a horror for dilettanteism he was loath to express any opinion on art.

লেনিন যে কত বিনয়ী ছিলেন এই বর্ণনা থেকেই তা বোঝা যায় এবং এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মনে হয়, যারা পরবর্তীকালে চোখ রাঙিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের "সৎপথে" রাখতে চেয়েছেন লেনিনের বিনয়ের এক সহস্রাংশও যদি তাঁদের থাকত তাহলে সমাজবাদী তথা প্রগতিসাহিত্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হতো, বুদ্ধিজীবীদের একটা প্রভাবশালী অংশ হয়ত শ্রমিক শ্রেণীর থেকে দূরে সরে যেত না।

যিনি তলস্তয় প্রসঙ্গে অমন গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন, সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি "আনাড়ি" ছিলেন তা ভাবা যায় না। আসলে মডার্নিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর অনীহা এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর অপরিচয়ের ফলশ্রুতি।

কবি মায়াকোভস্কি ছিলেন 'ফিউচারিস্ট'। লেনিন তাঁর লেখা পছন্দ করতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে মায়াকোভস্কি সোভিয়েত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লুনাচারস্কি বলেছেন, লেনিন যদি মায়াকোভস্কির রচনার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেতেন, বিশেষ করে শেষের দিককার রচনার সঙ্গে, তাহলে 'কবিতায় কমিউনিজমের ক্ষেত্রে এই মহান মিত্রে'র সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবই পোষণ করতেন। লুনাচারস্কির প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে, লেনিন যদি নতুন শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলনের ধারাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার সুযোগ পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি মত পরিবর্তন করতেন।

মডার্নিস্ট আন্দোলনের সবটাই যে গ্রহণযোগ্য এমন কথা অবশ্যই বলা হচ্ছে না। মডার্নিস্ট আন্দোলন আজ আর তত মডার্ন নেই। এখন একথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে, তার মধ্যে অনেক আতিশয্য ছিল, অনেক ফাঁকির দিক ছিল,

স্বাভাবিক নিয়মেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবু এ-ও সত্য তার অনেক কিছু আবার চিরকালের ঐতিহ্যভুক্তও হয়েছে। যে-কোনো আন্দোলনের জন্মলগ্নে এমনটা হয়ে থাকে। প্রয়াস অনেকেই করে, সফল হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন। কিন্তু কে সফল হবে আর কে হবে না আগে থাকতে তা তো বোঝার উপায় নেই। কোন্ শিশু ভবিষ্যতে সুস্থ-সবল সচ্চরিত্র হয়ে উঠে দেশ ও দশের মুখোজ্জ্বল করবে আঁতুড়ে কে তা বুঝতে পারে? ভবিষ্যতে সে রুগ্ন হবে বা দুর্বৃত্ত হবে, এই ভেবে নবজাতককে কেউ গলা টিপে মারে না। নতুন প্রয়াসকে তাই প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখাই শ্রেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় লেনিনের অবর্তমানে যাঁরা সাহিত্যজগতের মার্কসীয় আইনপ্রণেতা হয়েছিলেন, লেনিনের সাহিত্যবোধ তাঁদের তো ছিলই না, পরন্তু তাঁদের অনেকেরই মধ্যে সেই বিনয় এবং সহিষ্ণুতারও অভাব ছিল। লেনিনের এইসব ব্যক্তিগত মতামত তাঁদের অনেকের হাতে যষ্টিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং একে ব্যবহার করে যে-কোনো নতুন প্রয়াসকে তাঁরা ডিম ফোটার আগে খোলার মধ্যে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এই একচক্ষু নীতির ফল মারাত্মক হয়েছে। মারাত্মক হয়েছে বলেই না সোভিয়েতরাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও শলোকভের মতো লেখককেও সোভিয়েত সাহিত্যের "ধূসর একঘেয়েমী" নিয়ে একদা আক্ষেপ করতে হয়েছে।[৫]

আশার কথা, আজ সোভিয়েত দেশে নতুন বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বরফ গলছে। আশা করা যেতে পারে সোভিয়েত সাহিত্যের উদ্যানে অতঃপর শত পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে এবং তার সবগুলি একরঙা গাঁদা ফুল হবে না। কিন্তু হায়, ভল্গা থেকে গঙ্গা অ-নে-ক দূর!

তিন·

মিন্না কাউটস্কি ও মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এঙ্গেলসের দুটি চিঠি এবং তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিনের প্রবন্ধগুলিকে মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনার চিরায়ত আদর্শ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমোক্ত চিঠি দুখানি উপন্যাসের সমালোচনা। কালপ্রভাবে উপন্যাস দুটি যদিও বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে, এঙ্গেলসের চিঠি দুটি ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা পেয়েছে মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির আদর্শ হিসেবে।

এই চিঠি দুটি থেকে মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা এই :

ক) মার্কসীয় সমালোচনা বস্তুতন্ত্রের অনুগামী। বস্তুতন্ত্র কি বস্তু তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন, "বস্তুতন্ত্র বলতে আমি বুঝি বর্ণনার যাথার্থ্যের উপরেও যথাযথ চরিত্রকে তার যথাযথ পারিপার্শ্বিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা।" (মার্গারেট হার্কনেসের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি)

খ) মার্কসবাদ সাহিত্যে উদ্দেশ্যবাদের নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু উদ্দেশ্যবাদ বলতে মার্কসবাদ কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য বোঝে না। ঈশকাইলাসের ট্রাজেডি, আরিস্টোফিনিসের কমেডি, দান্তে কিংবা সারভান্তেসের সাহিত্য যে অর্থে উদ্দেশ্যবাদী, এঙ্গেলস উদ্দেশ্যবাদ বলতে তাই বুঝিয়েছেন। উদ্দেশ্যবাদ বলতে এঙ্গেলস্ কোন নগদ প্রাপ্তির ধারণা বোঝাননি। তাই তিনি লেখেন, "লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের গুণগানের জন্য খাঁটি সমাজবাদী উপন্যাস, আমরা জার্মানরা যাকে বলি tendenzroman, না লেখবার জন্য আমি আপনার দোষ ধরছি না।" (পূর্বোক্ত পত্র)

গ) মার্কসবাদ মনে করে সজ্ঞানে লেখকের মতবাদ যাই হোক, নিজের রচনায়, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে লেখক নিজের মতবাদকেই খণ্ডন করতে পারেন। যেমন করেছিলেন বালজাক। সজ্ঞানে তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রী কিন্তু বস্তুতন্ত্রের এমনই ধর্ম যে তিনি 'তাঁর শ্রেণী সহানুভূতি ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।' এঙ্গেলসের মতে এইটেই হলো 'one of the greatest triumphs of realism.'

ঘ) মার্কসবাদ aesthetic dissociation-এর তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর রচনা থেকে লেখক নিজেকে যে পরিমাণে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন শিল্প-সাফল্য ততো পরিমাণেই তার করায়ত্ত হবে। লেখকের bias ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে, এইটাই বাঞ্ছনীয়। আলাদা করে তা বলবার দরকার নেই। তাতে শিল্পসিদ্ধি ব্যাহত হয়। "যে সব সামাজিক সংঘাত রূপায়িত হয়েছে তার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান পাঠকের উপর চাপিয়ে দিতে লেখক বাধ্য নন।" বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজের কথা উল্লেখ করে এঙ্গেলস বলেছেন এই সমাজে পাঠকগোষ্ঠী যেহেতু মোটের উপর বুর্জোয়া চক্রের লোক তাই 'a socialist biased novel fully achieves its puropse, in my view, if by conscientiously describing the real mutual

relations, breaking down conventional illusions about them, it shatters the optimism of bourgeois world, instills doubt as to the eternal character of the existing world although the author does not offer any definite solution or does not even line up openly on any particular side. (Letter to Minna Kautsky)

যাঁরা দাবি করেন যে কোনো গল্প উপন্যাসের শেষে উত্থাপিত সমস্যার 'ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান' (future historical solutions) একটা জুড়ে দিতেই হবে, গল্প শেষ করতে হবে আশাবাদের সুরে, লেখককে কোন-না-কোন পক্ষে যোগ দিতেই হবে, এবং এই দাবি করেন মার্কসবাদের নামে, ভাবতে অবাক লাগে, মার্কসবাদের প্রবর্তকদের মতের সঙ্গে তাঁদের মতের কতনা তফাৎ।

তলস্তয়-প্রসঙ্গে সাতটি রচনায় লেনিন মোটের উপর এঙ্গেলসের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। তিনিও তলস্তয়ের সৃষ্টিশীল সাহিত্য এবং তাঁর সজ্ঞান মতবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করেছেন। লেনিনের মতেও সাহিত্য বাস্তবজগতের প্রতিফলন। তিনি তলস্তয়ের সাহিত্যকে রুশীয় বিপ্লবের দর্পণ বলে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে তৎকালীন রুশিয়ার সবলতা ও দুর্বলতা, উভয় দিকই প্রতিফলিত হয়েছে। লেনিনের এই রচনাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে। লেনিন বলেছেন, "And if the artist we are discussing is really a great artist he must have reflected at least some of the important aspects of the revolution in his works." যথার্থ মহৎ শিল্পীর রচনায় বিপ্লবের কোন-না-কোন গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিফলন থাকবেই।[৬]

লেনিনের রচনা কটি একটু সতর্কভাবে পাঠ করলেই দেখা যাবে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার নিরসন করে সঠিক মার্কসীয় সমালোচনাপদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই তিনি ওগুলি লিখেছিলেন। অর্থাৎ লেনিনের রচনাগুলি স্পষ্টতই polemical এবং সেই কারণেই এক একটি রচনার এক একটি বিশেষ দিকের উপর জোর পড়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা জোর দিয়েই বলা যায়, তিনি এ-ব্যাপারে মোটের উপর এঙ্গেলস্ প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন।

মার্কসীয় সমালোচনা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অবদান এই যে শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তা একটা বিষয়মুখ (objective) মানদণ্ড সৃষ্টি করতে পেরেছে। সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন, ধ্রুপদী

সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে বহিরঙ্গে মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির অনেক মিল অছে কিন্তু মৌলিক অমিলটা অন্তরঙ্গে, মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে। সমাজের প্রেক্ষিতে সাহিত্যসমালোচনার রীতি মার্কস-এঙ্গেলসের আগেও ছিল, কিন্তু মার্কসবাদ তাতে এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি যোগ করেছে যে শিল্প-সাহিত্যের অনেক গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছে।

শিল্পীর সজ্ঞান মতবাদ তার সৃষ্ট সাহিত্যে খণ্ডিত হতে পারে, এঙ্গেলসের এই মত নিয়ে পরবর্তীকালে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।[৭] কেউ কেউ বলেছেন, এঙ্গেলসের এই সূত্র অতীত কালের সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। হালের সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এ-সূত্র অচলিত (obsolete) হয়ে গেছে। এখন দলভাগ (Polarisation) সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আর শিল্পীর আপাত-বৈপরীত্য সম্ভব নয়। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, "মার্কসবাদের প্রত্যন্তবাসী পণ্ডিতদের অনেকে এঙ্গেলসের এই সূত্রটিকে সাহিত্যবিচারের একটি এঙ্গেলীয় নিয়ম মনে করেন··· কিন্তু বালজাক প্রসঙ্গে এঙ্গেলস কি কোনো সাধারণ নিয়ম জারী করেছিলেন ? নিজের ইডিওলজির বিরুদ্ধে গিয়েও শিল্পী রিয়েলিস্ট সাহিত্য রচনা করতে পারেন, এঙ্গেলস্ এই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের স্বকল্পিত এঙ্গেলস্‌বাদীরা এই সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তায় পরিণত করে ফেলেছেন।" (অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র : মার্কসীয় আর্টতত্ত্ব ও লেখকের স্বাধীনতা, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৬৬)[৮]

জানি না এই 'স্বকল্পিত এঙ্গেলসবাদীরা' কারা। কিন্তু একথা শিশুতেও জানে, সমাজবিজ্ঞান বা শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো নিয়মই নিশ্চয় করে প্রতিপাদন করা যায় না; সম্ভাবনার কথাই বলা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই সম্ভাবনার কি এখন আর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই ? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে লক্ষণীয় যে শ্রীমিত্র এঙ্গেলসের প্রতিপাদ্যটিকে ঠিক উল্টো করে হাজির করেছেন। এঙ্গেলস বলতে চেয়েছেন, শিল্পী যদি রিয়েলিস্ট হন তাহলে তিনি তাঁর সজ্ঞান মতবাদকে তাঁর সাহিত্যে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে খণ্ডন করতে পারেন। রিয়েলিজমের এইটাই সবচেয়ে বড়ো জয়। এটা মোটেই 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' জাতীয় তর্ক নয়। শ্রীমিত্র এঙ্গেলসের সূত্রটিকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন তাতে এই 'আপাত বৈপরীত্য' একটা সচেতন প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। বালজাক যেন সজ্ঞানে নিজের মতবাদকে

খণ্ডন করে রিয়েলিস্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। এঙ্গেলস্ কিন্তু মোটেই তা বলতে চাননি। এঙ্গেলস্ বলেছেন, বালজাক যেহেতু রিয়েলিস্ট ছিলেন, বাস্তব সম্পর্কগুলি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন তাই তার লজিকেই তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে তাঁর সজ্ঞান মতবাদের খণ্ডন। সাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায় যে লেখকের সজ্ঞান অভিপ্রায় তাঁর সাহিত্যে খণ্ডিত হয়েছে। মিলটন তাঁর কাব্যে Ways of God-এর যথার্থতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রমাণ করে বসেছিলেন ways of man-এর যথার্থতা।

এঙ্গেলসের সূত্রে অনুস্যূত আছে সাহিত্যবিচারের একটা বিষয়মুখ নিরিখ (objective criterion)। এই নিরিখ অনুসারে কী লেখা হয়েছে তাই বিচার্য, কে লিখেছে বা তার রাজনৈতিক মতামত কী তা বিচার্য নয়, যদিও এই সংবাদগুলি অনেক সময় লেখকের সীমাবদ্ধতা বা অগ্রগামিতার কারণ ব্যাখ্যার সহায়ক হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট-বিরোধী কোন কাজ করলে কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চয়ই তাঁর সমালোচনা করতে পারে। কিন্তু তাঁর গল্প-উপন্যাসের সমালোচনা করতে গেলে তিনি কী লিখেছেন, তাই বিচার্য হবে। সমাজতন্ত্রের দেশে তথাকথিত 'বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন' কোনো লেখককে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার অবাধ স্বাধীনতা দিলে তিনি যে সমাজতন্ত্র-বিরোধী সাহিত্যই রচনা করবেন, এ তত্ত্ব কার্যকারণ সূত্রে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ হয়নি। কিংবা কোনো অকমিউনিস্ট তথা 'বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন" লেখক কমিউনিস্ট-বিরোধী উপন্যাস লিখলেই এঙ্গেলসের 'আপাত বৈপরীত্য' তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেল বলে প্রমাণিত হয় না। 'আপাত বৈপরীত্য' তত্ত্বের একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। এই তত্ত্ব বাতিল বলে প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে এই বাস্তব ভিত্তি এখন অবলুপ্ত হয়েছে।

কী সেই বাস্তব ভিত্তি? মার্কস দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের পরিপন্থী। 'The system developed by capitalism and capitalism's effect upon men do not inspire outbursts of poetry in praise of the system. A profound realistic portrayal of capitalist relations by a great writer cannot but be a critical portrayal, just as a great poet cannot endorse the system in terms of poetical creation. A profoundly realistic portrayal of reality must inevitably

become critical whether the author so desires it or not. Such a work may be circumscribed in many ways, it may not reach its full artistic value, yet it cannot but be critical (M. Rosenthal : Vulgar Sociology and Metaphysics)[৯], এই কারণেই গর্কি বলতেন, সত্যিকারে শিল্পী দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, 'prodigal sons of their class.' এই কারণেই লেনিন বলেন সত্যিকারের মহৎ শিল্পী বিপ্লবের কোনো-না-কোনো দিক তার সাহিত্যে প্রতিফলিত করবেনই।

সমাজতন্ত্রী দেশের পক্ষে কী ভালো আর কী মন্দ সে-কথা হচ্ছে না,—কিন্তু পুঁজিবাদী দেশে কি উৎপাদন-ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে তা এখন শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছে? পুঁজিবাদ কি এমন সংস্কৃত হয়ে উঠেছে যে অতীতে যে নীচতা, দীনতা, স্বার্থান্ধতা, অর্থগৃধ্নুতা শিল্পীকে প্রচলিত ব্যবস্থার সমালোচক করে তুলত তা এখন অন্তর্হিত হয়েছে? শিল্প-সাহিত্য কি পণ্যের অধিক মর্যাদা পাচ্ছে। যাঁরা বলেন 'আপাত বৈপরীত্য তত্ত্ব' এখন অচলিত হয়ে গেছে তাঁদের একথা প্রমাণ করতে হবে।

তাছাড়া আপাত বৈপরীত্য তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেছে বললে আমরা কয়েকটি আজগুবি অনুসিদ্ধান্তের (corollery) সম্মুখীন হই। যথা: (ক) কোনো কমিউনিস্টকে তাঁর লেখায় কমিউনিজম নেই বলে সমালোচনা করা যাবে না। যেহেতু সে কমিউনিস্ট, সে যাই লিখবে তাই হবে খাঁটি কমিউনিজম। (খ) যদি কোন কমিউনিস্টের লেখায় এমন কিছু পাওয়া যায় যা খাঁটি কমিউনিজম নয় তাহলে আপনা থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে সে কমিউনিস্ট নয়। তা না হলে বলতে হয় আপাত বৈপরীত্য তত্ত্ব অন্যদের সম্পর্কে অপ্রযোজ্য হলেও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। (গ) রাজনৈতিক ভাবে যারা কমিউনিস্ট নয় বা কমিউনিজমের বিরোধী তাদের পক্ষে এমন কোনো সাহিত্য বা শিল্প রচনা করা সম্ভব নয় যা প্রগতিবাদী তথা কমিউনিস্টদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। সাহিত্যিক যদি ক্যাথলিক হন তিনি কেবল ক্যাথলিক সাহিত্যই লিখতে পারেন।

প্রশ্ন হচ্ছে গ্রেহাম গ্রীন তো ক্যাথলিক এবং কমিউনিজমের বিরোধী তার বই তাহলে কেন সোভিয়েত দেশে ছাপা হচ্ছে?

চার.

এঙ্গেলসের আপাত বৈপরীত্যের তত্ত্বকে যারা বাতিল করতে চান তাঁদের

যুগের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে পার্টিজান সাহিত্যের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব থেকেই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বেরিয়ে আসে সাহিত্যে পার্টি লাইনের শ্লোগান। লেনিনের নামকে এই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে একে এতদিন বিচারের অতীত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মার্কসবাদের কোনো তত্ত্বই বিচারের অতীত মর্যাদা পেতে পারে না। মার্কসবাদ কতগুলি সংস্কারের সমষ্টি নয়, একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, কর্মনীতি ও জীবনদর্শন। তার প্রতিটি প্রতিপাদ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কসবাদের মহান প্রবর্তকেরা বারে বারে বলেছেন যে সব তথ্য তখনকার দিনে তাঁরা পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। আরও নতুন তথ্য পাওয়া গেলে বা পুরনো তথ্য ভুল বলে প্রমাণিত হলে তাঁদের সিদ্ধান্তেরও সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। মার্কসবাদ ভক্তিবাদ নয়, গুরুবাদ নয়, যুক্তিবাদ। একটা সূচের ফুটো দিয়ে কজন দেবদূত গলে যেতে পারে মার্কসীয় তত্ত্বালোচনা এ-ধরনের অর্থহীন অলস গবেষণাও নয়। এ আলোচনা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, জীবনের দাবি থেকেই উদ্ভূত। তাই এর প্রয়োজন আছে। এ-সব অবশ্যই পুরনো কথা এবং বহুজন বহুবার এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এ সব কথা আমরা বেমালুম ভুলে যাই। কোনো তত্ত্ব যুক্তি দিয়ে বিচারের প্রয়াস হলেই আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি এবং কটু-কাটব্য বর্ষণ করতে থাকি। ফলত অপ্রিয় পরিস্থিতির ভয়ে আমরা কেউই মুখ খুলতে চাই না। মুখ যদি বা খুলি 'শতং বদ মা লিখ' —নীতি অনুসরণ করি। এ-অবস্থার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পার্টিজান সাহিত্যের তত্ত্বটি সম্পর্কে মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যে সংশয়ের অন্ত নেই। কিন্তু দশ-পনেরো বছরের মধ্যে প্রকাশ্যে এ-নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। একমাত্র রজের গারোদী এক সময় বলেছিলেন সাহিত্যে কোনো পার্টি লাইন থাকতে পারে না। আবার অনেকে দেখেছি পার্টি লাইনের তত্ত্বটা মেনে নিয়ে তাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে 'পার্টি লাইন' কথাটা কয়েকটি অর্থহীন অক্ষরের সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি মনে করি তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক পাশ কাটিয়ে যাওয়ার নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। সমস্যাটির সরাসরি মোকাবিলা করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো এঙ্গেলস যাকে উদ্দেশ্যমূলক (tendentious)

সাহিত্য বলেছেন, পার্টিজান সাহিত্য বলতে তা বোঝায় না। পার্টিজান সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' নামে লেনিনের সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে লেনিন বলেছেন, সাহিত্যকে হতে হবে পার্টি সাহিত্য। "যে মহান এক এবং অবিচ্ছেদ্য সোস্যাল ডেমোক্রাটিক যন্ত্রবিশেষকে চালনা করছে সামগ্রিক শ্রমিক শ্রেণীর সমগ্র সচেতন অগ্রগামী বাহিনী সেই যন্ত্রের ছোট্ট একটি চাকা বা ছোট্ট একটি স্ক্রুতে পরিণত হোক সাহিত্য।"[১০] বলা হয়েছে, এই প্রবন্ধে এঙ্গেলসের উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে লেনিন পার্টিজান সাহিত্যের তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। অতঃপর কেউ যদি এঙ্গেলসের উদ্দেশমূলক সাহিত্যের তত্ত্বকেই আঁকড়ে থাকেন তিনি হবেন প্রগতিবিমুখী।[১১]

কবে থেকে লেনিনের এই প্রবন্ধটি সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে জানা নেই। তবে একথা জানা আছে লেনিন এ-প্রবন্ধে সাহিত্য বলতে রাজনৈতিক সাহিত্যের কথাই বলেছিলেন। প্রবন্ধটির নামই তার সাক্ষ্য দেবে। লুনাচারস্কি যিনি মনে করেন এই প্রবন্ধটি আর্টিস্টিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তিনিও লিখেছেন, What brought about this essay was the desire to put in order the political literature of the party, its journals, scientific publications etc.[১২] লুনাচারস্কির এই বিবরণ সে সত্য প্রবন্ধটি ভালো করে পড়লেই তা দেখা যাবে। প্রবন্ধটিতে ফর্ম এবং কন্টেন্ট ইত্যাদি প্রসঙ্গ অবশ্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে এখানে তিনি পার্টির রাজনৈতিক সাহিত্যের উপর পার্টির নিয়ন্ত্রণের কথাই বলেছেন। প্রবন্ধের এক জায়গায় লেনিন স্পষ্টই লিখেছেন, In the first place we are speaking of Party literature and its subjection to Party. এই লেখাটি বরং প্রমাণ করে এমন কি রাজনৈতিক সাহিত্যের ব্যাপারেও লেনিন যথেষ্ট সহনশীল ছিলেন।

যাই হোক, এ-প্রবন্ধটিকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিষয়ে লেনিনের প্রামাণ্য মত বলে গ্রহণ করা যায় না। এই প্রবন্ধটি লেনিন লিখেছিলেন ১৯০৫ সালে। কিন্তু তলস্তয় প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল ১৯০৮ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে। সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের সুচিন্তিত মতামত এই শেষোক্ত প্রবন্ধগুলিতেই পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে লেনিন স্পষ্টতই এঙ্গেলসের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই প্রবন্ধগুলি এবং এঙ্গেলসের পূর্বোক্ত চিঠি

দুটিতে অনুসৃত সমালোচনা পদ্ধতিই মার্কসীয় সমালোচনা পদ্ধতির আদর্শ।

লক্ষণীয়, সাহিত্যে কোন পার্টি লাইনের কথা লেনিনের উপরোক্ত পার্টি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধটিতেও নেই। বরং লেনিন যে সাহিত্যক্ষেত্রে শাসন-তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এ-কথা অনেকেরই জানা আছে গর্কি একাধিকবার এমন সব কাজ করেছেন বা মত প্রকাশ করেছেন যা নিশ্চয়ই পার্টিবিরোধী। কিন্তু লেনিন তাই বলে গর্কিকে হেনস্তা করেননি। তিনি সমালোচনা করেছেন আবার বন্ধুত্বের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। শত বিচ্যুতি সত্ত্বেও লেনিন মুক্তকণ্ঠে গর্কিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন 'প্রলেতারিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি' বলে। গর্কিকে পার্টি পত্রিকার কাজে লাগাবার প্রস্তাব এলে লেনিন ইতস্তত করেছেন। লুনাচারস্কির কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'When a man is busy with some large, serious work, and being taken away from it on trivialities, on newspaper work, on journalism, would hurt that work—it would be foolish, nay criminal, to disturb him and tear him away from it! This I know very well.'[১৩] এই চিঠি যিনি লিখতে পারেন সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে কতটা শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তা বোঝাবার জন্য বাগবিস্তারের প্রয়োজন হয় না। দুঃখের বিষয় লেনিনের মৃত্যুর পর সাহিত্য সম্পর্কে এই উদার নীতি ক্রমশ বর্জিত হয়েছে। তার ফল যে ভালো হয়নি নিতান্ত চক্ষুহীন ছাড়া আজ তা আর সকলের কাছেই স্পষ্ট।

পাঁচ.

সাহিত্যে সংকীর্ণ অর্থে কোনো পার্টি লাইন থাকতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাহিত্য মতাদর্শ নিরপেক্ষ। এই প্রবন্ধের তা বক্তব্য নয়। মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিশ্চয়ই তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে দেখবেন, বিচার করবেন, বুঝবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সাহিত্যে নিশ্চয়ই তার বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রতিফলন থাকবে। এই অর্থেই তাঁর সাহিত্য হবে উদ্দেশ্যমূলক, পার্টিজান। সাহিত্যের পার্টিজানত্ব মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের অন্তরঙ্গে। মতাদর্শ প্রচারের জন্যই যে সাহিত্য রচনা করা হয় অনেক সময়ই তা হয় নিকৃষ্ট সাহিত্য। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তেমন সাহিত্য কোনো কোনো সময় রচনা

করবার দরকার হতে পারে কিন্তু তাকেই সৃষ্টিশীল সাহিত্যের চরম আদর্শ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

সাহিত্যবিচারে সহনশীলতার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে আরাগঁ যা বলেছেন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রবন্ধ শেষ করব। আরাগঁ বলেছেন: সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা একটু চওড়া রকমের। আমার বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের এই ভাবে চলা উচিত যাতে অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছেদ না ঘটে, যাতে জাতীয় সাহিত্যের ক্রমান্বয় সংরক্ষিত হয় এবং অন্যান্য প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে তার সম্পর্ক দাক্ষিণ্যযুক্ত হয়। এটা না করতে পারলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের দিকে, সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে পারবে না; তা হয়ে রইবে একটি সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতী শিল্পকলা এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে তা এমন সাহিত্য ও শিল্পকৃতি সৃষ্টি করতে পারবে না যার ধাপ বেয়ে আমরা ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হতে পারি।

"বুঝতে পারছি যে আমার এই সব কথার এমন ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব যে এতে করে কমিউনিজম সংগ্রাম বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম, তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা একেবারেই অননুমোদনীয়। তাই সবিনয়ে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Cahiers du Communisme পত্রিকায় প্রকাশিত এবং আংশিকভাবে 'প্রাভদা' কাগজে পুনর্মুদ্রিত লর্ঁ। কাসানোভার একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই:

...পার্টি একথা জানে যে ফ্রান্সের মতো দেশে পার্টি যদি প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে একটি অদ্বিতীয় মার্কসীয় ভাবসমষ্টিতে পর্যবসিত করে বা করেছে বলে মনে হয়, তাতে বিপদ ঘটবে। তার ফলে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিক্রিয়তা প্রগতিশীল ভাবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে ভাববিনিময় পরস্পরের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, তার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। অনেক কমরেড অপরের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করতে খুবই রাজী। কিন্তু এই রাজনৈতিক মৈত্রীর কাঠামোর মধ্যে কোনোরূপ ভাববিনিময় করতে তাঁরা যেন নারাজ বলে মনে হয়। তাঁরা রাজনীতিকে ভাবাদর্শ থেকে কৃত্রিম উপায়ে আলাদা করে ফেলেন, যেমনটি করেন সুবিধাবাদীরা অপরাপর উদ্দেশ্যে। পার্টি এটা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে যে মার্কস যে কাজটি কদাচ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে অবিকল সেই কাজটি করাই হয়েছে পার্টির দোষ: অর্থাৎ কিনা সারা জগতের সামনে তত্ত্ববাগীশরূপে নিজেদের দাঁড় করিয়ে এই বলে চেঁচানো; 'ইহাই সত্য। বিশ্বজন, নতজানু হও।'

"আমি এই প্রবন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে কাসানোভার চিন্তাধারার খুব বেশি অমিল নেই।...কারা কারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, তাদের একটা তালিকা রচনার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ "ইউনিয়ন" নয় এবং এতে আপনার "যোগদান" অসম্ভব। এই ভুল ধারণাও আপনাকে ছাড়তে হবে, কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্ভব। তারপর একথাও ঠিক যে, যাঁরা নিজেদের গায়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের টিকিট লাগিয়ে দেন না, যাঁরা এর নিন্দা করেন তাঁদের রচনাতেও সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের মূল জিনিসটি থাকতে পারে, যদিও অন্যান্য বিপরীত ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে।

"সুতরাং ব্যাপারটাকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। আমরা সমাজ-তন্ত্রের যুগের লেখক একথা জানি বা নাই জানি, আমাদের কাজের স্টাইলটা কি হবে, কিভাবে লিখব তার নানা পথের বাছবিচার করে যেটিকে চাই বেছে নিতে আমরা অবশ্যই পারি। কিন্তু যেপথই অবলম্বন করি না কেন, যদি লেনিনের এই তত্ত্ব সত্য হয় যে আর্ট জীবনেরই প্রতিফলন—এবং আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, তাহলে আমাদের ভিতর দিয়ে অবশ্যই আমাদের নিজেদের যুগটাই প্রতিফলিত হচ্ছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কখনও হয়তো বাঁকাচোরা ভাবে, এমন কি উদ্ভটভাবে, আমাদের লেখার ভিতর দিয়ে সমাজ-তন্ত্রের দিকে মানব অভিযানই প্রতিফলিত হচ্ছে।" (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৬৬)

আমার যা বক্তব্য ছিল তা এত ভালো করে আমি বলতে পারতাম না, তাই একটু বিস্তৃতভাবেই আরাগঁ-র লেখা এখানে উদ্‌ধৃত করলাম।

টীকা

১. হয়তো তাঁর দলত্যাগের সূচনা হয়েছিল তখন থেকেই।
২. Finkelstein : Art and Society.
৩. নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, লুই আরাগঁ, পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬৬
৪. Lunacharsky : Lenin on Art and Literature

৫. Jack Lindsay : Problems of Soviet Writers, World News, Nos. 6 & 7. 1955

৬. Lenin : Leo Tolstoy as the Mirror of Russian Revolution

৭. 'সোশিওলজি অব লিটারেচার অ্যাণ্ড ড্রামা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থে জর্জ স্টাইনার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সাহিত্য বিষয়ে এঙ্গেলস এবং লেনিনের মত পরস্পরের বিরোধী।

৮. প্রবন্ধটির আরও অনেক প্রতিপাদ্য বিতর্কমূলক। কিন্তু তার আলোচনার স্থান এখানে নেই।

৯. Literature and Marxism—A Controversy : Edited by Angel Flores

১০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তরজমা

১১. লুকাচকে একদা এই অভিযোগ শুনতে হয়েছিল। Josef Revai : Lukacs and Socialist Realism পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১২. Lunacharsky : Lenin on Art and Literature

১৩. Lunacharsky : Lenin on Art and Literature.

লেনিনের সাহিত্য-চিন্তা প্রসঙ্গে

লেনিন ছিলেন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। লেনিনের সহকর্মী লুনাচার্স্কির স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি, তাঁর সাহিত্যরুচি ছিল বিশিষ্ট ধরনের। তিনি ছিলেন রুশ ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুরাগী, সাহিত্য চিত্রকলা ও নাটকে বস্তুতন্ত্রই ছিল তাঁর কাম্য।

লেনিনের সহধর্মিণী নাদেঝদা ক্রুপসকায়া সাইবেরিয়া যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন পুশকিন, লেরমন্তফ ও নেকরাসোভ-এর বই। লেনিন সেগুলি তাঁর বিছানার কাছে সাজিয়ে রেখেছিলেন হেগেল-এর বইয়ের পাশে। সন্ধ্যায় বারবার করে তিনি বইগুলি পড়তেন। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন পুশকিন।

ক্লারা জেটকিন-এর লেখা থেকে জানতে পারি, লেনিন শিল্প-সাহিত্যে মডার্নিস্টিক আন্দোলন পছন্দ করতেন না। এক্সপ্রেসনিজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম বা অন্যবিধ ইজম-এর ফলশ্রুতিকে শিল্প-প্রতিভার চরমোৎকর্ষ বলে গ্রহণ করায় তাঁর অসম্মতি ছিল। তিনি বলতেন, আমি ওসব বুঝি না, ও থেকে কোনো আনন্দ পাই না।

গর্কি লিখেছেন, মায়াকোভস্কিকে লেনিন পছন্দ করতেন না। বলতেন, বড্ড বেশি চীৎকার করে, খারাপ খারাপ কথা বলে, তদুপরি কী যে লেখে, বোঝাও যায় না। সব কেমন এলোমেলো, পড়তেও কষ্ট হয়।

লেনিন সঙ্গীত-রসিক ছিলেন, কিন্তু সঙ্গীত তাঁর মনকে বিষাদে ভরে দিত। তিনি লুনাচারস্কিকে একদা বলেছিলেন, ভালো সঙ্গীত শোনা আনন্দের, কিন্তু আমি কেমন বিষণ্ণ বোধ করি। আমাকে তা বড় বেশি আচ্ছন্ন করে।

গর্কিকে লেনিন বলেছিলেন, আপনি কি মনে করেন না আজকাল বড় বেশি কবিতা লেখা হচ্ছে? সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় থাকে পাতার পর পাতা কবিতা, আর কবিতা সংকলন তো প্রায় রোজই বের হচ্ছে।

এথেকে মনে হতে পারে লেনিন কবিতার প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু উপরের কথাগুলির জবাবে গর্কি যখন বলেন ভালো গদ্য লেখার চেয়ে মাঝারি ধরনের পদ্য লেখা অনেক সোজা, লেনিন তাতে সায় দেননি। তিনি বলেছিলেন, গদ্যর চেয়ে পদ্য লেখা সোজা অমন কথা বলবেন না। আমি এমনটা ভাবতেও পারি না। আপনি যদি জ্যান্ত আমার চামড়া ছাড়িয়েও নেন, তাহলেও দু-লাইন পদ্য আমি লিখে উঠতে পারব না।

লেনিনের অন্তরঙ্গ, অনুরাগী ও অনুগামীদের এইসব স্মৃতিকথা থেকে লেনিনের সাহিত্যরুচির নানা তথ্য আমরা পাই। কিন্তু এর মধ্যে কতটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত মতামত আর কতটা সুচিন্তিত তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত তা নির্ণয় করা সহজ নয়।

লেনিন কাজের মানুষ ছিলেন, শিল্প-সাহিত্যের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তিনি বিশেষ পেতেন না। লুনাচারস্কি লিখেছেন, কলাশিল্পের তন্নিষ্ঠ অধ্যয়নে মনোনিবেশের অবকাশ লেনিনের হয়নি, আর যেহেতু উপরচালাকি তিনি ঘৃণা করতেন এবং তা ছিল তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধে—তাই এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতেও তিনি চাইতেন না।

এথেকে মনে করার কোনো কারণ নেই, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে লেনিন আনাড়ি ছিলেন। বরং লেনিন যে কতবড় বিনয়ী ছিলেন, এই বর্ণনা তারই সাক্ষ্য।

তলস্তয়-প্রসঙ্গে লেনিনের প্রবন্ধগুলি অনেকেই নিশ্চয় পড়েছেন। অমন গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রবন্ধ যিনি রচনা করতে পারেন, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে তিনি আনাড়ি ছিলেন—এমন নির্বোধ মন্তব্য কে করতে পারে!

কথাটা তা নয়। সাহিত্যরুচি সহজাত নয়, অর্জিত। একটি বিশেষ পরিবেশে লেনিনের সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল—মডার্নিজম সম্পর্কে তাঁর

অনীহা অতএব ছিল খুবই স্বাভাবিক। তলস্তয়-এর মতো মহান শিল্পী তো শেক্সপীয়র-এর গুণ গ্রহণে অক্ষম ছিলেন।

কবি মায়াকোভস্কি ছিলেন 'ফিউচারিস্ট'। তাঁর লেখা সম্পর্কে লেনিনের বিরূপ মনোভাব বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লুনাচারস্কি বলেছেন, লেনিন যদি মায়াকোভস্কির রচনার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেতেন, বিশেষ করে শেষের দিককার রচনার সঙ্গে, তাহলে "কবিতায় কমিউনিজমের ক্ষেত্রে এই মহান মিত্রের" সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবই পোষণ করতেন।

কালক্রমে অবশ্য মায়াকোভস্কি সোভিয়েত-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন—বেঁচে থাকলে লেনিনও তাঁকে এই স্বীকৃতিই দিতেন তাতে সন্দেহ নেই।

মডার্নিজম সম্পর্কেও বোধহয় এই একই কথা বলা যায়। মডার্নিজম আর ততো মডার্ন হয়তো নেই, আর একথাও নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে তার মধ্যে অনেক আতিশয্য ছিল, অনেক ফাঁকির দিক ছিল, স্বাভাবিক নিয়মেই তার মৃত্যু হয়েছে। আবার তার অনেক কিছু চিরকালের ঐতিহ্যভুক্ত হয়েছে।

লেনিনের সাহিত্য বিষয়ে অভিমতের আলোচনা করতে গিয়ে এইসব কথা মনে রাখা দরকার, মনে রাখা দরকার লেনিনের এইসব অনুরাগ-বিরাগেরও একটা সামাজিক ইতিহাস আছে, না হলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত (লেনিনের ব্যক্তিগত মতামতও অবশ্যই শ্রদ্ধেয়) আর সুচিন্তিত তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না।

দুই

সাহিত্য-শিল্প বিষয়ে লেনিনের কোন অভিমত নিছক তাঁর ব্যক্তিগত রুচির ফলশ্রুতি, আর কোন অভিমত তাঁর সুচিন্তিত তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত—এ নিয়ে চুল-চেরা তর্কের যতই অবকাশ থাক, তলস্তয়-প্রসঙ্গে তাঁর রচনাগুলি যে তাঁর সুগভীর অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল—সে-বিষয়ে কেউই বোধহয় দ্বিমত হবেন না।

তলস্তয়-প্রসঙ্গে সাতটি রচনায় লেনিন মোটের উপর এঙ্গেলস-এর পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। তিনিও তলস্তয়-এর সৃষ্টিশীল সাহিত্য এবং তাঁর সজ্ঞান মতবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেছেন। লেনিনের মতেও সাহিত্য বাস্তবজগতের প্রতিফলন। তিনি তলস্তয়-এর সাহিত্যকে রুশ-বিপ্লবের দর্পণ বলে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে তৎকালীন রুশিয়ার সবলতা ও দুর্বলতা উভয় দিকই

প্রতিফলিত হয়েছে। লেনিনের এই রচনাগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে। লেনিন বলেছেন, "And if the artist we are discussing is really a great artist he must have reflected at least some of the important aspects of the revolution in his works." যথার্থ মহৎ শিল্পীর রচনায় বিপ্লবের কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিফলন থাকবেই।

লেনিনের রচনা ক'টি একটু সতর্কভাবে পাঠ করলেই দেখা যাবে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার নিরসন করে সঠিক মার্কসীয় সমালোচনা-পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই তিনি ওগুলি লিখেছিলেন। অর্থাৎ, লেনিনের রচনাগুলি স্পষ্টতই 'পলেমিকেল' এবং সেই কারণেই এক-একটি রচনায় এক একটি দিকের উপর জোর পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা জোর দিয়ে বলা যায় তিনি এ-ব্যাপারে মোটের উপর এঙ্গেলস-প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন।

এখন দেখা যাক, এঙ্গেলস-প্রদর্শিত পথটা কি। মিন্না কাউটস্কি ও মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এঙ্গেলস-এর দুটি চিঠিতে এই পথের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই চিঠি দুটি থেকে মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচনা-পদ্ধতির যে-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা এই :

(১) মার্কসীয় সমালোচনা বস্তুতন্ত্রের অনুগামী। বস্তুতন্ত্র কি বস্তু তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন "বস্তুতন্ত্র বলতে আমি বুঝি বর্ণনার যাথার্থ্যের উপরেও যথাযথ চরিত্রকে তার যথাযথ পারিপার্শ্বিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করা।" (মার্গারেট হার্কনেস-এর কাছে লেখা চিঠি)।

(২) মার্কসবাদ সাহিত্যে উদ্দেশ্যবাদের নীতিতে বিশ্বাসী।

(৩) মার্কসবাদ মনে করে সজ্ঞানে লেখকের মতবাদ যাই হোক না কেন নিজের রচনায় নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে লেখক নিজের মতবাদকেই খণ্ডন করতে পারেন। যেমন করেছিলেন বালজাক। সজ্ঞানে তিনি ছিলেন রাজ-তন্ত্রী, কিন্তু বস্তুতন্ত্রের এমনই ধর্ম যে তিনি তাঁর শ্রেণী-সহানুভূতি ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঙ্গেলস-এর মতে এইটেই হলো বস্তুতন্ত্রের পরমতম জয়।

(৪) মার্কসবাদ নান্দনিক বিমুক্তিকরণের তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর রচনা থেকে লেখক নিজেকে যে-পরিমাণে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন, শিল্প-সাফল্য ততো পরিমাণেই তাঁর করায়ত্ত হবে। লেখকের বক্তব্য কাহিনীর মধ্য দিয়েই

প্রবাহিত হবে—এটাই বাঞ্ছনীয়। আলাদা করে তা বলবার দরকার নেই। তাতে শিল্পসিদ্ধি ব্যাহত হয়। "যেসব সামাজিক সংঘাত রূপায়িত হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান পাঠকের উপর চাপিয়ে দিতে লেখক বাধ্য নন।"

যাঁরা দাবি করেন যে-কোনো গল্প-উপন্যাসের শেষে উত্থাপিত সমস্যার "ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান" মাদুলীর মতো করে জুড়ে দিতেই হবে, গল্প শেষ করতে হবে আশাবাদের সুরে, লেখককে প্রত্যক্ষভাবে কোনো-না-কোনো পক্ষে যোগ দিতেই হবে, এবং এই দাবি করেন মার্কসবাদের নামে ; ভাবতে অবাক লাগে, মার্কসবাদের প্রবর্তকদের মতের সঙ্গে তাঁদের মতের কত না তফাৎ।

তিন

লেনিনের নামের সঙ্গে সাহিত্যে পার্টিজানশিপ-এর তত্ত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিশুদ্ধ সাহিত্যের তত্ত্বে লেনিন অবশ্যই বিশ্বাস করতেন না। এঙ্গেলসও সাহিত্যে উদ্দেশ্যবাদের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। বস্তুতপক্ষে সাহিত্য মতাদর্শ-নিরপেক্ষ হতেও পারে না। মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিশ্চয়ই তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে দেখবেন, বিচার করবেন, বুঝবার চেষ্টা করবেন। তাঁর সাহিত্যে নিশ্চয়ই তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রতিফলন থাকবে। এই অর্থেই তাঁর সাহিত্য হবে উদ্দেশ্যমূলক, পার্টিজান। সাহিত্যে পার্টিজানত্ব মূল্য-বোধের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের অন্তরঙ্গে। উদ্দেশ্যবাদ বলতে মার্কসবাদ কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্য বোঝে না। ঈশকাইলাস-এর ট্রাজেডি, আরিস্টোফিনিস-এর কমেডি, দান্তে কিংবা সারভান্তেস-এর সাহিত্য যে-অর্থে উদ্দেশ্যবাদী—মার্কস-বাদের প্রবক্তারা উদ্দেশ্যবাদ বলতে তাই বুঝিয়েছেন। উদ্দেশ্যবাদ বলতে তাঁরা কোনো নগদ প্রাপ্তির ধারণা বোঝাননি। এঙ্গেলস তো মার্গারেট হার্কনেস-এর কাছে লেখা চিঠিতে স্পষ্টই লেখেন, "লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের গুণগানের জন্য খাঁটি সমাজবাদী উপন্যাস, আমরা জার্মানরা যাকে বলি tendenzroman, না লেখবার জন্য আমি আপনার দোষ ধরছি না।"

লেনিন-শতবর্ষে কথাগুলি মনে রাখলে অনেক মূঢ়তা থেকে আমরা রক্ষা পাব।

বহিরঙ্গ ও বস্তু

কোনো প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে প্রশ্নটি যথাযথভাবে উত্থাপন করতে হয়। কেন না সব কেন-র জবাব দেওয়া যায় না আর ভুল প্রশ্নের জবাব ভুলই হয়। গত ৩১ অগস্টের সাহিত্যজগতে (আনন্দবাজার পত্রিকা) শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় উত্থাপিত প্রশ্নটিতেই গলদ আছে। ফর্ম আগে না কনটেন্ট আগে, ভাববস্তু বড় না বহিরঙ্গ বড় প্রশ্নটা এইভাবে উত্থাপন করাটাই ভুল। ফর্ম এবং কনটেন্টের মিলনেই শিল্প। বিজ্ঞানের দৌলতে পরমাণুকে ভাঙা সম্ভব হলেও ফর্ম এবং কনটেন্টকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। বিনা ভাষায় ভাবা সম্ভব নয় তেমনি ভাব ছাড়া ভাষা অসম্ভব।

ভাবকে প্রকাশ করার জন্যই ভাষা। ভাবকে ধারণ করেই ভাষা। কনটেন্টকে রূপ দেবার জন্যই ফর্ম। কনটেন্টকে ধারণ করেই ফর্ম। যে ফর্মে যে কনটেন্টকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় সেই কনটেন্টের ক্ষেত্রে সেই ফর্মই সবচেয়ে ভালো। নভেলের গঠন-রীতির প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর স্থাপত্য-কৌশলকে মেলাতে গেলে মিল থেকে অমিলটাই বেশি চোখে পড়বে। অনেক একচক্ষু সমালোচক এই কারণে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-কে গঠনরীতির দিক থেকে শিথিল বলে বর্ণনা করেছেন। সত্যি বটে, নিছক গল্পের দিক থেকে বিচার করতে গেলে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এ এমন

অনেক জিনিস আছে যা বাহুল্য বলে বোধ হবে। কিন্তু সেই সব তথাকথিত অপ্রয়োজনীয় বস্তু বাদ দিলে 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' আর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' থাকে না। নিছক একটা নিটোল গল্প বলতেই চাননি তলস্তয়, তিনি চেয়েছিলেন মানব-জীবনের মহাকাব্য রচনা করতে। তাই প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে প্রচলিত ফর্মের নিগড় ভাঙতে হয়েছিল। আর যেহেতু তার ফলে ভাববস্তুকে তিনি সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, তাই ফর্মের বিচারেও 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' সার্থক।

অবশ্য ফর্ম এবং কনটেন্টের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন সুলভ নয়। ভাববস্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে চমক আছে কিংবা ভাববস্তু মহৎ অথচ প্রকাশভঙ্গী দুর্বল—এমনটা হামেশাই দেখা যায়। জ্যোতির্ময়বাবুর প্রশ্ন যদি এই হয়—এই দুধরনের শিল্পকর্মের মধ্যে কোনটা শ্রেয় তাহলে বলব নন্দনতত্ত্বের বিচারে কোনোটাই পুরো নম্বর পাবার অধিকারী নয়।

ফর্ম বা কনটেন্টের অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব হলেও তুলনামূলক বিচারে কনটেন্টের গুরুত্বই কিঞ্চিৎ অধিক—সংজ্ঞা অনুসারেই। সমালোচকেরা বলে থাকেন ফর্মের বিচারে 'মাদাম বোভারি' নিখুঁত। কিন্তু তবু 'মাদাম বোভারি-'র স্থান 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর অনেক নিচে। কেন না 'ওয়ার আণ্ড পীস'-এ জীবনজিজ্ঞাসার যে গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে 'মাদাম বোভারিতে' তা অনুপস্থিত। এই অর্থেই ভাববস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাহিনী-বয়নে নিপুণ হলেও মম্ ছোট লেখক এই কারণে যে তিনি জীবনবোধে দীন।

জ্যোতির্ময়বাবু প্রশ্ন তুলেছেন ভাববস্তু নিরপেক্ষভাবে শুধু লিপিকুশলতা দিয়েই কোন সাহিত্যকর্মের বিচার হবে না কেন? কেন হবে না। সাময়িক বিচারে সাহিত্যকর্মের এই দিকটা তো অনেক সময়ই প্রাধান্য পায়। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রেও এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন আছে। তাতে দেখা যায়, ভাষার নৈপুণ্য বা বহিরঙ্গের চাকচিক্যই যে সাহিত্যকর্মের একমাত্র সম্বল কাল-প্রভাবে তা নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। মরশুমি ফুলের বিচিত্র বর্ণসমারোহ আমরা কে না তারিফ করি। তবু রূপহীনা যুঁই-ই আমাদের মন ভরায়।

জ্যোতির্ময়বাবু তার বক্তব্যের সমর্থনে চিত্রকলা এবং সঙ্গীতের নজীর টেনেছেন। সঙ্গীত বা চিত্রকলার ভাষা আলাদা, ব্যাকরণ আলাদা। সেকথা স্মরণে না রেখে সহিত্যবিচারে এর জের টানতে গেলে ভ্রান্তিবিলাসের সম্ভাবনা

থাকে। আর যাই হোক, বিন্তি খেলার নিয়ম দিয়ে ব্রিজ খেলার ভালোমন্দ বিচার করা যায় না।

আমি চিত্রকলার নজীর নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতাম না যদি না এর মধ্য দিয়ে এইটাই প্রকটিত হতো যে, বিষয়বস্তুর গৌরব বলতে জ্যোতির্ময়বাবু যা বোঝেন তার মধ্যেই গলদ আছে। ঈশ্বরের মাহাত্ম্যকীর্তন বা সদুপদেশ বিতরণ থাকলেই কোনো শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু মহৎ একথা বলা যায় না। মপাসাঁ'র 'বল অব ফ্যাট'-এর নায়িকা বারবণিতা, গর্কির 'চেলকাশ' গল্পের নায়ক চোর কিন্তু তাই বলে গল্প দুটি বিষয়বস্তুতে দীন একথা কেউই বলবে না। বটতলার সাহিত্যে সাধারণত ধর্মের জয় দেখান হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে সে সাহিত্য বিষয় গৌরবে ধনী এমন কথা নিতান্ত উন্মাদেই বলতে পারে। শিল্পে-সাহিত্যে কোনো বিষয়বস্তুই অগ্রাহ্য নয়। যে কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে শক্তিমান শিল্পী মণিমুক্তা তুলতে পারেন। সাহিত্যে বিষয়-বস্তুর গৌরব জীবনবোধের গভীরতায়।

'দি লাস্ট সাপার' বা 'ম্যাডোনা'-র ছবি দা ভিঞ্চি ও র‍্যাফেল ছাড়া আরও অনেকে এঁকেছেন। কিন্তু তার কোনটাই ধ্রুপদী মর্যাদা পায়নি। ছবি বাস্তবের অবিকল প্রতিলিপি নয়। রঙ আর রেখার ভাষায় বাস্তবকে রূপান্তরিত করে শিল্পী কিছু বলেন। যা বলেন সেইটাই ছবির বিষয়বস্তু। জ্যোতির্ময়বাবু গগের 'দি পোস্টম্যান' বা 'পোটাটো ইটার্স' ছবির কথা উল্লেখ করেছেন। আমি একটি ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত দেব।—সেটি র‍্যাঁদার বৃদ্ধা বারবণিতা মূর্তি। এই আপাত-দৃষ্টিতে কুৎসিৎ মূর্তিটির মধ্যে মানবাত্মার গভীর আর্তি ব্যঞ্জিত হয়েছে—তাই মূর্তিটি বিষয় গৌরবে দীন নয়। স্টিল লাইফের মধ্যেও শিল্পীর জীবনবোধের পরিচয় থাকে। এই দিয়েই তার বিচার হয়। একটি পাখি, একটি ফুল বা একটি নারীর মুখের মধ্যেও শিল্পীর এই জীবনদৃষ্টি অনুস্যূত থাকে। তা না থাকলে সে ছবি শিল্প পদবাচ্য নয়।

সঙ্গীত সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। সঙ্গীতের ভাষা—সুর, হারমনি বা ডিসকর্ড—কথা নয়। মার্গ সঙ্গীত বা ইওরোপীয় সঙ্গীতে কথার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। কথা না থাক, সুরের মূর্চ্ছনার মধ্যে জীবনের আনন্দ বা বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। এইটাই সঙ্গীতের বিষয়বস্তু। এই আনন্দ এবং বেদনার গভীরতাতেই সঙ্গীতের বিষয়বস্তুর মহত্ব। চটুল সুরের টুং টাং সমকালের চিত্ত জয় করতে পারে—কিন্তু মহাকাল কঠোর বিচারক।

কবিতা লেখা

কবিতা কেমন করে লেখা হয়? একজন আমেরিকান কবি লিখেছেন, 'এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার জিহ্বাগ্রে এসে পড়ে তা হচ্ছে—আমি জানি না। এমন কি প্রশ্নটা যদি আমার নিজের কবিতা সম্পর্কেও করা হয় তাহলেও জবাবের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হবে তা নয়—কেননা অন্যেরা যেভাবে কবিতা লেখেন তার সম্পর্কে আমার জ্ঞান যত সামান্য, আমার নিজের কবিতা সম্পর্কেও তাই'।

আমেরিকান কবির কথায় কবি-সুলভ অতিশয়োক্তি একটু থাকতে পারে, তবু কথাটা একেবারে বোধহয় উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কবিতা সচেতন মনের সৃষ্টি নিশ্চয়ই, কিন্তু সৃজন-প্রক্রিয়ায় নির্জ্ঞান মনেরও যে একটা অংশ আছে তা না বললে মনে হয় পুরো সত্যিকথা বলা হবে না। অচেতন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় নয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণও তাকে বলা যায় না। অচেতন প্রক্রিয়াটা সচেতন প্রচেষ্টার পরিপূরকমাত্র। সচেতন প্রচেষ্টাই অচেতন প্রক্রিয়ার জনক। নইলে যে কোনো লোকই স্বপ্নের ঘোরে কবিতা রচনা করতে পারত। জেমস জীন্‌স একসময় লিখেছিলেন, একটা বাঁদরকে যদি টাইপ-রাইটারে বসিয়ে দেওয়া যায় আর যদি সে এলোমেলোভাবে অনন্তকাল ধরে টাইপ-রাইটারের চাবিগুলি টিপতে থাকে তাহলে কোনো-না-কোনো সময়ে নিশ্চয়ই দেখা যাবে সে

শেক্‌স্‌পীঅরের একটি সনেট রচনা করে ফেলেছে। তাতে করে বাঁদরের কবিত্ব-শক্তি প্রমাণিত হবে না নিশ্চয়ই। বরং এ-ঘটনা আকস্মিকতার অন্ধ জুয়াখেলার একটি চরম দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য হবে। স্বপ্নের ঘোরে অকবির কাব্য রচনাও তেমনি ধারা ঘটনা।

অচেতন প্রক্রিয়াটা কোনো অতীন্দ্রিয় ঘটনা নয়। অচেতন প্রক্রিয়া বলতে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা এই: একটা ভাব, একটা চিত্রকল্প, একটা অনুভূতি যখন নীহারিকান্তরে থাকে—যখন সেই বিশৃঙ্খল চিন্তাপিণ্ডগুলিকে মনের রসায়নাগারে ভেঙে-চুরে কবি তার মধ্যে শৃঙ্খলাবিধানের সাধনায় নিয়োজিত থাকেন—তখন সে প্রচেষ্টা সচেতন মনকে জুড়ে থাকে তো বটেই, এমন কি নির্জ্ঞান মনের অন্ধকার প্রদেশেও তা পরিব্যাপ্ত হয়। তিনি যখন আপাতদৃষ্টিতে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন তখনও এই প্রক্রিয়া থেমে থাকে না। এমন কি যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখনও মনে মনে এই ভাঙা-গড়া, গ্রহণ ও বর্জন চলতেই থাকে। কবিরাই স্বপ্নে কবিতা রচনা করেন, অকবিরা নয়। স্বপ্নলব্ধ কবিতা তাই কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির রচনা নয়, কবিরই রচনা।

উইলিয়ম ব্লেক বলেছেন, তাঁর কোনো কোনো কবিতা নাকি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত। নিজে তিনি কিছু ভাবেননি, কেউ যেন তাঁকে ডিক্‌টেশন দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু ব্লেক যাই বলুন এই স্বতঃস্ফূর্তি আসলে স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ডিক্‌টেশন যদি কেউ তাঁকে দিয়ে থাকে তো সে তাঁর কবি সত্তাই—কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। ব্লেক যদি কবি না হতেন, যদি দীর্ঘদিনের সাধনায় তাঁর কবি-সত্তা সংহত না হতো, তাহলে এ ডিক্‌টেশন ব্যর্থই হতো।

কিন্তু কবি কে? জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'। একটু সরলোক্তি শোনাবে হয়তো, তবু কথাটা মিথ্যে নয়। কবি কে তবে? মর্ত্যের মানুষ নিশ্চয়ই, তবু একটু স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, কবি তিনিই সাধারণ মানুষের থেকে যাঁর চেতনা অনেক প্রখর, যাঁর মন অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং কোমল, মানব-চরিত্র সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান অনেক বেশি গভীর, যাঁর হৃদয় অনেক বেশি ব্যাপ্ত। যিনি আপনার আবেগে আপনি আনন্দিত, জীবনের আবেগে উচ্ছল যিনি, বিশ্ব-ব্যাপারে সেই আবেগ সম্পৃক্ত করে যিনি আনন্দিত এবং যেখানে সেই পরিবেশ অনুপস্থিত সেখানেও যিনি তা সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন তিনিই কবি। এ-ছাড়াও কবির আর-একটা গুণ

আছে, তিনি অনুপস্থিত পরিবেশ দ্বারা ভাবাক্রান্ত হন। বাস্তব ঘটনা একজন সাধারণ মানুষের মনে যতটুকু অনুভূতি সৃষ্টি করে তার থেকে অনেক প্রবল অনুভূতি মনে মনে সৃষ্টি করে তিনি তার দ্বারা অভিভূত হতে পারেন।

এর সব কটি গুণ আজকের কবির আছে কিনা এবং থাকা দরকার কিনা তা নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যদি বা সম্ভব—প্রকাশক্ষমতা যার নেই সে যে কবি নয়, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। কোনো একটা দৃশ্য, কোনো একটা সুর, কোনো একটা স্মৃতি—কোনো না কোনো মুহূর্তে সব মানুষকেই ভাবাক্রান্ত করতে পারে। কিন্তু সকলে সে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। মূক মিলটন আসলে কবি নয়। কবি শুধু ভাবাক্রান্তই হন না, ভাবকে প্রকাশও করেন এক বিশেষ ধরনের ছন্দোবদ্ধ আবেগময় ভাষা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে—যা পাঠককেও ভাবাক্রান্ত করে। তাই কবি হতে গেলে ধ্যান থাকাই যথেষ্ট নয়, থাকতে হবে ছন্দের কান, ভাষার জ্ঞান এবং চিত্রকল্পরচনার দক্ষতা। কবিকে একজন তুলনা করেছেন রেডিও-র এরিয়লের সঙ্গে। কবি রেডিও-র এরিয়লের মতো সাধারণের অগম্য স্থান থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে পারেন। এ তুলনা আংশিক সত্য। সাধারণের অগম্য স্থান থেকে তিনি শুধু যে প্রেরণাই সংগ্রহ করেন তা নয়, তা প্রকাশও করেন। অর্থাৎ, তিনি রেডিও-তরঙ্গ ধরবার এরিয়লই শুধু নন, তাকে শব্দ-তরঙ্গে রূপায়িত করার বেতার-গ্রাহক যন্ত্রও।

কিন্তু এই যে প্রকাশক্ষমতা, এই কবিত্বশক্তি—এ কি ঈশ্বরপ্রদত্ত? কিংবা জন্মগত? এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই আমার জানা আছে। কাব্যরচনা-বিষয়ে একটা বিশেষ প্রবণতা থাকা অসম্ভব এমন কথা অবশ্য বলছি না। তবু কবিত্ব-শক্তি সাধনালব্ধ—একথা বললেই মনে হয় অনেক বেশি সত্যি কথা বলা হবে। প্রাচীন ভারতের কাব্যমীমাংসাশাস্ত্র প্রেরণা বা ঐশী শক্তিতে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু তাতেও সাধনার প্রয়োজন বা গুরুত্ব অস্বীকৃত হয়নি। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রকারদের মতে, প্রতিভা কবির দৈবস্থানীয়, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস কবির পুরুষকার। ব্যুৎপত্তি কবির পক্ষে আয়াসলভ্য। সাধনায় ধৈর্য নেই বলেই সকলে কবি নয়।

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কিন্তু কবিরা আবার সকলে একভাবে কবিতা লেখেন না, সব কবিতা একভাবে লেখাও হয় না। কোনো কোনো কবিতা আসে আকস্মিকভাবে, হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মতো।

কোনো কোনো কবিতা মনের মধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে থাকে, কাগজে কলম ছোঁয়ালেই যেন ঝরনাধারার মতো বেরিয়ে আসে। কখনও বা হঠাৎ মনের মধ্যে একটা লাইন গুন্‌গুনিয়ে ওঠে বা একটা স্তবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হয়ে যায়—সচেতন চেষ্টা ও সাধনায় কবিকে পাদপূরণ করতে হয়। কোনো কোনো সময় আবার এমনও হয় যে কাগজের ওপরে কলম না ঠেকালে কবিকল্পনা নীহারিকান্তরেই থেকে যায়। কোনো কোনো কবিতা নিমেষের মধ্যে লেখা হয়ে যায়, কোনো কবিতা শেষ করতে বছর ঘোরে।

কীট্‌স তাঁর শেষ কবিতা রচনা করেছিলেন জাহাজে বসে। ভগ্নহৃদয় কবি চলেছেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের মানসে ইতালি। ইংলণ্ডের মাটিতে শেষবারের মতো পাদচারণা করে জাহাজে ফিরে এসেছেন। ভাবছেন নিজের কথা, প্রণয়িনী ফ্যানি ব্রনের কথা—অতীত-ভবিষ্যতের কথা। ঢেউয়ের শীর্ষে জাহাজ দুলছে। আকাশে শুকতারা স্থির। হঠাৎ মনের আবেগ কবিতার ছন্দে মুক্তি পেল। কবি লিখলেন :

Bright star, would I were steadfast as thou art !

শেক্‌সপীঅরের কবিতাবলীর ফাঁকে-ফাঁকেই লেখা রইল সে কবিতা কীট্‌সের শেষ কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-ও এমনি ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল, দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"

কোল্‌রিজ তাঁর 'কুব্‌লা খান' কবিতাটি নাকি স্বপ্নে পেয়েছিলেন। একদিন অসুস্থ অবস্থায় কবি চেয়ারে বসে বই পড়তে পড়তে ঘুমের ওষুধের প্রভাবে

তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কবি যে বইটি পড়ছিলেন তার নাম Purchas's Pilgrimage এবং যে লাইনটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা এই: "Here the Kubla Khan commanded a palace to be built, and a stately garden there unto. And thus ten miles of fertile ground were inclosed with a wall." কবি প্রায় তিন ঘন্টা নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, তাঁর স্পষ্ট মনে আছে এই সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দু-তিন শো পংক্তি তিনি রচনা করেছিলেন। ঠিক রচনা অবশ্য নয়—কবিতা যেন কায়া পরিগ্রহ করে তাঁর মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। নিদ্রা টুটে যাবার পরও সম্মোহ কাটে নি। সমস্ত রচনাটা স্পষ্ট মনে ছিল তাঁর এবং কালি-কলম নিয়ে তা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে বসে গিয়েছিলেন। কয়েক পংক্তি লিখেছেন এমন সময় একজন লোক এসে পড়ায় তাঁকে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হতে হয়। ঘন্টাখানেক পরে কাজ চুকিয়ে তিনি যখন পুনরায় কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন তখন দেখলেন যদিও ভাবের ঘোরটা একেবারে কাটেনি কিন্তু আট-দশটি বিচ্ছিন্ন পংক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে নেই। নিস্তরঙ্গ সরোবরে কেউ যেন ঢিল ছুঁড়েছে আর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বগুলি ভেঙে ভেঙে মুছে মুছে গেছে। কবিতাটি আর শেষ করা হয়নি।

কবি হাউসম্যানের অভিজ্ঞতা আবার অন্যরকম। হাউসম্যানের অভ্যাস ছিল বিকেল বেলা দু-তিন ঘন্টা বেড়িয়ে বেড়ানো। এই রকম উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ এক সময় তাঁর মনের মধ্যে থরোথরো আবেগে কবিতার একটি-কি-দুটি পংক্তি, একটি-কি-দুটি স্তবক ঝলকে উঠত। তারপর কিছুক্ষণ শূন্যতা। তারপর আবার হয়তো একটি-কি-দুটি লাইনের গুঞ্জন। বাড়ি ফিরে সেই অসমাপ্ত কবিতাকণিকাগুলিকে নোট বইয়ে লিখে রাখতেন হাউসম্যান। তারপর তাকে ঘষে-মেজে সম্পূর্ণ করার পালা। অনেক সময়ই এ কাজ করতে হতো সচেতনভাবে, সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা। কবি লিখেছেন, এ কাজ সহজ ছিল না। একটি কবিতা তাঁকে তেরোবার লিখতে হয়েছিল এবং কবিতাটি শেষ করতে সময় লেগেছিল বারো মাস।

স্টিফেন স্পেণ্ডারের কবিতা-রচনার পদ্ধতিও অনেকটা একই ধরনের। মনের মধ্যে একটা ভাব এলেই তিনি তা যেমন-তেমন করে নোট বইয়ে টুকে রাখেন। পরে এক সময় তাকে ঘষে মেজে কবিতার রূপ দেবার চেষ্টা করেন। সব সময় যে এই চেষ্টা সফল হয় তা নয়। স্পেণ্ডার লিখেছেন, তাঁর প্রতিটি

লিখিত কবিতার পেছনে আছে অন্তত দশটি অলিখিত কবিতার ইতিহাস।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন, তিনি যে সবসময় পূর্ব-কল্পিত একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসতেন তা নয়, কিন্তু দীর্ঘ দিনের সাধনায় তাঁর মনের এমন একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে লিখতে বসে অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই তার মধ্যে আপনা থেকেই একটা উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠত।

আগেই বলেছি—কিন্তু এখন ছ-জন কবির নজির সামনে রেখে আরও নিশ্চয় করে বলতে পারি—সব কবিতা একভাবে লেখা হয় না। কাব্য-সাধনাও এক-এক কবির এক-এক ধারায় অগ্রসর হয়। তবু সাধারণভাবে একটা কথা বলা যায়, সাধনা ছাড়া কবিতা হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিকই বলেছিলেন, যে-কবিতার কিছুমাত্র মূল্য আছে দেখা যাবে তা যে-কোনো বিষয়ের ওপর রচিত নয়, তা এমন লোকের লেখা যাঁর মন সাধারণ মানুষের থেকে ঢের বেশি সংবেদনশীল তো বটেই, পরন্তু তিনি দীর্ঘকাল এবং গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। স্পেণ্ডার কথাটা আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন, সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের সমস্যা আসলে হচ্ছে মনকে একলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার সমস্যা। দীর্ঘদিনের তালিম ছাড়া গলার স্বরকে যেমন সুরে প্রবাহিত করা যায় না, রেখাকে রূপায়িত করা যায় না ছবিতে, তেমনি দীর্ঘদিনের সাধনা ছাড়া ভাবকেও দেওয়া যায় না শব্দের শরীর।

কবিতার প্রেরণা আকাশ থেকে পড়ে না। কোনো একটা দৃশ্য, কোনো একটা সুর, কোনো একটা স্মৃতি মনে অনেক সময় কল্পনার উত্তাল তরঙ্গ তোলে। তাকেই আমরা বলি প্রেরণা। প্রেরণা কবিতার আদি এবং অন্তও। প্রেরণা কবিকে ভাবাক্রান্ত করে এবং কবি যখন সেই ভাবকে শব্দের শরীর দিতে পারেন তখন সেই প্রেরণাই তাতে বিধৃত হয় আর তা পাঠকের মনকেও তাই সংক্রামিত করতে পারে। এই আদি এবং অন্তের মধ্যে যা—তা হচ্ছে ঘর্ম। ফরাসি কবি ভালেরি তাই বলেছেন, ঈশ্বর বা প্রকৃতি কবিকে একটি মাত্র পংক্তি তৈরি করে দেন, নিজের সাধনায় বাকিটা কবিকে রচনা করতে হয়।

সৃষ্টির আদিতে যেমন নীহারিকা, কল্পনার আদিতেও তাই। ভাসা-ভাসা আবেগ, অস্পষ্ট অনুভূতি, কায়াহীন চিত্রকল্প, 'ইচ্ছা হয়ে' 'মনের মাঝারে' ছড়িয়ে থাকে। কোলরিজ বলেছেন, ভাব এবং চিত্রকল্প বাস করে চেতনার আধো-আলো আধো-ছায়ার জগতে। কল্পনার উষালগ্নের সেই ছায়া-ছায়া অর্ধপরিণত

সত্তার নীহারিকান্তর হচ্ছে চৈতন্যের একেবারে উপান্তপ্রদেশ, যেখানে আমাদের সকল অনুভূতি জমা হয়ে থাকে। ড্রাইডেন বলেছেন, কল্পনার সেই উষালগ্নে বিশৃঙ্খল চিন্তাপিণ্ডেরা সব অন্ধকারে জড়াজড়ি করে থাকে। কবি একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই বিশৃঙ্খল চিন্তাপিণ্ডগুলিকে সংহত করেন, অস্পস্ট চিত্রকল্প-গুলিকে নিয়ে আসেন আলোকের দিকে। তারপর ঝাড়াই-বাছাই করে তাকে কাব্যের মধ্যে সংহত করেন। মনস্তত্ত্ববিদ জেরার্ড এক প্রবন্ধে এই প্রক্রিয়াটির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। জেরার্ড লিখেছেন, 'সেখানে মানসিক কর্মের তীব্র উত্তাপে কল্পনার নরম তালগুলিকে গলিয়ে (শিল্পী) তাতে আনেন পরিণত শিল্পকর্মের ইস্পাত-কাঠিন্য'। কল্পনার উত্তাল আদিপর্বে একটা 'বিশৃঙ্খল সৌন্দর্য' থাকতে পারে, কিন্তু তা শিল্পকর্ম নয়। শিল্পকর্মের সৌন্দর্য হল শৃঙ্খলা (disciplined beauty)।

কল্পনার উত্তাল আদিপর্বের বিশৃঙ্খলা থেকে শিল্পকর্মের সুশৃঙ্খল জগতে উত্তরণ একটা মানসিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কখন যে সম্পূর্ণ হবে তা কেউ বলতে পারে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন, একদা তিনি তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করার চেষ্টায় সময়ের অনেক অপব্যয় করেছেন। পরে নেহাত ঠেকে শিখেছেন, এ-ধরনের নিষ্ফল চেষ্টা নিরর্থক ; মনের রসায়নাগারে একটা ভাব-কল্প পূর্ণ অবয়ব না-পাওয়া পর্যন্ত কাগজের ওপর অক্ষর সাজিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করা যায় না।

সব কবিতা যে একভাবে লেখা হয় না এবং সব কবি একভাবে কবিতা লেখেন না তার কারণ শিল্পকর্মের সুশৃঙ্খল জগতে উত্তরণের মানসিক প্রক্রিয়া এক-একটি কবিতার এবং এক-এক কবির ক্ষেত্রে এক-এক ভাবে সম্পূর্ণ হয়। কোনো কোনো কবিতা এবং কবির ক্ষেত্রে কাগজের বুকে কলম ছোঁয়ানোর আগেই এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় (দ্রষ্টব্য : ব্লেক, কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথ, এমনকি কোল্‌রিজের উদাহরণ), কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি হয়ে পড়ে একটি দীর্ঘায়ত প্রক্রিয়া, ধাপে ধাপে যা সম্পূর্ণ হয় (দ্রষ্টব্য ; হাউসম্যান ও স্পেণ্ডারের উদাহরণ)। কোনো কোনো কবি মনে-মনেই কবিতা রচনা শেষ করতে পারেন। তাঁদের কাছে কাগজ-কলম নিয়ে বসাটা শুধু সেই কবিতাকে অক্ষরের মধ্যে ধরে রাখা। অনেকের পক্ষে কাগজ-কলম নিয়ে বসাটাই হচ্ছে কবিতার শুরু। আমেরিকান কবি এমি লোয়েল লিখেছেন, 'আমি মনে-মনে কবিতা রচনা করি কদাচিৎ। ভাবাক্রান্ত হলে আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসে

যাই। একখণ্ড শাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ি…'। অনেকে লেখেন আর কাটেন, কাটেন আর লেখেন। এমনি করে কবিতা যখন শেষ হয় তখন হয়তো দেখা যায়—এক কবিতার বদলে তিনি লিখেছেন আর-একটি কবিতা।

কিন্তু শিল্পকর্মের সুশৃঙ্খল জগতে উত্তরণের প্রক্রিয়াটা লেখার আগেই সম্পূর্ণ হোক আর লিখতে-লিখতেই সম্পূর্ণ হোক, তার জন্যে প্রয়োজন মনকে একলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করা।

জার্মান কবি শিলার লেখার ডেসকের নিচে পচা আপেল লুকিয়ে রাখতেন। পচা আপেলের গন্ধ নাকি তাঁকে মনঃসংযোগে সাহায্য করত। ওঅল্টর ডি লা মেআর লিখতে বসে অনবরত সিগারেট টানতেন। অডেনের আসক্তি চায়ে, স্পেণ্ডারের কফিতে। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন, পচা আপেল বা সিগারেট বা চা-কফির সঙ্গে কবিতার সত্যি কোনো সম্পর্ক আছে। এগুলি মনকে একলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার বাহ্যিক প্রকরণ মাত্র।

মনঃসংযোগের নির্বিচারে-প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি কেউ বাতলে দিতে পারে না। এটা কবির একেবারে ব্যক্তিগত সমস্যা এবং এক-এক কবি এক-একভাবে এ-সমস্যার সমাধান করে থাকেন। কাজেই তা নিয়ে বাগবিস্তারের প্রয়োজন নেই। মনকে একলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করার আসল তাৎপর্য হচ্ছে, ভাবকে, সৃষ্টি-প্রেরণাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা।

একটি অঙ্ক কষতেও মনঃসংযোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কবিতা লিখতে যে ধরনের মনঃসংযোগের প্রয়োজন—তা একটু স্বতন্ত্র পর্যায়ের। কবিকে তাঁর সৃষ্টি-প্রেরণা বা ভাবের একটি দিক সম্পর্কে শুধু অবহিত থাকলে চলে না—একই সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সব দিক খতিয়ে দেখতে হয়! শিশুতরু যেমন একই সঙ্গে বহুদিকে বেড়ে ওঠার প্রয়াস পায়, পাতার ডানা মেলে আলো ও উত্তাপকে স্পর্শ করে আর শিকড় প্রসারিত করে জলকে—কবির একাগ্র সাধনার লক্ষ্যও সেইরূপ।

কবি-কল্পনা আকাশ-কুসুম নয়, মানস-কুসুম। আমরা যা অনুভূতি দিয়ে কদাপি প্রত্যক্ষ করি নি তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কল্পনা হচ্ছে আসলে অনুভূতিকে মনের সংগোপন প্রদেশে ধরে রাখার ক্ষমতা এবং সেই অনুভূতি ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। আমরা যখন বলি কবি এক ধরনের অতি-সংবেদনশীল মনের অধিকারী তখন আমরা এই কথাটাই বুঝি

কবি কোনো অনুভূতিই ভুলে যান না, সবই স্মৃতি হয়ে তাঁর মনের মণিকোঠায় জমা থাকে এবং সেই ভাবানুভূতির প্রত্যক্ষ কারণটা যখন আর উপস্থিত থাকে না তখনও তার দ্বারা তিনি প্রবলভাবে ভাবাক্রান্ত হতে পারেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন লেখেন, 'কবি···অনুপস্থিত পরিবেশের দ্বারা ভাবাক্রান্ত হন'—তিনিও এই কথাই বোঝাতে চান। টি-এস এলিয়টও বলেন, কবির আশৈশবের সমগ্র সংবেদনশীল জীবন (sensitive life) থেকে চিত্রকল্পের উদ্ভব।

একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক। এক-একটা অভিজ্ঞতা, এক-একটা আবেগানুভূতি কবির সচেতন মন থেকে একসময় মুছে যায়। কিন্তু তাই বলে তা লুপ্ত হয়ে যায় না—নিজ্ঞ'ান মনের অতলে তা জমা হয়ে থাকে, একটা অনুভূতি আর একটার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, জড়িয়ে মিশিয়ে সৃষ্টি হয় আর-একটা অনুভূতি। এটা ঘটে কবির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, কবি যখন সজ্ঞানে অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত। তারপর কোনো এক মুহূর্তে, কোনো একটা সুর কোনো একটা দৃশ্য, কোনো একটা স্মৃতি যখন মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তখন সেই হারানো অনুভূতিরা নিজ্ঞ'ানের অতল থেকে উঠে আসে। তারপর, আগেই বলেছি, বিশৃঙ্খল চিন্তাপিণ্ডের আবর্ত, ভাসা-ভাসা আবেগ, ধোঁয়াটে চিত্রকল্পের ছায়া-কুহেলিকায় হাতড়ে বেড়ানো।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যেকোনো সৃষ্টিমূলক প্রয়াসেরই অঙ্গ। বস্তুতপক্ষে একটি শিল্পকর্মের সঙ্গে আর একটির পার্থক্য প্রকাশভঙ্গিতে। একটি ভাবকেই তুলিতে এবং কথায় প্রকাশ করা যায়—একটি হয় চিত্রকলা অপরটি সাহিত্য। গদ্য ও কাব্যের মধ্যেও প্রধান পার্থক্য প্রকাশভঙ্গিতে। ভাবাক্রান্ত হলেই হবে না, কবিতার বিশিষ্ট আঙ্গিকে তা প্রকাশও করতে হবে।

ছাপার অক্ষরে কাটাকুটিহীন কবিতা পড়ে তা 'মনুষ্যজনোচিত দুর্বলতা-বর্জিত' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতার পাণ্ডুলিপির দিকে তাকালে সে বিভ্রম কেটে যেতে দেরি লাগবে না।

স্বতঃস্ফূর্তি কবিতার একটা বড়ো গুণ সন্দেহ নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো কবিতার সংজ্ঞাই দিয়েছেন, 'spontaneous overflow of powerful feelings'। কিন্তু আগেই বলেছি, এই স্বতঃস্ফূর্তি আসলে স্বতঃস্ফূর্ত নয়। স্বতঃস্ফূর্তি রীতিমত আয়াসসাধ্য। সহচরী-বিয়োগকাতর ক্রৌঞ্চের শোক ছন্দোবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত হয়ে মুনির মন থেকে কেমন করে শ্লোকরূপে নির্গত হল তা

বর্ণনা করতে গিয়ে 'লোচন'-কার অভিনবগুপ্ত যে উপমাটি ব্যবহার করেছেন তা হলো, 'পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ'। পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল যেমন উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, মুনির মনের শোক তেমনি করে শ্লোক হয়ে উথলে পড়েছে। 'spontaneous overflow of powerful feelings' বলতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এইরকম একটি প্রক্রিয়াই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, কুম্ভ পরিপূর্ণ না হলে জল উথলে পড়ে না আর কুম্ভকে পরিপূর্ণ করতে হয় সচেতন সক্রিয় চেষ্টার দ্বারা। অর্থাৎ শক্তিশালী আবেগানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের জন্যে চাই কবির দীর্ঘদিনের সচেতন প্রস্তুতি। এটা যে হেঁয়ালি বা বিপরীত-কথন নয়, একটা উদাহরণ দিলে বোধহয় তা পরিষ্কার হবে।

'কুবলা খান' নাকি কোল্‌রিজের স্বপ্নে-পাওয়া কবিতা। কিন্তু তাই বলে কি তা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত? কোল্‌রিজের কবি-মানসের গভীরতম প্রদেশে কি তার মূল বিস্তৃত নয়?

জন লিভিংস্টোন লোয়েস কোল্‌রিজের কাব্য-সাধনা সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। 'The Road to Xanadu' গ্রন্থে তিনি তাঁর এই গবেষণার যে ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন তাতেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

গবেষণাকার্যের জন্যে লোয়েসকে কোল্‌রিজের নোটবই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছিল। লোয়েস লিখছেন, নোটবইয়ে যা লিপিবদ্ধ ছিল তার দুই-তৃতীয়াংশ তিনি উল্টে দেখতে পারেন নি। কিন্তু যা দেখেছেন তা থেকেই একটা তাৎপর্যপূর্ণ সত্য পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা, কোল্‌রিজের চেতনার উপান্ত-প্রদেশে যে সব অদ্ভুত, অপার্থিব অবয়ব চলে-ফিরে বেড়াত তার একটা আভাস ওরই মধ্যে পাওয়া যায়। এর বেশিরভাগই অন্ধকারের জগত উত্তীর্ণ হয়ে দিনের আলোয় প্রকাশিত হয় নি। সামান্য যা আত্মপ্রকাশ করেছে তা-ই কবির জন্যে বয়ে এনেছে যশের মুকুট। কিন্তু যা আত্মপ্রকাশ করেনি, তাও প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে কথিত তারকারাজির মতো কোল্‌রিজের সাহিত্যকর্মের ওপর গোপন প্রভাব বিস্তার করেছে। 'দি রাইম অব দি এন্‌সেন্ট মেরিনার', 'ক্রিস্টাবেল' বা 'কুবলা খান' এরকম কবিতা হতে পেরেছে এই কারণেই যে এগুলি কোল্‌রিজের সচেতন মনের উপান্তপ্রদেশের-বীচিবিক্ষুব্ধ আলোকোজ্জ্বল সমুদ্র থেকে উদ্‌গত এবং তার আভায় দীপ্ত।

লোয়েস লিখেছেন, কবি যখন আপাতদৃষ্টিতে অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকতেন তখনও তাঁর মনে নানা অপার্থিব, অপ্রাকৃত অবয়বের আনাগোনা চলতেই থাকত।

আর এইগুলিই জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে কোল্‌রিজের কবিতায় চিত্রকল্প রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

কোল্‌রিজের কবি-মানসের এই ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে বলা যায়, তাঁর কোনো রচনাই ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ নয়। বরং প্রত্যেকটি রচনাই দীর্ঘদিনের সাধনায় সংহত কবিচিত্তের প্রয়াসের ফল। আর, আমার মনে হয়, এ-কথা যে কোনো কবির যে কোনো সার্থক কবিতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

তবে কি কবিরা যখন দাবি করেন যে কোনো কোনো কবিতা তাঁরা রচনা করেছেন স্বতাস্ফূর্তভাবে—যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির ডিক্‌টেশনে—তখন তাঁরা অনৃতভাষণের দোষে দোষী হন? কবিদের বিরুদ্ধে এ-রকম কোনো মামলা রুজু করার দরকার নেই। নির্জ্ঞান মন সংজ্ঞা অনুসারেই অজ্ঞাত—সেখানকার ভাঙা-গড়ার খবর কবিদের নিজেদের কাছেই অজানা। কাজেই প্রক্রিয়াটা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাঁদের কাছেও অনেক সময় তা স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয়।

কবিতার স্বতঃস্ফূর্তি আসলে স্বতঃস্ফূর্ত নয়। শোকে মুহ্যমান অবস্থায় কবিতা লিখলেই দুঃখানুভূতি ফুটবে ভালো এমন কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এ কথা এখানে বলা আবশ্যক, কোনো সদ্য আবেগে মন যখন ভরিয়া ওঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না, তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ্‌ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না; শুধু কবিত্ব নয়, সকল প্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটা নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে একটা সৃষ্টিকর্তা আছে কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না।'

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বিষয়টি অনেক স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, কাব্যের আত্মা রস। কিন্তু রস বস্তুটি কি? 'ভাব' বা 'ইমোশন' রস নয়, এবং মানুষের মনে যা এই ভাব জাগিয়ে তোলে, তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা 'ইমোশন'। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের শোক তার কাছে রস নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। '...প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্‌বোধ, তা রস নয়। কারণ তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ,

সুতরাং পরিমিত ; তা লৌকিক, সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে 'সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী' অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তরিত করেন।

কথিত আছে, সহচরী-বিয়োগকাতর ক্রৌঞ্চের শোক আদিকবির মনে আদিকাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল। অভিনবগুপ্ত লিখেছেন, 'একথা মানতেই হবে যে এ শোক মুনির নিজের শোক নয়। যদি তা হত, তবে ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি দুঃখিত হয়েই থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হত না। কারণ, কেবল দুঃখ-সন্তপ্তের কাব্য রচনা কখনও দেখা যায় না।' লৌকিক ভাব আদিকবির মনে অলৌকিক রসমূর্তি পরিগ্রহ করে পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উথলে পড়ার মতো ছন্দোবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত শ্লোক হয়ে উথলে পড়েছে।* কবিতার স্বতস্ফূর্তির এটাই হচ্ছে মূল রহস্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথাতেও এই মতেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'কবিতার জন্ম নিবিড় শান্তিতে আবেগানুভূতিকে নতুন করে অনুভব করার মধ্যেই (emotions recollected in tranquility)। আবেগানুভূতি নতুন করে অনুভব করতে গেলে মনে এমন কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যে শান্ত পরিবেশ ক্রমে মিলিয়ে যায়, আবেগের আদিপর্বের মানসিক অবস্থা ফিরে আসে এবং সে আবেগানুভূতি সত্য সত্যই মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই রকম একটা মানসিক অবস্থাতেই কবিতা রচনার শুরু এবং এই রকম মানসিক অবস্থাতেই কবিতা লেখা হয়ে থাকে…।'

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, 'স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ ফোটে ভালো'। বর্ষার কবিতা বর্ষার দিনেই লিখতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

সৎ কবিতা মানেই স্বভাব-কবিতা। কিন্তু স্বভাব-কবিত্বই কাব্য রচনার শেষ কথা নয়। স্বভাবকবিতা স্বভাবতই অপরিণত কবিতা। তার ব্যঞ্জনাও সীমাবদ্ধ। অশিক্ষিতপটুত্ব কবিতার দিগন্তকেই সীমিত করে। স্বভাব-কবিত্ব কবিত্বের শৈশব। শিশুর একটা সহজ সারল্য আছে—অনেক সময় তা ভালোও লাগে, কিন্তু বয়স্ক চিন্তার গুরুভার বহন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আকাঁড়া ভাবকে শিক্ষিতপটুত্ব দ্বারা মার্জনা করে না নিলে তা শিল্পের মর্যাদা পেতে

* এ প্রসঙ্গে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের যে সব মতামত উদ্ধৃত হয়েছে তা প্রধানত নেওয়া হয়েছে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ও শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'কাব্য-কৌতুক' গ্রন্থ থেকে।—লেখক

পারে না। ভাবের ঘোরে কবিতা লিখলেই যে তা সার্থক হবে এমন কোনো কথা নেই। ভাবকে মনে মনে বলয়িত করে নেওয়া দরকার, দরকার আবেগকে যুক্তি দিয়ে শোধন করে নেওয়া। আগেই বলেছি, জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতেই হোক, কবির প্রয়াস একই সঙ্গে নানা খাতে প্রবাহিত হয়।

এজরা পাউণ্ড লিখেছেন, 'সাহিত্য ব্যঞ্জনাযুক্ত ভাষা (Literature is language charged with meaning)'। কবিতার ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে সত্যি। ভাষাকে ব্যঞ্জনাযুক্ত ও ধ্বনিময় করে তুলতে হলে কথার ওজন এবং ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে চলে না। স্বতঃস্ফূর্ততা কবিতার একটা বড়ো গুণ বটে, কিন্তু আগেই বলেছি, স্বতঃস্ফূর্ততা আয়াসলভ্য।

কবিতা কেমন করে লেখা হয়? এত কথা লেখার পরও হয়তো সে প্রশ্নের জবাব হলো না। বলতে কি, কবিতা কেমন করে লেখা হয়—প্রশ্নটা এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে আমেরিকান কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাকেও বলতে হবে, 'জানি না'। কেননা যে সব উপকরণের সংমিশ্রণে সার্থক কবিতার সৃষ্টি তা স্বয়ং কবিরাই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নন এবং কবি-যশে আমার তো কোনো দাবিই নেই। তবু সাহসে ভর করে একথা নিশ্চয়ই বলা যায়—সার্থক কবিতা রচনার জন্যে সাধনা চাই আর সাধনাই কাব্যের সিদ্ধির মূলমন্ত্র।

গল্প লেখা

আগেকার দিনে গল্প লেখা সহজ ছিল। এক যে ছিল রাজা বললেই গল্প শুরু হয়ে যেত। তারপর রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্রকে তেপান্তরের মাঠ ঘুরিয়ে একবার ঘুমন্ত রাজপুরীতে এনে ফেলতে পারলেই হলো—গল্প তখন তরতর করে এগিয়ে যাবে নিজের গতিতে। জীয়ন কাঠির স্পর্শে রাজকন্যার ঘুম ভাঙবে আর তারপর বিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যের। আর রাজপুত্র-রাজকন্যের ব্যাপার যখন তখন তারা যে নিরবধিকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্যে করতে থাকবে—এতো একরকম অবধারিত। তারপর ? তারপর আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল…।

কিন্তু সেদিন আর নেই। একেতো আজকালকার ডিমোক্রাসীর যুগে রাজপুত্র রাজকন্যে সুলভ নয়। তাও যদি বা মেলে, রাজকন্যে, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্রকে ছেড়ে রাজপুত্রের কণ্ঠেই যে বরমাল্য দুলিয়ে দেবে তারই বা নিশ্চয়তা কি ! বলতে কি আজকের এই ফ্রয়েডোত্তর যুগে নায়িকার মন পাওয়া অত সহজ নয়।

কিন্তু এহ বাহ্য। আজকের যুগটা ইন্দ্রের নয়, গণেশের। রাজপুত্র-রাজকন্যের গল্পের এখন আর তেমন বাজার নেই। আর যেহেতু ওকালতি, ডাক্তারির মতো আজকের দিনে সাহিত্যও একটা পেশা—এবং হয়তো একেবারে

উপোস করবার মতো পেশাও নয়—তখন বাজারের চাহিদা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকাটা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, আশা করি কেউই সে-সম্পর্কে দ্বিমত করবেন না। কিন্তু শুধু বাজারের যুক্তি দিলে কথাটা সম্ভবত খুবই ব্যবসাদারী শোনাবে —তা ছাড়া সে যুক্তি হয়তো ষোল আনা সত্যিও নয়। তার চেয়ে বড় সত্যি হলো এই যে, যুগ পাল্টেছে—সাধারণ মানুষ আজ সাহিত্যের খাসমহলে তার অমোঘ দাবি নিয়ে উপস্থিত। সে বলছে, অয়মহম ভো—আমাকে দেখ। আজকের এই ডিমোক্রাসীর যুগে এ দাবি উপেক্ষা করে এমন সাধ্য কার? আমার তো মনে হয়, আজকের যুগে জন্মালে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকেও জগৎসিংহ-আয়েষা, কি নবকুমার-কপালকুণ্ডলার কাহিনী না লিখে হরিপদ কেরানীর জীবনচরিত রচনা করতে হতো।

হরিপদ কেরাণীর জীবনচরিত অবশ্য নিতান্তই একটা বাতকে বাত। আসল কথা হলো এই যে, আজকের গল্প-উপন্যাসের নায়ক আমার আপনার মতই সাধারণ লোক—ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে হামেশাই যার সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, আর পরক্ষণেই যাকে আমরা ভুলে যাই বেমালুমভাবে।

কিন্তু এই অতি সাধারণ লোকটিই যখন লেখকের দৌত্যে ছাপার হরফে ভূষিত হয়ে আমাদের হাতের রঙচঙে মলাটে মোড়া বইয়ের মধ্যে আশ্রয় পায় তখন সে অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে লেখক যদি দৃতিয়ালীতে সুদক্ষ হন। তখন উদগ্র কৌতূহল নিয়ে নায়কের প্রতিটি কার্যকলাপ আমরা অনুসরণ করি, তার সুখে সুখী হই, দুঃখে দুঃখী। আর তখন হয়তো আমরাও অনায়াসে বলতে পারি—আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোনো ভেদ নেই, হোক না সে সদাগরী আপিসের পঁচিশ টাকা বেতনের কনিষ্ঠ কেরাণী, যে দত্তদের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে খেতে পায়, আলো জ্বালাবার দায় বাঁচাবার জন্যে যে সন্ধেটা কাটিয়ে আসে শেয়ালদা ইস্টিশনে। এখন অবশ্য হয়তো সেখানেও লোড শেডিং।

কিন্তু কথায় কথায় আগেকার কথাটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে শুরু করার সমস্যা। গল্প তৈরি হয় মনে মনে, মনে-মনেই নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে চলে ভাঙা-গড়া খেলা আর এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই যা ছিল বিমূর্ত ভাব তা ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করে। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে বসা—অক্ষরের পর অক্ষরের মালা গেঁথে তাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করা। কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে বসলেই ভাবনা—শুরু করি কোথা থেকে।

জন্ম-মৃত্যু—ছাপার হরফে এর দূরত্ব ছোট্ট একটা হাইফেন হলেও, আমাদের মতো স্বল্পায়ু দেশেও তা অন্তত পঁচিশ বছরের প্রতীক। পঁচিশ বছর অর্থাৎ ২৫ × ১২ মাস, অর্থাৎ ২৫ × ১২ × ৩০ দিন, অর্থাৎ ২৫ × ১২ × ৩০ × ২৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ ২৫ × ১২ × ৩০ × ২৪ × ৬০ মিনিট অর্থাৎ ২৫ × ১২ × ৩০ × ২৪ × ৬০ × ৬০ সেকেণ্ড অর্থাৎ···এর পরে নিশ্চয়ই আপনি এক ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে আমাকে তেড়ে আসবেন,—আর যদি এই গুণফলটা কষতে বলি তা হলেতো কথাই নেই। কিন্তু গুণফলটা না বের করেও সংখ্যাটা যে বেশ একটা প্রমাণ সাইজের ব্যাপার হবে তা অনুমান করে নিতে কোনো অসাধারণ বুদ্ধির দরকার হয় না। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের নায়কের জীবনে যা যা ঘটেছে তা যদি লিপিবদ্ধ করতে যাই—তাহলে সে বিবরণ সম্ভবত এভারেস্টকেও ছাড়িয়ে উঠে শেরপা তেনজিংকে নতুন করে দ্বন্দ্বে আহ্বান করবে। আমি-আপনি যে সেই সাহিত্যিক এভারেস্টকে চিমটে দিয়েও স্পর্শ করবো না—তা একরকম হলফ করেই বলা যায়।

তা ছাড়া এতটা বিশদ বিবরণের প্রয়োজনইবা কি। আমার বা আপনার দিনযাত্রার রুটিনটা যদি কাগজে লেখা থাকতো আর রাতারাতি এসে যদি কোনো বিধাতা পুরুষ সকলের অলক্ষ্যে তা বদলে রেখে যেতেন, পরদিন সকালে উঠে কি আমরা তা টের পেতুম ? আপনার রুটিনওতো সেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে উধ্বর্শ্বাসে বাজারে ছোটা, বাজারটা নামিয়ে দিয়ে দু-ঘটি জল ঢেলে কোনোরকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে ট্রাম কি বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়া।

এ বিবরণ থেকে তো আমাকে আর আপনাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাবে না। আমাকে আর আপনাকে আলদা করে চিনে নিতে হলে আমার আর আপনার জীবন থেকে এমন কতগুলি ঘটনা বেছে নিতে হবে যা আমার আর আপনার স্বাতন্ত্র্যকে স্পষ্ট করে তোলে। সাহিত্যের পরিভাষায় একেই বলে 'আর্টিস্টিক সিলেকশন'—শিল্পীর নির্বাচন।

আঁতুড় ঘরে যার সূচনা আর শ্মশানে যার শেষ, অর্থাৎ জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকু, যাকে আমরা জীবন বলি—এমনিতে তা হয়তো প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে বিবর্ণ, বৈচিত্র্যহীন ; দিন থেকে দিনান্তরে, মাস থেকে মাসান্তরে তা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে টাইমে বাধা রেলগাড়ির মতো ; কবির ভাষায়, creeps into petty pace. কিন্তু এমনিতরো একঘেঁয়েমির রোমন্থনের মধ্যেও হঠাৎ

এক একটা সময় আসে—হয়তো কয়েকটি মুহূর্ত, হয়তো বা এক একটা পর্ব—তখন জীবন যেন অর্থ খুঁজে পায়, হয়ে ওঠে মহৎ এবং তাৎপর্যময়। তখন কিন্তু গোয়ালার গলির সীমাহীন ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমী যেন নিমেষে মিলিয়ে যায় আর তেমনি একটা মুহূর্তে একাকার হয়ে যায় আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণী। শিল্পী এই বিশেষ মুহূর্তটিকেই ধরে রাখেন তাঁর সাহিত্যে-কাব্যে, গল্পে-উপন্যাসে। গল্প উপন্যাস জীবন নয়, জীবনের ভগ্নাংশ। অর্থাৎ তার আরম্ভেরও একটা আরম্ভ থাকে; আবার তার শেষও সমাপ্তি নয়। বরং হয়তো নতুন আর এক গল্পের সূচনা।

নবকুমারের গঙ্গাসাগর যাত্রা থেকে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের (কিংবা রোমান্স, যাই বলুন) শুরু—নবকুমারের জীবনের নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু নবকুমারের পূর্বজীবন সম্পর্কে লেখকের (এবং সম্ভবত পাঠকেরও) কৌতূহল সামান্যই—কেন না, সে জীবন তাৎপর্যহীন। (বঙ্কিমচন্দ্র তবু খানিকটা গঙ্গাসাগর যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। আজকের যুগের লেখক হলে হয়তো—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" থেকেই শুরু করতেন—পরে হয়তো কথাচ্ছলে একসময় নবকুমারের গঙ্গাসাগর যাত্রা সম্পর্কে ততটুকুই বলে নিতেন, যতটুকু একেবারে না বললেই নয়।) আবার বঙ্কিম যেখানে ছেদ টেনেছেন সেখানেই নবকুমারের এবং সম্ভবত কপালকুণ্ডলারও জীবনের শেষ নয়। বলতে কি, বঙ্কিম যেখানে শেষ করেছেন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী'। আবার রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' তো সন্ধেবেলার প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলার সলতে পাকানোরই গল্প। যে অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনে কাহিনীর শুরু, যোগাযোগ উপন্যাসে সেতো উপলক্ষ্য মাত্র। কাহিনী আসলে আবর্তিত হয়েছে মধুসূদন কুমুদিনীকে কেন্দ্র করে। মধুসূদন-কুমুদিনী দুই প্রকৃতির মানুষ। জীবনের মূল্যবোধের দিক থেকে তাদের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। ভাগ্যচক্র যখন তাদের মিলিয়ে দিল, তখন দেখা গেল চুম্বক-তত্ত্ব জীবনের ক্ষেত্রে সব সময় প্রযোজ্য নয়। সেখানে বৈপরীত্য পরস্পরকে আকর্ষণ করে না—বরং কাছে আসতে গেলে আরও দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু অবিনাশ কুমুদিনীর পেটে এলো এই যোগাযোগেরই ফল হিসেবে। কুমুদিনীর সমস্যার সমাধান অবশ্য এতে হলো না—কিন্তু এরপর ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কুমুদিনীর আর উপায় কি। রবীন্দ্রনাথ এখানেই থেমেছেন—কেন না, এরপরে কুমুদিনীর জীবনে লেখকের কৌতূহলী হবার আর কিইবা অবশিষ্ট থাকে।

কিংবা 'শেষের কবিতা'র কথাই ধরা যাক। অমিত আর লাবণ্যের বিচ্ছেদ কিংবা অমিত আর কেতকী, শোভনলাল আর লাবণ্যের মিলনে শেষের কবিতার শেষ। এর পরে তারা নিরবধিকাল সুখে-শান্তিতে ঘর-কন্যে করতে থাকলো, না শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের জন্য আদালতের শরণ নিল, রবীন্দ্রনাথ তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। অমিত সযত্নে কেটির গালের এনামেলের রঙ তুলতে ব্যস্ত, প্রসঙ্গত এই রকম একটু ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন। সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল কিনা, কিংবা লাবণ্য তার করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষভরে পান করে শোভনলালের কাছে নিজেকে তিলে তিলে দান করার সঙ্কল্পে অটুট থাকতে পেরেছিল কিনা—রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব এবং অন্তত আমার তো (এবং সম্ভবত অনেকেরই) সে সম্পর্কে কোনো কৌতূহল নেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথ যেখানে থেমেছেন সেখানেই অমিত-লাবণ্য জীবনের মহত্তম অধ্যায়ের শেষ। এরপর তো নিত্যকারের দিনযাত্রা, যার মানে বাজারের হিসেব, জীবিকার চিন্তা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেদবৃদ্ধি আর পলিত কেশ, স্তিমিত জীবন অমিত আর বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী লাবণ্য সম্পর্কে আমরা কেনই বা কৌতূহলী হবো। বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ যেখানে থেমেছেন, সেখানে না থেমে যদি আরও পাতার পর পাতা লিখে যেতেন তাহলে, এমন কি রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য লিপিদক্ষতা সত্ত্বেও, আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে তা, হয়তো পাঠককে টানতো না।

আসল কথা, গল্প যেমন শুরু করতে জানা চাই, তেমনি থামতে জানাটাও একটা আর্ট। তিনি তত বড় শিল্পী যিনি উপযুক্ত মুহূর্তে থামতে জানেন।

কিন্তু কথায় কথায় আমরা আবার সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে এসেছি— গল্প, উপন্যাস জীবনের অখণ্ড প্রতিলিপি নয়, শিল্পী কর্তৃক নির্বাচিত অংশ মাত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অংশ সম্পূর্ণের তুল্যমূল্য তো নিশ্চয়ই, হয়তো অধিকতর মূল্যবানও বটে। আর অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে—অংশ কখনও সম্পূর্ণের সমান হতে পারে না—এই জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ কার্যকর নয়।

কিন্তু এদিকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে আমরা আর একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গেছি। না হয় হলোই গল্প-উপন্যাস শিল্পী কর্তৃক নির্বাচিত জীবনের অংশ মাত্র, কিন্তু শিল্পী জীবনের যে অংশ নির্বাচন করেন, তাকে কি রূপায়িত করেন অবিকৃতভাবে? সাহিত্য কি বাস্তবের অবিকৃত প্রতিরূপ? অবশ্যই নয়।

জীবন ছাড়া সাহিত্য হতে পারে না তা ঠিক। কিন্তু সাহিত্যে জীবনকে অবিকৃতভাবে রূপায়িত করতে হবে এ দাবি তাই বলে সাহিত্যের নয়, সাংবাদিকতার।

আসল কথা, শিল্পী শুধু জীবনের একটা অংশই যে বেছে নেন তা নয়—তাকে ভেঙে চুরে কিছু বাতিল করে, কিছু জুড়ে নতুন করে গড়ে তোলেন। অর্থাৎ বাস্তব যখন শিল্পীর মনের অতসী-কাচের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে অক্ষরের মালায় বা তুলির আঁচড়ে রূপ পরিগ্রহ করে, তখন দেখা যায় তাতে নতুন কিছু যোগ হয়েছে—তা হচ্ছে শিল্পীর কল্পনা।

পুরাকালে অযোধ্যা নগরে রামচন্দ্র নামে কোনো রাজা ছিল কিনা ইতিহাস তা নিশ্চয় করে বলতে পারে না। কিন্তু সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও একথা একরকম হলফ করে বলা যায়, মহাকাব্যের বাইরে রামচন্দ্রের যদি কোনো অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তাহলে বাল্মীকির রামচন্দ্রের সঙ্গে তার মিল উপেক্ষণীয়। মহাকাব্যের রামচন্দ্র বাস্তবের রামচন্দ্র থেকে বড়ও বটে, ছোটোও বটে। বড় এই অর্থে যে, বাল্মীকীর কবি-কল্পনা তাকে মহত্তর করেছে, আর ছোট এই অর্থে যে, রক্তমাংসের রামচন্দ্র দোষে-গুণে মিলে যে রকমটি ছিলেন, মহাকাব্যের রামচন্দ্রকে ঠিক সে রকমটি করে আঁকা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই চিরকালের সত্যটিকেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়: "ঘটে যাহা তাহা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমে রামের জন্মস্থান।"

অর্থাৎ গল্প লিখতে হলে বাস্তবকে গ্রহণ করতে হবে। কিংবা আরও সঠিক-ভাবে বললে, বাস্তবকে গ্রহণ করে বর্জন করতে হবে। হরিপদ কেরাণীকে নিয়ে গল্প লিখতে গেলে ভুলে যেতে হবে হরিপদ কেরাণীকে, ভুলে যেতে হবে তার নিত্যকারের দিনযাত্রার রুটিন, তার পরিবেশ। শিল্পীর কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন পরিবেশ, নতুন হরিপদ কেরাণী—যাকে দেখে মনে হবে চিনি উহারে অথচ চিনি না। আর এই গল্পের হরিপদ কেরাণী বাস্তবের হরিপদ কেরাণী অপেক্ষা সত্য—কেননা, তার জবিন তাৎপর্যহীন নয়। বাস্তবের হরিপদ কেরাণীর সঙ্গে আকবর বাদশার যতোই গরমিল থাক, গল্পের হরিপদ কেরাণীর সঙ্গে তার কোনো ভেদ নাই।

উপন্যাসের চরিত্র

ডেনমার্কে হ্যামলেটের কবর আছে, পর্যটকদের তা দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীতে জুটল্যাণ্ডে হ্যামলেট নামে কোনো রাজপুত্র সত্যই ছিলেন কি? ঐতিহাসিকেরা এ-প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই দেবেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যাই বলুন, আমরা বলব, হ্যামলেট নিশ্চয়ই ছিলেন, কেননা শেক্‌সপীয়র তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রক্তমাংসের উপস্থিতি আমরা অনুভব করেছি, তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বে আমরা পীড়িত হয়েছি। নিছক কবি-কল্পনা হলেও হ্যামলেট তাই সত্য। বাস্তব অপেক্ষা সত্য।

লেখক বিধাতাপুরুষের মতো নিজ সৃষ্ট চরিত্র দিয়ে পৃথিবীকে জনাকীর্ণ করে তোলেন। আমরা কথা-দিয়ে-রচা সেই-সব মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগী হই, তাদের মিলনবিরহ, হাসি-কান্নার অংশ পাই। গোরা কি শ্রীকান্ত আমাদের এই মর্ত্যধামে কোনদিনই হয়তো বসতি করেনি, তবু তারা জীবিত মানুষের চেয়ে কম জীবন্ত কি?

কথা—কাগজের বুকে কয়েকটা কালির আঁচড় মাত্র, কয়েকটা প্রতীক। তবু কোন যাদুমন্ত্রবলে সেই কথার পর কথা সাজিয়ে লেখকেরা এমন-সব জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেন? বাঙলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র এই রহস্যের কিছুটা আঁচ দিয়েছেন।

নীলদর্পণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "দীনবন্ধু অনেক সময়ই শিক্ষিত ভাস্করের বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন।...এইটুকু গেল তাঁহার realism, তাহার উপর idealise করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ-দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে বসাইতে জানিতেন।"

পদ্ধতিটা অবশ্য দীনবন্ধুর কিছু স্বকীয় নয়। বিশ্বসাহিত্যের চিত্রশালায় বিচিত্র, বর্ণাঢ্য যত আলেখ্য আমাদের মনকে সম্মোহিত করে রাখে তার সবগুলিই মোটের উপর এই একই পদ্ধতিতে রচিত।

ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-এর অনেকগুলি প্রধান চরিত্রই তলস্তয় পরিবার থেকে আহরিত। ডিকেন্স মিকোবার চরিত্র এঁকেছিলেন তাঁর পিতার আদর্শে। শোনা যায়, গোরা চরিত্রের প্রেরণা নাকি ভগ্নি নিবেদিতা। তুর্গেনিভ স্বীকার করেছেন, কোন-একজন জীবন্ত মানুষ সামনে না রেখে তিনি চরিত্রসৃষ্টি করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, জীবন্ত আদর্শ সামনে না থাকলে উপন্যাসের চরিত্রে প্রাণসঞ্চার করা যায় না। সমরসেট মম লিখেছেন, জীবন্ত আদর্শ সামনে রেখে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, একথা যে লেখক অস্বীকার করেন তিনি হয় নিজেকে ঠকান, নয়তো ঠকান আমাদের। হতে পারে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে মনে করে হয়তো তিনি গল্প ফাঁদেন নি, কিন্তু সে ক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞাতসারে হলেও স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে ধার করেছেন নিশ্চয়ই। আর সে-ঋণ তো পেছনের দরজা দিয়ে বাস্তব জীবনের কাছ থেকেই ঋণ, অধমর্ণ সে সম্পর্কে সচেতন থাকুন বা না থাকুন।

বাস্তব-জীবন থেকে অবশ্য তৈরী গল্প পাওয়া যায় কদাচিৎ। তথ্য অনেক সময়ই ক্লান্তিকর হয়ে উঠে। বাস্তব জীবন, সত্য ঘটনা সাহিত্যিকের কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু তিনি যদি তথ্যের চতুষ্কোণের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, তা হলে তার সৃষ্টি-প্রতিভা খর্ব হয়ে পড়ে। সে-ক্ষেত্রে তাঁর রচনা সাহিত্য হিসাবে সফল না হবারই সম্ভাবনা।

শোনা যায়, স্তাঁদাল নাকি 'দি রেড অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক' লিখেছিলেন একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করে। বাস্তব ঘটনার আর স্তাঁদালের উপন্যাসের নায়ক অবশ্য এক ব্যক্তি নয়। 'রেড অ্যাণ্ড ব্লাক'-এর জুলিয় সোরেলকে স্তাঁদাল গড়েছিলেন নিজের ছাঁচে। নিজে তিনি যা হতে চান সোরেল চরিত্রে তা আরোপ

করেছিলেন স্তদাঁল। আর এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বলতম, বিচিত্রতম চরিত্রের একটি। কিন্তু স্তদাঁল শেষ পর্যন্ত তথ্যের কারাগার ভেঙে বেরোতে পারেন নি। ফলে সোরেল চরিত্র শেষের দিকে হয়ে উঠেছে অসঙ্গতিতে ভরা।

বাস্তব জীবনে মানুষের চরিত্রে অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু গল্পের চরিত্রে তা হবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সত্য···অদ্ভুত হইতে ভয় করে না' কিন্তু গল্পকে 'লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান' হয়ে চলতে হয়।

তবে কি উপন্যাসের পাত্রপাত্রী শুধু সাদা বা শুধু কালো রঙে আঁকা ছবি হবে? সে রকম কোন নিয়ম নেই অবশ্য। এক-রঙা ছবি উপন্যাসে বরং অন্ত্যজ বলেই গণ্য। গল্পের নায়কের চরিত্রে অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু সেই অসঙ্গতিরও একটা সঙ্গতি থাকা চাই। গল্পের নায়ক অযৌক্তিক কাজ করতে পারে, কিন্তু তার পেছনেও একটা যুক্তি থাকা চাই। এক ফরাসী সমালোচক লিখেছেন, উপন্যাসে আকস্মিকতা বলে কোনো বস্তু নেই। সেখানে হৃদয়াবেগ, পাপ এবং দুঃখভোগ—সব কিছুই স্বেচ্ছাকৃত।

বাস্তব জীবনে এমন-কি ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকেও আমরা সম্পূর্ণ করে জানি না। সভ্যসমাজে একের কাছে অপরের মনের কথা উজাড় করে খুলে বলার রীতি নেই। আমরা একে অপরকে জানি পরস্পরের বাহ্যিক আচার-আচরণ দিয়ে। কিন্তু উপন্যাসের নায়কের জীবন খোলা বই—তার চলা-ফেরা, ভাবনা-চিন্তা কোনো কিছুই আমাদের কাছে গোপন থাকে না। সুতরাং জ্ঞানের অভাব পূরণ করতে হয় কল্পনা দিয়ে।

লেখক জীবন্ত আদর্শ সামনে রেখে লেখেন বটে, কিন্তু তার হুবহু অনুকরণ করেন না। মর্তের মানুষের কাছ থেকে তিনি সেইটুকুই শুধু নেন, যেটুকু তাঁর প্রয়োজন, যেটুকু তাঁর কল্পনাশক্তির উদ্রেক করে—একটু হয়তো মুদ্রাদোষ, একটু বাগ্‌ভঙ্গী, একটু-বা অন্য-কোনো বৈশিষ্ট্য। এই তাঁর খড়-মাটি, এর ওপর কল্পনার রঙ চড়িয়ে তিনি মূর্তি গড়েন। সে-মূর্তির সঙ্গে মর্ত্যের মানুষের মিল থাকে সামান্যই।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' এককালে নীতিবাদী মহলে তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল—কেননা সে-বইয়ে বিবাহিতা বিমলা পরপুরুষে আসক্ত হয়েছিল এবং জবানবন্দীর আকারে সে-কথা সে স্বীকার করেছে। উত্তেজনা যথেষ্ট হয়েছিল, লেখালেখিও কম হয়নি। তখন এক মহিলা পত্রাঘাত করে জানতে চেয়েছিলেন,

"এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কি আমার কল্পনাপ্রসূত, না বাস্তবে তার কোথাও আভাস পাওয়া গেছে। যদি পেয়ে থাকি তবে সে কি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দু পরিবারে ?"

পত্রলেখিকার প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন এখানে তা উদ্ধার করা প্রাসঙ্গিক হবে : "ঠিক একটা গল্পের ঘটনা অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে, আর কোথাও ঘটতে পারে না—প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা অহিন্দু কোনো পরিবারে না। অতএব কোনো বিশেষ পরিবারে কি ঘটেছে তা স্মরণ করে গুজব করাই চলে, গল্প লেখা চলে না। মানবচরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেই গুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুই জায়গায় ঠিক একই রকমে ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে। এই জন্য সেই মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনা নকল করার প্রতি নয়।"

প্রক্রিয়াটি আরও-একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গর্কি তাঁর একটি রচনায়। গর্কি লিখেছেন, "পিতার জীবন ও পেশা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ এই রকম কয়েক ডজন বণিক-সন্তানকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি 'ফোমা গরদিয়েভ' লেখবার জন্য।...ফোমার ধর্মপিতা মায়াকিনের চরিত্রটিও নানাজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে গড়া।...যদি কোনো লেখক বিশ-পঁচিশ কি একশ জন দোকানদার, রাজপুরুষ কি শ্রমিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রুচি-অভিরুচি, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে একটি দোকানদার, রাজপুরুষ কি শ্রমিকের চরিত্রে আরোপ করতে পারেন, তবে তিনি যে চরিত্র সৃষ্টি করবেন তাই হবে প্রকৃত শিল্পকর্ম।"

প্রক্রিয়াটি কাগজে কলমে খুবই সহজ মনে হচ্ছে হয়তো, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। খাতা-পেন্সিল নিয়ে পঞ্চাশ জন দোকানদারের 'ইণ্টারভিয়ু' নিলেই চরিত্র সৃষ্টি করা যায় না। গর্কির ভাষায়, "সাহিত্য-সৃষ্টি, চরিত্র-সৃষ্টির জন্য চাই কল্পনা-শক্তি, অনুভূতি, মনে-মনে-জিনিস-বানাবার (মেক্ থিঙ্স আপ) ক্ষমতা।"

জোলা কোনো বিশেষ চরিত্র-সৃষ্টির জন্য সেই ধরনের মানুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাতেন, তাদের জীবনযাত্রা আচার-আচরণের খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ

করতেন। বলজাক এত সবের ধার ধারতেন না। তবু বলজাকের চরিত্রগুলির পাশে জোলার চরিত্রগুলি নিরক্ত, প্রাণহীন মনে হয়—যদিও হয়তো তার সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আছে। আসলে জোলার ছিল না সেই কল্পনাশক্তি যা নীরস তথ্যকে রূপে-রসে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে।

তথ্য সংগ্রহের দরকার আছে, কেননা অনুমানের উপর নির্ভর করতে গেলে দশটার মধ্যে নটি ক্ষেত্রেই ভুল হবার সম্ভাবনা! কিন্তু উপন্যাসে তথ্যের স্থান গৌন। গল্পের রানী ভিক্টোরিয়াকে সত্যিকারের রানী ভিক্টোরিয়া হবার দরকার নেই—হলেই বরং তা আর গল্প থাকবে না, হবে স্মৃতিকথা। স্মৃতিকথা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, তার ভিত্তি তথ্য। কিন্তু উপন্যাসে তথ্যের সঙ্গে আরও কিছু চাই।

ঔপন্যাসিক তথ্যের সবটা ব্যবহার করেন না। 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে।' ঝাড়াই-বাছাই করে তার যতটুকু দরকার ততটুকুই শুধু নেন। আর এই ঝাড়াই বাছাইয়ের প্রক্রিয়াটা নির্ভর করে বিশেষ লেখকের বিশেষ মনোভঙ্গীর উপর।

মাদাম বোভারী কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্লবের নাকি বলেছিলেন, এম্মা আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি।

হেঁয়ালীর মতো শোনালেও ফ্লবের খুব একটা সত্য কথাই বলেছেন। মানুষ নাকি দেবতা গড়ে নিজের ছাঁচে। তেমনি ঔপন্যাসিকও চরিত্র গড়েন নিজের ছাঁচে। কেননা, অন্য মানুষকে তিনি জানেন বাইরে থেকে, একমাত্র নিজেকেই জানেন ভেতর থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই তাই নানা জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজেকেই তিনি পরিবেশন করেন নানা নামে, নানা রূপে।

সাহিত্যরুচি

সাহিত্যে অশ্লীলতার ধুয়োটা সাহিত্যেরই সমবয়স্ক সম্ভবত। ইতিহাস-শাস্ত্রে আমার তেমন ব্যুৎপত্তি নেই—সুতরাং ভুরি ভুরি নজির দিয়ে যুক্তিকে দুর্ভেদ্য করতে পারব না। কিন্তু ইতিহাস-শাস্ত্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় না করেও একটি-দুটি নজির দেওয়া যায়। আর সত্যিই তো বঙ্কিমচন্দ্রের এক মানসকন্যা 'আয়েষা' যখন লোকসমক্ষে এই বলে ঘোষণা করেছিল "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর", তখন সমাজের নীতিবাগীশেরা যে মূর্ছা গিয়েছিলেন—যাঁরা ইতিহাস-বেত্তা নন এখবর তো তাঁদেরও জানা আছে। বিদেশী সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই এও জানেন যে অশ্লীলতার অপবাদে ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি'কেও একদা রাহুগ্রস্ত হতে হয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রও এ অপবাদ এড়াতে পারেননি।

তারপর অনেক কাল কেটেছে। সাহিত্যও আছে, নীতি-বাগীশেরাও অন্তর্হিত হননি। তবু দুর্গেশনন্দিনী কি মাদাম বোভারি তো বটেই, তার থেকে ঢের রোমহর্ষক বইও কট্টর নীতিবাদীদের সমাজে জলচল হয়ে গেছে। বরঞ্চ এইগুলিই এখন নীতিবাদীদের থান ইট—যা তাঁরা আধুনিক সাহিত্য লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন, সুবিধেমতো।

সাহিত্যও আছে, অশ্লীলতার ধুয়োটাও মিলোয়নি—শুধু পাশমার্কটাই

বদলে গেছে এই যা। তাছাড়া 'অশ্লীলতা' বলতে কী বোঝায় তারই কি কোনো মীমাংসা হয়েছে?

ত্রিশের যুগে অশ্লীল সাহিত্যের আদান-প্রদান নিরোধ করার উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে জেনেভায় একটা আন্তর্জাতিক বৈঠক বসেছিল। গ্রীকরা দার্শনিকের জাত, প্রথমেই তাঁরা প্রস্তাব করলেন, অশ্লীলতার একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ এল ব্রিটিশ প্রতিনিধির কাছ থেকে। তিনি বললেন, ব্রিটিশ আইনে অশালীন বা অশ্লীল শব্দের কোনো সংজ্ঞা নেই। দেখা গেল, অন্যান্য দেশের আইনও এ ব্যাপারে যথেষ্ট দ্ব্যর্থহীন নয়। তখন সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হলো যে অশ্লীলতার কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর নানান দেশের ভাগ্যবিধাতারা যে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বিরত থাকাই আমি বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করি। কিন্তু শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটা বাদ দিলেও, সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচির প্রশ্ন থেকেই যায়।

আত্মাকে জানতে হলে নাকি নেতি-নেতি করে আরম্ভ করতে হয়। বুঝতে হয়, আত্মা দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়—তবেই আত্মার স্বরূপ প্রতীতি হয়। আমরাও নেতি-নেতি করেই শুরু করব। খতিয়ে দেখব কুরুচিকর বা অশালীন বলতে কী বোঝায়।

অবশ্য ক্লবেরের মতে কাগজের বুকে কলম ঠেকানোটাই এক হিসেবে রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ। কেননা, লেখার পেছনে যে প্রবৃত্তি কাজ করে তা আত্ম-জাহিরের আর আত্মজাহিরের প্রবৃত্তিটা সব সময়েই কুরুচিকর।

কিন্তু মানুষ যেমন পাপ-পুণ্যের খতিয়ান করতে বসে আদম-ইভের আদিপাপকে হিসেবের মধ্যে ধরে না, আমরাও তেমনি রুচির বিরুদ্ধে আদি-পাপকে উপেক্ষা করেই আলোচনায় নামব। অবশ্য এ-সব কথা হয়তো অবান্তর, কেননা এ প্রতিশ্রুতি তো নিবন্ধটির নামেই অনুস্যূত।

তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। ঈশ্বরের আদেশ মেনে ভালোছেলের মতো মানুষ যদি জ্ঞানবৃক্ষের ফল আহারে বিরত থাকত তাহলে জ্ঞানজনিত দুঃখকষ্টের হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পেত কি না তা নিঃসংশয়ে বলা না গেলেও, মানুষের ইতিহাস বলে কোনো কিছুর যে উদ্ভব হতো না একথা এক রকম হলফ করেই বলা যায়। সে অবস্থাটা মঙ্গলকর হতো কি না তা অবশ্য

স্বতন্ত্র কথা। তেমনি রুচির বিরুদ্ধে কেউ কেউ আদিপাপে প্ররোচিত হয়েছে বলেই না (স্বয়ং ফ্লবেরও বাদ যাননি) আমরা সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে পারছি!

প্রত্যেক মানুষই যেমন পাপ-পুণ্যের জাবেদা খাতায় আদিপাপের অঙ্কে কিছু-না-কিছু যোগ করেন-ই তেমনি সাহিত্যিকমাত্রেই হয়তো রুচির বিরুদ্ধে কিছু-না-কিছু অপরাধ করেই যান। আর এ-কথা হয়তো মিথ্যে নয় যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা কোনোদিনই কলম স্পর্শ করেন নি। কিন্তু তাঁরা সুরুচির সপ্তম স্বর্গে এমন সুরক্ষিতভাবে বাস করেন যে তাঁদের নিয়ে আলোচনাই চলতে পারে না।

অর্থাৎ, কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমাদের আলোচনায় সুরুচি বলে যা গ্রাহ্য করব তা একেবারে নিখাদ হবে না। তাছাড়া, সুরুচি এবং কুরুচির দ্বন্দ্বটা সু- এবং কু-র দ্বন্দ্বও নয় আসলে। ভালোমানুষও যে মারাত্মক রকমের অশালীন হতে পারে, শোক-ভালোবাসা বা আবেগ জানানোর পদ্ধতিটাও যে হতে পারে একান্ত অশোভন ও কুরুচিকর—সে অভিজ্ঞতা হয়তো আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর আছে।

তাছাড়া সাহিত্যের ব্যাপারে অঙ্কের নিয়ম তো চলে না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এটা অবিসম্বাদী সত্য। পলাশীর যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট তারিখে হয়েছিল একথাও হলফ করে বলা যায়। কিন্তু 'চতুরঙ্গ'-এর থেকে 'গোরা' যে ভালো বই এমন কথা জোর করে কেউ বলতে পারে কি?

আসলে রুচি বা শালীনতার কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বামন লিখেছেন, সেই বাক্যই অশ্লীল যা 'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলা-তঙ্কদায়ী'। অর্থাৎ যে বাক্য শুনে মনে লজ্জা, ঘৃণা অথবা অমঙ্গল-আশঙ্কার উদয় হয় সেই বাক্যই অশ্লীল। বিলেতের এক আদালত রায় দিয়েছেন যে বই পড়তে পড়তে কমবয়েসি ছেলেমেয়ের গাল লাল হয়ে উঠবে তাই নাকি অশালীন ও কুরুচিকর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন বাক্য কার মনে লজ্জা এবং ঘৃণার উদ্রেক করে? উনবিংশ শতাব্দীতে জীবন-রহস্যের যে ধরনের আলোচনায় কমবয়েসি ছেলেমেয়ের গাল লাল হয়ে উঠত আজও কি তা হয়? বিলেতের এক কাগজে দেখলাম বারট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন, ভিক্টোরিয়ান যুগে লোকে মেয়েদের গোড়ালি দেখেই নাকি রোমাঞ্চিত হত!

কাজেই বামনের উক্তিকে বা বিলেতের আদালতের রায়কে শালীনতা-

নির্ণয়ের গজকাঠি বলে যদি মেনেও নি, তাহলেও এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে পিসার মানমন্দিরে রক্ষিত গজকাঠির মতো এটি অপরিবর্তনীয় নয়।

একটি-দুটি উদাহরণ নিলে কথাটা হয়তো পরিষ্কার হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে 'সদ্বংশজাতা সুরুচিসম্পন্না' মেয়ে বলতে বোঝাত পাণ্ডুবর্ণ অগ্নিমান্দ্যপীড়িত মেয়ে—পান থেকে চুন খসলেই যার স্মেলিং সল্টের প্রয়োজন হত। জেন অস্টেনের নায়িকাদের দেখে আমরা করুণা করতে পারি কিন্তু সেকালের সমাজে এই ছিল তাদের বিধিলিপি। ধনীর ঘরের দুলালীর কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। যাতে শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয় এ-রকম কোনো কাজ করাটা ছিল আভিজাত্যের পরিপন্থী আর খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসনও মেয়েদের দস্যিপনায় নিরুৎসাহিত করত। কাজেই বনেদী ঘরে মেয়েরা যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

এক সময়ে ফরাসি ট্রাজিক নাটকে রুমালের উল্লেখ অশালীন বলে বিবেচিত হতো—যেন নাকের অস্তিত্বটা শুধু কে রোমান আর কে গ্রীক তা বোঝবার জন্যই! এই ধরনের সাহিত্যিক 'একুশে আইন' অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে, তবু হয়তো তা অপরিহার্য। তবে আশার কথা এই যে এ-সব প্রথা বা বিধিনিষেধ চিরস্থায়ী নয়।

সুরুচি এবং শালীনতার মানদণ্ড সমাজের প্রয়োজন দিয়েই নির্ধারিত। আর যেহেতু সমাজ বদলায়, সামাজিক প্রয়োজন বদলায়, বদলে যায় সমাজ-মন—রুচি এবং শালীনতার মানদণ্ডও তাই না বদলে পারে না।

একটু সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা হয়তো এ-প্রসঙ্গে অরুচিকর হবে না।

আধুনিক সাহিত্য ও রুচিবোধের পাঠ আমরা নিয়েছি ইংলণ্ডের কাছ থেকে। সুতরাং ইংলণ্ডের কথাই বলব।

যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসেও এক-একটা যুগকে 'বীরযুগ' বলে চিহ্নিত করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী হচ্ছে ইংলণ্ডের পক্ষে তেমনি এক আর্থনীতিক বীরযুগ। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রিভস-এর স্পিনিং জেনি আবিষ্কৃত হলো, ১৭৬৫ সালে ওয়াট-এর বাষ্পচালিত এঞ্জিন—আর তারই প্রভাবে ইংলণ্ডে সংঘটিত হলো শিল্পবিপ্লব, সূচনা হলো ইংলণ্ডের একটানা আর্থনীতিক দিগ্বিজয়ের, সমাজদেহে সঞ্চারিত হলো গতির নতুন আবেগ। ইংলণ্ডের শিল্প-সাহিত্যেও সে গতির ছোঁয়া লাগল। সাহিত্যিক তখন ছিলেন আশাবাদী, তাঁর দৃষ্টির দিগন্ত তখন প্রসারিত হচ্ছে, সত্যকে তিনি তখন মুখোমুখি দেখতে ভয় পান নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্যিকেরা নতুন সমাজের নতুন মানুষ ও নতুন মানবিক সম্পর্কের মূল্যায়ন সাহসের সঙ্গেই করেছেন।

কিন্তু অচিরে মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হলো।

শিল্পবিপ্লব মানুষের অর্থনীতিকেই শুধু যে বদলে দিয়েছিল তা তো নয়, বদলে দিয়েছিল সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ককেও। নবোদ্ভুত বৈশ্যরাজকতন্ত্র পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিকেও করল নির্বাসিত। মানুষের মূল্য নির্ধারিত হতে থাকল টাকা-আনা-পাইএর গন্ধময় হিসাবে। মুনাফার দেবী বসলেন সম্রাজ্ঞীর আসনে। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার স্থান অধিকার করল নগ্ন স্বার্থবুদ্ধি। শঠতা আর মিথ্যাচারের স্থূল হস্তাবলেপে কলুষিত হলো মানুষের চরিত্র। সাহিত্য হলো পণ্য আর সাহিত্যিক কলমপেষা-মজুরমাত্র।

গোড়ার দিকে, অর্থাৎ রেনেসাঁস থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব অবধি এ-সত্য ততটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। মানুষ যেমন ঠিক তেমনিভাবে তাকে চিত্রিত করতে, মানুষকে সমগ্রভাবে সাহিত্যের পটে ধরতে, অতীত ও বর্তমানের সমালোচনা করতে তখন লেখকের কোনো বাধা ছিল না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈশ্যরাজকতন্ত্রের নির্মম স্থূল চরিত্র দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। হাক্সলির ভাষায়, 'It was difficult for a sensitive man to see and smell the already putrefying corpse of industrial civilization'। সাহিত্যিকেরা নিশ্চয়ই সংবেদনশীল মানুষ। তাই বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের কেউ-বা আশ্রয় খুঁজলেন অতীতের গৌরব-গাথা-রোমন্থিত স্বপ্নের জগতে, কেউ বা চোখ বুজে মহৎ আদর্শের জন্যে বিলাপ শুরু করলেন। বাস্তব নিয়ে মাথা ঘামানোটা অনেকের কাছেই স্থূল ও অশালীন বলে মনে হলো।

আসলে ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যিকের দ্বিধাটা ছিল এই যে, বাস্তব মানুষকে সাহিত্যের পটে বিধৃত করতে গেলে সমাজের স্বার্থবুদ্ধিকলুষিত রূপটিই নগ্ন করে ধরতে হয়, প্রকাশ করে দিতে হয় লাভ-লোকসানের গন্ধময় নিয়মে-বাঁধা সমাজের স্বার্থ-সংঘাতের করাল কঠোর বীভৎস রূপটিই। সমাজ, অর্থাৎ সমাজপতিরা কেমন করে তা বরদাস্ত করেন! অতএব যখনই সাহিত্যে সমাজের বাস্তব রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে, কিংবা মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ওপর থেকে ভুয়ো আদর্শবাদের চকচকে ভেলভেট পর্দাটা একটুখানি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে

তখনই সমাজপতিরা গেল-গেল রব তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছেন। সমাজের শাসনদণ্ড নেমে এসেছে সেই সব লেখকের ওপর। আর একথা তো অনেকেরই জানা আছে যে, হার্ডির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার ভয় দেখানো হয়েছিল—ফ্লবের, গঁকুর, জোলাকে দাঁড়াতে হয়েছিল আসামীর কাঠগড়ায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভিক্টোরিয়ান রুচিবায়ুর পেছনে সামাজিক কারণ একটা ছিল আর তার লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ততটা নয়, যতটা সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। আর সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা বস্তুটা যে কি তা তো প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তিরিশ বছর আগেই লিখে রেখে গেছেন: '···সমাজের স্বাস্থ্য-রক্ষার অর্থ সমাজরক্ষা। সমাজ সুস্থই হোক আর অসুস্থই হোক তা যেমন আছে সেই ভাবেই টিকে থাক এই হচ্ছে তাদের আন্তরিক কামনা।'

ইংলণ্ডের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এই যুগে। আধুনিক সাহিত্যের পাঠ আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে নিলাম তো বটেই, নিলাম তাদের রুচিবায়ুও কিন্তু ভুলে গেলাম যে রুচিবায়ুরও একটা সামাজিক ইতিহাস আছে। অবশ্য বঙ্কিমের সাহিত্য নিয়ে এককালে যে গোলযোগ বেধে গিয়েছিল তার কারণটা ছিল অন্য। বঙ্কিম আমাদের প্রথম ঔপন্যাসিক। আর উপন্যাস বস্তুটাই হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন সমাজের পক্ষে একটা বিস্ফোরক পদার্থ, কেননা ব্যক্তি-মানুষের স্বীকৃতিই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। বঙ্কিম অবশ্য তাঁর উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত সনাতন প্রথারই জয় দেখিয়েছেন কিন্তু তাহলে কী হয়—সেই জয় দেখাতে গিয়ে হিন্দু বিধবা কুন্দনন্দিনীর পুনর্বিবাহ তো দিতে হয়েছে তাঁকে, রোহিনী গোবিন্দলালের প্রণয় তো না ঘটিয়ে পারেননি তিনি—সমাজপতিদের কাছে এইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আতঙ্কের কারণ। নইলে নারীর দেহ বা কামলীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে তো বিরল নয়।

কিন্তু কেউ আতঙ্কিত হবেন বলে সত্য বলা থেকে বিরত থাকা সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। হাক্সলি ঠিকই বলেছিলেন, "The fact that many people should be shocked by what he writes practically imposes it as a duty upon the writer to go on shocking them. For those who are shocked by truth are not only stupid but morally reprehensible as well, the stupid should be edu-

cated, the wicked punished and reformed. All these praiseworthy ends could be attained by a course of shocking; retributive pain will be inflicted on the truth-haters by the first shocking truths, whose repeatation will gradually build up in those who read them an immunity to pain and will end by reforming and educating the stupid criminals out of their truth-hating. For familiar truth ceases to shock. To render it familiar is therefore a duty. It is also a pleasure!"

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আজ আর রুচিবায়ুগ্রস্তদের আতঙ্কিত করে না, এমন কি কল্লোল-যুগের যৌনধর্মিতাও এখন জলচল হয়ে গেছে—হাক্সলির বক্ষ্যমান উক্তিটি যে কত সত্য এ-থেকেই তা বোঝা যাবে।

সাহিত্য নীতিশাস্ত্রের দাস নয়, তবু সাহিত্যেরও একটা নীতিশাস্ত্র আছে। সাহিত্যের সুরুচি-কুরুচির প্রশ্নটা যাচাই হয় সেই শাস্ত্রের নিরিখেই।

নীতিশাস্ত্রের বিচারে যে বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্দোষ, সাহিত্যের নীতিশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাও হয়ে উঠতে পারে একান্ত কুরুচিকর।

সংস্কৃত আলঙ্কারিক বামন-এর একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে:

কষ্টং কথং রোদিতি ফুৎকৃতেয়ম্

যৌনব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা যদি অশ্লীল হয় তবে এ-বাক্যে অশ্লীলতার নাম-গন্ধও নেই—তবু ফোঁ-ফোঁ করে কাঁদছে কথাটা করুণ রসের উদ্রেক তো করেই না, আমাদের রুচিকেই বরং আঘাত করে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই ধরনের দোষের নাম দিয়েছেন 'গ্রাম্যতা'। 'গ্রাম্যতা' রুচি-পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই—কিন্তু তার চেয়েও বড়ো দোষ বোধহয় অসংযম।

অতিকথনের একটা মোহিনী শক্তি হয়তো আছে, আর তার প্রভাব কাটানো সহজও নয়, কেননা আতিশয্য অনেক সময়ই সাধারণ পাঠকের বাহবা কুড়োয়। তবু আতিশয্য যে কুরুচিকর তাতে সন্দেহ নেই। সংযমের অগ্নিপরীক্ষায় যিনি সবচেয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ সেই রবিরও আতিশয্যের মোহিনী মায়ায় বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, লিখতে বসলেই চকচকে

ঝকঝকে কথার ঝাঁক এসে তাঁকে লুব্ধ করত। গৌতম বুদ্ধ কঠিন সাধনার বলে 'মার'-এর প্রলোভন জয় করেছিলেন। সাহিত্যিকের সাধনাও তেমনি ধরনের একাগ্রতা দাবি করে। যে লেখক এ-পরীক্ষায় ব্যর্থ হন, অচিরেই নানা অপ্রয়োজনীয় ঠুন্‌কো শস্তা অলঙ্কারবাহুল্যে তাঁর লেখা অতীব কুরুচিকর হয়ে ওঠে।

ঝকঝকে কথা বা চিত্রকল্পের মোহটা কবিতার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বাছা বাছা ভালো কথা পর পর সাজিয়ে গেলেই ভালো কবিতা হয় না। হীরের আঙটি দামী সন্দেহ নেই। কিন্তু দশ আঙুলে কেউ যদি দশটা হীরের আঙটি পরে ঘুরে বেড়ায় তবে কে তার রুচির তারিফ করবে? লিরিক কবিতা সঙ্গীতধর্মী এবং ছন্দ-আশ্রয়ী কিন্তু তারও বাহুল্য পীড়াদায়ক। অতিকাব্যিকতায় কাব্যের মৃত্যু।

আবেগ যে-কোনো সাহিত্যের প্রাণ কিন্তু ঘটা করে আবেগ প্রকাশ করতে গেলে রুচিবান পাঠকের মনে তা বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি করে। উচ্চকণ্ঠ চিৎকারে আবেগের অগভীরতাই প্রমাণিত হয়।

যে আবেগ স্বাভাবিক নয়, ঔচিত্যবোধ থেকে সে আবেগ প্রকাশ করতে যাওয়াটা রুচির বিরুদ্ধে গর্হিততম অপরাধ। আবেগ অনুভব করলেই হয় না—আবেগ প্রকাশ করতেও জানা চাই। প্রকাশ-রীতি অনায়ত্ত থাকলে সত্যিকারের অবেগও কৃত্রিম বলে মনে হবে। শিল্পীর সততার পরীক্ষা আসলে তাঁর শক্তিরই পরীক্ষা। আবেগ সকলেই অনুভব করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ-ক্ষমতা একমাত্র শিল্পীরই আছে। প্রেমপত্র কোনো-না-কোনো সময়ে সকলেই লিখেছেন সম্ভবত—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে পত্রে যা স্থান পায় তাকে নির্জলা ন্যাকামি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কীটস-এর প্রেমপত্র যে আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় তার কারণ সে পত্র একজন বড়ো কবির রচনা।

আবেগপ্রকাশে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, ন্যাকামি বা উচ্চকণ্ঠ চিৎকার বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ পাঠক-গোষ্ঠীর মন ভোলাতে পারে—কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেলেই সে সাহিত্যের আবেদন ফুরিয়ে যায়।

ভাবালুতাও সাহিত্যরুচির পরিপন্থী। ঝাপ্‌সা চোখে জগতকে দেখতে গেলে অনেক কিছুই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। আর তাতে কৃত্রিম পণ্যে দানের পসরা ব্যর্থই হবে।

কিন্তু ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। সাহিত্য-রুচির মনুসংহিতা রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, আর তা সম্ভবও নয়। তাছাড়া তা নিরর্থকও বটে। কেননা, আগেই বলেছি, সাহিত্যরুচির কোনো চিরস্থায়ী মানদণ্ড নেই। যুগ বদলায়, রুচি বদলায়, সাহিত্যের ফ্যাশনও বদলে যায়—দার্শনিকেরা বলেন এক নদীতে নাকি দু-বার ডুব দেওয়া যায় না। এ পরিবর্তমান বিশ্বে শাশ্বত মানদণ্ড খোঁজা তাই আলেয়ার পিছনে ঘুরে মরা।

কিন্তু সাহিত্যরুচির সংহিতা রচনা করা যাক আর না যাক, এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় করা যায় যে সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচির প্রশ্নটা ইসথেটিকসের, এথিকসের নয়।

লেখকের স্বাধীনতা

"It (Bourgeoisdom) crucifies liberty upon a cross of gold, and if you ask in whose name it does this, it replies 'In the name of personal freedom'"

—Christopher Caudwell

'লেখকের স্বাধীনতা'—এই বিষয়টি নিয়ে ইদানীংকালে নানা মহলে জোর আলোচনা চলছে। প্রসঙ্গটা কিছু নতুন নয়, কিন্তু বিতর্কটা যেহেতু মূল দৃষ্টিভঙ্গিগত তাই শেষ পর্যন্ত তা অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে। যে কোনো ছুতোয় অতএব নতুন করে আবার আলোচনা শুরু হয়ে যায় এবং প্রত্যেক রাউণ্ডেই উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

এবারকার আলোচনা জমে উঠেছে সোলঝেনিৎসিন নামক জনৈক রুশ লেখককে কেন্দ্র করে। এই ভদ্রলোকের প্রথম দিককার লেখা সোভিয়েত ইউনিয়নে আইনসঙ্গতভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। সে লেখা খুব উঁচুদরের না হলেও, বিষয়বস্তুর গুণে তাঁর প্রথম বইটি নিয়ে দেশে এবং বিদেশে কিছু আলোচনাও হয়েছিল। তারপর তাঁর একাধিক রচনা সোভিয়েত দেশে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তা নিয়ে তেমন কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি, দেশেও না বিদেশেও না।

প্রথম বইটির বিষয়বস্তু ছিল স্তালিন ব্যক্তিতন্ত্রের আমলের কিছু নেতিবাচক দিক। স্বভাবতই পশ্চিমীরা তার মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার কিছু ইন্ধন খুঁজে পেয়েছিল এবং তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে কসুর করেনি। ফলত কিছু সময়ের জন্য পশ্চিমী প্রচারের পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন সোলঝেনিৎসিন। পরবর্তী কয়েকটি রচনার নিরুত্তাপ সংবর্ধনা থেকে সম্ভবত তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর রচনার এমন কোনো অন্তর্নিহিত গুণ নেই যা হতে পারে তাঁর স্থায়ী খ্যাতির পাশপোর্ট, সুতরাং রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টির পথই তিনি বেছে নেন।[১] উত্তেজনা সৃষ্টির নিয়মই হলো ধাপে ধাপে তাকে বাড়াতে হবে—সোলঝেনিৎসিন এই নিয়মই অনুসরণ করলেন। তাঁর প্রথম বইতে ব্যক্তিতন্ত্রের নেতিবাচক দিকের যে সমালোচনা ছিল. তার ছিল কিছুটা বাস্তব ভিত্তি। ব্যক্তিতন্ত্র সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি নয়, একটা অস্বাভাবিক বিকৃতি। কিন্তু পশ্চিমীদের প্ররোচনায় সোলঝেনিৎসিন এই বিকৃতিকেই সমাজতন্ত্রের আসল স্বরূপ বলে বর্ণনা করার প্রায়স পেলেন। তাতে পশ্চিমীদের হাততালি জুটল বটে, কিন্তু স্বদেশের সতীর্থরা হলেন ক্রুদ্ধ। সোলঝেনিৎসিন সতর্কিত হলেন, তারপর বহিষ্কৃত হলেন লেখক সংঘ থেকে। তাতেও তাঁর হুঁশ হলো না। পশ্চিমীদের বাহবা, শুধু বাহবা কেন, অকৃপণ দাক্ষিণ্য তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি পশ্চিমীদের সুরেই সুর মেলাবেন বলে স্থির করলেন। সুইশ ব্যাঙ্কে জমতে লাগল ডলার, 'নোবেল প্রাইজ'-ও জুটলো। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আর যায় কোথায়! পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীলরা, সব ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি অমনি রেরে করে উঠল। এই ঘটনা থেকে নাকি প্রমাণ হয়ে গেল, সোভিয়েত ইউনিয়নে আর যাই হোক, বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশ, অতএব এ-থেকে যুক্তিসংগতভাবে সিদ্ধান্ত করা চলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু আছে যা স্বাধীনতার পরিপন্থী।

সোলঝেনিৎসিনের রচনায় সাহিত্য গুণ বা তার অভাব এ-আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কোনো বই বা লেখক সম্পর্কে সমসাময়িক সমালোচকেরা কদাচিৎ একমত হন। কিন্তু যাঁরা সোলঝেনিৎসিনের নিন্দা করছেন বা যাঁরা প্রশংসা করছেন, এক বিষয়ে তাঁরা একমত যে তাঁর শেষ দিককার বইগুলি—'ফার্স্ট সার্কেল', 'ক্যানসার ওয়ার্ড' কি 'গুলাগ আর্কিপেলেগো' সোভিয়েত

ব্যবস্থার বিরোধী। নোবেল কমিটি যদি তাঁকে শিরোপা দিয়ে থাকেন, তবে তা দিয়েছেন এই কারণেই। সাহিত্যিক গুণাগুণ অপেক্ষা রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা যে অনেক ক্ষেত্রেই নোবেল কমিটির সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবে ভরসার কথা এই যে নোবেল কমিটি সর্বশক্তিমান নয় এবং নোবেল পুরস্কারও নয় অমরত্বের ছাড়পত্র। তলস্তয় নোবেল পুরস্কার পাননি, গর্কিও না কিন্তু তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। সিলান্‌পা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ কজন তাঁর নাম মনে রেখেছে?

দুই

গৌরচন্দ্রিকা সম্ভবত দীর্ঘ হল। সোলঝেনিৎসিন এতবড় লেখক নন যাঁর সম্পর্কে এতগুলো লাইন লিখতে হবে। বস্তুতপক্ষে এ-লেখার বিষয়বস্তু সোলঝেনিৎসিন নয়, আমাদের আলোচ্য লেখকের স্বাধীনতা। প্রশ্নটা হল, লেখক তিনি লেখেন বলেই কি তাঁর যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা আছে? তিনি কি সর্বপ্রকার বিচারের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত কোন দৈবশক্তি?

লেখকের এই ধরনের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয় কি না সে প্রশ্নে আপাতত না গিয়েও বলা যায়, কোনো দেশের সংবিধানেই এ-ধরনের স্বাধীনতা স্বীকৃত নয়। আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পোড়ে তেমনি আইনের সীমা লঙ্ঘন করলে যেকোনো দেশেই শাস্তি পেতে হয়। উদাহরণের খোঁজে অন্য দেশে যাবার দরকার নেই, এদেশেই তা পাওয়া যাবে। বেশি দিনের কথা নয়, ড' অমূল্য সেন নামে একজন গবেষক চৈতন্য দেব সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এখন যাঁরা সোলঝেনিৎসিনের দুঃখে গলদশ্রুলোচন সেই 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'ই এই বইটির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে এবং তারই ফলে বইটি শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ড' সেনের গ্রন্থটি কোনোক্রমেই রাষ্ট্রবিরোধী ছিল না, তাঁর গবেষণালব্ধ কিছু কিছু সিদ্ধান্ত আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয়নি শুধু সেই কারণেই তাঁকে দণ্ড পেতে হল।

আর একজন পয়লা সারির চলচ্চিত্রশিল্পী একজন দেশবরেণ্য নেতাকে নাকি 'আস্ত শুয়োরের বাচ্চা' বলে অভিহিত করেছিলেন। শিল্পী শিল্পী বলেই যদি তাঁর যা ইচ্ছে তাই করার বা বলার স্বাধীনতা থাকে তাহলে আনন্দবাজার পত্রিকা কেন তার বিরুদ্ধে মার মার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

লেখক বা শিল্পী রাষ্ট্র কিংবা সমাজের সমালোচনা নিশ্চয়ই করতে পারেন

কিন্তু স্বদেশের বা স্ব সমাজের কুৎসা করার অধিকার কারোর নেই। কোনো রাষ্ট্রেই তা সহ্য করে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। যে কোনো রাষ্ট্রেই মানুষের স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে সীমিত। এঙ্গেলস বলেছিলেন, "যতদিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। যখন স্বাধীনতা থাকবে তখন রাষ্ট্র থাকবে না।"[২]

কথাটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব-শ্রেণীর মানুষের সব রকমের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নেই। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব, সে রাষ্ট্রে বিপ্লববিরোধীদের স্বাধীনতা কখনই স্বীকৃত হয় না।

আমেরিকা নাকি মুক্ত দুনিয়ার পীঠস্থান এবং আমেরিকান বিপ্লব নাকি স্বাধীনতার সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই আমেরিকান বিপ্লবের ইতিহাসটাই একটু খতিয়ে দেখা যাক। বিপ্লবের সময় আমেরিকায় ৬ থেকে ৭ লক্ষ লোক ছিল যারা ছিল ইংলণ্ডের রাজার প্রতি অনুগত এবং তাদের মধ্যে কয়েক সহস্র লোক সক্রিয়ভাবে বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল। বিপ্লবীরা, তাঁদের মধ্যে জেফারসনও ছিলেন, এই সব বিপ্লববিরোধীদের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। তাদের শিক্ষকতা যাজকতা বা অন্য যেকোনো পেশা অনুসরণ নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল, বিনা বিচারে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল, অনেককে গুরুতর শারীরিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল, অনেকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছিল, অনেককে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করা হয়েছিল, কাউকে কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাদের ছাপাখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়, লক্ষাধিক লোককে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়। বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরও দীর্ঘকাল ধরে এইসব বিধি-নিষেধ বলবৎ ছিল। যাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাদের তা কস্মিনকালেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

এক যুগেরও অধিককাল ধরে হাজার হাজার লোককে বাক স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জেফারসন, ম্যাডিসন বা ওয়াশিংটন কেউই তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি।[৩]

বহু সংখ্যক লোকের স্বাধীনতার সম্প্রসারণের জন্য কিছু সংখ্যক লোকের স্বাধীনতার সংকোচন অনেক সময়ই আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্নটা হলো কে কার স্বাধীনতার সংকোচন ঘটাচ্ছে ?

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৯১) সময় এক ডিক্রি জারী করে "স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের সনদের" বিরোধী বলে ট্রেড ইউনিয়নকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে আর একটি ডিক্রি বলে রাজতন্ত্রের সপক্ষে প্রচার প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করে ফ্রান্সের বিপ্লবী বুর্জোয়ারা তাদের দুই শত্রু—অভিজাত সম্প্রদায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আঘাত হানে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তেমনি শ্রমিকশ্রেণী তার শত্রু বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তার মিত্রদের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু যেহেতু এরা সমাজের দশ শতাংশের বেশি নয় তাই সমাজতন্ত্রেই স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয় সব চাইতে বেশি।

কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ আর সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বাধীনতার তুলনামূলক বিচার করতে হলে আগে মনঃস্থির করতে হবে স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি।

তিন

প্রায় চার দশক আগে ক্রিস্টোফার কডওয়েল লিখেছিলেন, "ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর সত্য প্রভৃতি যেসব কথা সহজেই আমাদের জিহ্বাগ্রে আসে সেই সব সামান্যীকৃত সামগ্রীর মধ্যে স্বাধীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তবু যখন স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়। এই সব লোকেরা—শব্দ বিষয়ে সতর্ক শিল্পীরা, শব্দ যে সব সত্তার পরিচায়ক সে সম্পর্কে যারা অনুসন্ধান করেন সেই বিজ্ঞানীরা, শব্দ এবং তার প্রকৃত অর্থ বিষয়ে খুঁতখুঁতে দার্শনিকেরা—স্বাধীনতা বলতে তারা ঠিক কী বোঝেন তা কখনও পরিষ্কার করে বলেন না। মনে হয় তারা যেন ধরে নেন বিষয়টা খুবই সহজ, যার সংজ্ঞা সম্পর্কে সকলেই একমত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কে না জানে স্বাধীনতা হচ্ছে এমন একটা ধারণা যা নিয়ে মানুষ কলহ করেছে অন্য যেকোনো ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ?"[৪]

এটা খুবই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা টেবিল নয়, চেয়ার নয়, এক কথায় এমন কোনো শব্দ নয় যা কোনো পার্থিব বস্তুর নাম বা প্রতিশব্দ। স্বাধীনতা এমন একটা গুণবাচক বিশেষ্য, যার কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। ভিয়েতনামে আমেরিকানরা এবং ভিয়েতনামি দেশপ্রেমিকেরা উভয়েই লড়েছিল এবং

মরেছিল স্বাধীনতার নাম করে। তারা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছিল তখন ধরে নিতেই হয়, আমেরিকানরা স্বাধীনতা বলতে যা বুঝতো ভিয়েতনামিরা বোঝে তার বিপরীত কিছু। যে আমেরিকানরা ভিয়েতনামে লড়েছিল তাদের কাছে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিশ্চয়ই ছিল মার্কিন আধিপত্যের প্রসার এবং যে ভিয়েতনামিরা তাদের পক্ষে ছিল তাদের কাছে স্বাধীনতা অবশ্যই ছিল মার্কিন তাঁবেদারির সমার্থক। অন্যদিকে ভিয়েতনামি দেশপ্রেমিকেরা স্বাধীনতা বলতে নিশ্চয়ই বোঝেন নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অবাধ অধিকার।

কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাতে সকলে যেহেতু একটি শব্দই, অর্থাৎ স্বাধীনতা শব্দটি, ব্যবহার করেন তাই এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় সকলেই যেন একই অর্থে কথাটি ব্যবহার করছেন। প্রথমেই তাই পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার স্বাধীনতা বলতে আমরা, অন্তত মার্কসবাদীরা সঠিকভাবে কি বুঝি।

আমরা যদি বলি রামবাবু ধনী তাহলে আমরা বুঝি রামবাবুর বাড়ি-গাড়ি আছে, অন্তত ব্যাঙ্ক বা সিন্দুকে আছে অনেক টাকা। কিন্তু যদি বলি রামবাবু স্বাধীন তাহলে আমরা কী বুঝি? বুঝি, লোকটি কারো অধীন নয় বা কারোর নির্দেশ মতো তাকে চলতে হয় না। সে যা খুশী তাই করতে পারে। এই ধারণা অনুসারে কোনো বিধি-নিষেধ না-থাকাটাই হচ্ছে স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষের এই ধরনের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়, হতে পারে না। প্রথমত মানুষ মাত্রেই কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, দ্বিতীয়ত সে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধীন। কোনো কোনো দার্শনিক এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, মানুষ জন্মেছিল স্বাধীন হয়ে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃংখলিত। কিন্তু নিঃসঙ্গ, সমাজহীন আদিম মানুষ স্বাধীন ছিল না, যেমন স্বাধীন নয় মনুষ্যেতর প্রাণীরা। সে প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই পদে পদে বাধার সম্মুখীন। সমাজবদ্ধ মানুষ সে নিয়মকে আবিষ্কার করতে পারে তাই তাকে অতিক্রমও করতে পারে। মানুষ জলের ধর্ম জানে, তাই সে জাহাজ তৈরি করে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে, মানুষ বায়ুর ধর্ম জানে, তাই পাখা না থাকা সত্ত্বেও সে আকাশপথে বিচরণ করতে পারে। মানুষকে তার স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, প্রকৃতিকে জয় করে এবং সামাজিক ও শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। মানুষ ততটুকু স্বাধীনতাই ভোগ করতে পারে যতটুকু সে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ব্যক্তিমানুষ সমাজের মধ্যেই অর্জন ও ভোগ করতে পারে স্বাধীনতা। আর

এই স্বাধীনতা লাভের উপায় হলো জ্ঞান, আর জ্ঞান নিশ্চয়ই সামাজিক। এই জ্ঞানের মধ্য দিয়েই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে তার প্রয়োজন। আর প্রয়োজনের স্বীকৃতিই তো স্বাধীনতা।[৫]

যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান বস্তুর প্রয়োজনীয়তা উদ্ঘাটিত করে। জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে স্বাধীনতা, যার ভিত্তি হলো প্রয়োজন সংক্রান্ত জ্ঞানের সাহায্যে নিজের এবং বহিঃপ্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। মানুষ তখনই স্বাধীন যখন সে জ্ঞানের ভিত্তিতে স্থির করে কি করবে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের উপাদানগুলির উপর সচেতনভাবে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[৬]

তাহলে দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদীদের কাছে স্বাধীনতা একটা সদর্থক ধারণা। তারা জোর দিচ্ছেন কি করা যাবে না তার উপরে নয়, কি করা যাবে তার উপরে। স্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণা কিন্তু পুরোপুরি নঙর্থক। এই ধারণা অনুসারে ব্যক্তির উপর কোনো নিষেধ-বিধি থাকবে না কিন্তু সরকারের উপর থাকবে। এখানে ব্যক্তি বলতে বোঝায় পুঁজির মালিক। পুঁজির মালিকের থাকবে মুনাফা বৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতা এবং সরকার সে-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই স্বাধীনতাও এখন অবশ্য আর নিরঙ্কুশ নয়। পুঁজির মালিকদের অবাধ প্রতিযোগিতা, যা ক্রমশ মাৎস্যন্যায়ের রূপ ধারণ করে, এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিল যে তার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ না করে পারা যায়নি, বিশেষ করে পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত নিয়ম যখন তাকে একটা সাধারণ সংকটের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল, যার ফলে এই সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এ-আলোচনা দীর্ঘায়ত করে লাভ নেই। প্রথমত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসরে এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়ত বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে তা হয়তো পুরোপুরি প্রাসঙ্গিকও নয়।

মোটের উপর কথাটা হলো এই যে, স্বাধীনতা কথাটা অনেকেই ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সকলেই এক অর্থে ব্যবহার করে না। এক এক সমাজে স্বাধীনতার সংজ্ঞা এক এক রকমের। দাস-সমাজে স্বাধীনতা বলতে বোঝাতো দাস-প্রভুদের স্বাধীনতা। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় পুঁজি মালিকদের স্বাধীনতা। তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতার অর্থ হলো শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রশক্তিসমূহের স্বাধীনতা। তবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের তফাৎ এই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ চায়

শ্রেণীভেদ চিরস্থায়ী করতে আর সমাজতান্ত্রিক সমাজ চায় শ্রেণীভেদের বিলোপ। শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত হলে কালক্রমে রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হবে, মানুষের স্বাধীনতার তখন আরও সম্প্রসারণ ঘটবে।

মানুষের স্বরাজ্য সাধনা চলছে সমাজের আদি যুগ থেকে। একটু একটু করে তার স্বাধীনতার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। দাস-সমাজের তুলনায় পুঁজি-তান্ত্রিক সমাজে মানুষের স্বাধীনতার অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছে, এবং তার আরও সম্প্রসারণ ঘটছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনতা ছিল উচ্চকোটির দশ শতাংশের, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেই উচ্চকোটির দশ শতাংশ হয়তো স্বাধীনতা বঞ্চিত কিন্তু তার প্রসাদে পুষ্ট হচ্ছে নিচুতলার নব্বুই শতাংশ মানুষ। এই নব্বুই শতাংশের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক শত্রুতার নয়, মিত্রতার। স্বাধীনতাচ্যুত দশ শতাংশ যেহেতু ফিরে পেতে চায় তাদের হারানো স্বর্গ এবং তার জন্য যেকোনো পন্থার আশ্রয় নিতে কসুর করে না তাই তাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রশক্তি। তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিশ্চয়ই বৈরিতার।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগী দশ শতাংশের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে যাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজেদের স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে প্রতিবিপ্লবের যে কোনো চক্রান্তের বিরুদ্ধে তারা যে মরণ পণ করে দাঁড়াবেন, এইটাই স্বাভাবিক।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটা কমিটেড সমাজ। সমাজতন্ত্র গড়া, সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হওয়া—তার কমিটমেন্ট। এ কমিটমেন্ট মানবকল্যাণের কমিটমেন্ট, পুঁজির দাসত্ব থেকে মানবমুক্তির কমিটমেন্ট, স্বাধীন শ্রমের কমিটমেন্ট। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষের সুখের কমিটমেন্ট। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের মানুষ কমিটেড মানুষ, লেখক কমিটেড লেখক। এবং এই কমিটমেন্ট স্বাধীনতার অন্তরায় নয়, বরং মানুষের স্বরাজ্য সাধনারই অঙ্গ।

চার

পশ্চিমী প্রচারে জোর গলায় দাবি করা হয়ে থাকে বুর্জোয়া সমাজে লেখক যা খুশি তাই লিখতে পারে এবং সেখানে সৃষ্টির স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। দেখা যাক এই দাবি ধোপে টেকে কি না!

পশ্চিমীরা অবশ্য স্বাধীন বা মুক্ত লেখক বলতে তেমন লেখককেই বোঝে যার কোনো সামাজিক কমিটমেন্ট নেই। কিন্তু যে লেখক কোনো মহৎ

সামাজিক আদর্শের পূজারী নন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যার কোনো মাথাব্যথা নেই—তিনি কি সত্যিই স্বাধীন? প্রথমত তিনিও তো নিজেকে এক ধরনের মতবাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন—সে মতবাদ আত্মকেন্দ্রিকতার মতবাদ, নৈরাজ্যবাদী স্বেচ্ছাতন্ত্রের মতবাদ। দ্বিতীয়ত যে-সমাজে সবার উপরে বিত্ত সত্য, সে-সমাজে স্বাধীনতার গালভরা বুলি ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কি? বুর্জোয়া-সমাজে লেখক বা শিল্পীকে নির্ভর করতে হয় টাকার থলির উপর, প্রকাশক কি সম্পাদকের মর্জির উপর, উচ্চকোটির দশ শতাংশের রুচি ও অভিরুচির উপর। কে না জানে সত্যিকারের প্রতিভাবান শিল্পীও যদি প্রচলিত ব্যবস্থার গুণগান করতে অস্বীকৃত হন তাহলে তার জন্যে বুর্জোয়া সমাজের সুযোগ-সুবিধার সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়? উদাহরণের জন্য অন্য দেশে যাবার দরকার নেই। কে না জানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রথম সারির লেখকও কমিউনিস্ট হয়েছিলেন বলে এদের কাছে অন্ত্যজ বলে গণ্য হয়েছিলেন? আজ মরার পর যাঁর চিতায় মঠ তোলার সাড়ম্বর আয়োজন হচ্ছে, কে না জানে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে হয়েছে?

বলা হতে পারে এবং হয়, পত্রিকা সম্পাদক বা প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেও, বুর্জোয়া সমাজে লেখক অন্তত নিজে তার বই প্রকাশ করতে পারেন। হ্যাঁ, পারেন যদি তার সে অর্থ সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ এখানেও লেখকের স্বাধীনতা সেই টাকার উপরই নির্ভরশীল। আজ প্রকাশনের ব্যয় যেভাবে বাড়ছে তাতে খুব কম লেখকের পক্ষেই এই স্বাধীনতার সুযোগ নেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, লেখক যদি কষ্টেসৃষ্টে তাঁর বই প্রকাশও করেন তবে কি তিনি পাঠকের কাছে সে বই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন? বই পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাটি বড় বড় প্রকাশকদের করতলগত। বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দিলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ব্যয় যেভাবে বাড়ছে তাতে কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তার খরচ সংকুলান করা কী সম্ভব? এস্টাবলিশমেন্ট যদি তার প্রতি বিরূপ হয় তবে বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলিতে তার বইয়ের সমালোচনাও হবে না। তাহলে তার বই বিক্রি হবে কী করে? আর পাঠকের কাছে বই যদি নাই পৌঁছাল তাহলে সে বই প্রকাশ করে লাভ কি?

কিছুকাল আগে জর্জ ম্যারিয়ন নামে একজন আমেরিকান সাংবাদিকের

একটা বই পড়েছিলাম। এই বইতে তিনি দেখিয়েছিলেন, বড় বড় প্রকাশকদের নীরব প্রতিরোধ উপেক্ষা করে নিজে বই ছাপতে গেলে কী ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আমেরিকা নাকি মুক্ত দুনিয়ার পীঠস্থান। সেখানে কোনো লেখক যদি তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে যান তাহলে তাকে যে কী দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হয় জর্জ ম্যারিয়ান[৭] অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

জর্জ ম্যারিয়ন আমেরিকার কোনো একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকাতে সাংবাদিকতা করতেন। মাইনে ভালোই পেতেন। তিনি লিখেছেন "শতকরা ৯৯ জন আমেরিকানের চেয়ে আমার মাইনে বেশি।" কিন্তু সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে, ভিতর থেকে তার কাজকর্ম দেখে তিনি ক্রমশ তার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ কাজ ছেড়ে দেন। 'দ ফ্রি প্রেস : পোর্টেট অব এ মনোপলি' নামে একটি গ্রন্থে তিনি সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

কিন্তু বইতো লিখলেন, প্রকাশ করবে কে? শেষ পর্যন্ত নিউ সেঞ্চুরি পাবলিশার্স' নামে একটি অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বইটি প্রকাশ করলেন। জর্জ ম্যারিয়ন লিখেছেন, দেখা গেল বই বিক্রির যেসব স্বাভাবিক ব্যবস্থা আছে তাতে কোনো প্রবেশাধিকার নেই ঐ প্রকাশকের। তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে হাতে হাতে লোকদের কাছে পৌছে দেবার এক দুর্বল ব্যবস্থার উপর। জর্জ ম্যারিয়ন অতঃপর নিজের বই নিজে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু নিজে প্রকাশক হয়েই কি সব বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারলেন? তাঁর বইয়ের কোনো সমালোচনা 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' বা 'নিউ নিয়র্ক হেরাল্ড্-ট্রিবিউন'-এর মতো পত্রিকাতো প্রকাশ করলই না, এমনকি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতেও অস্বীকার করল। জর্জ ম্যারিয়ন লিখেছেন, তার ভাগ্যেই যে এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয় এমনকি ড. হার্বার্ট আপথেকারের মতো সুপরিচিত নিগ্রো ইতিহাসের পণ্ডিতের বইয়ের সমালোচনা করতেও অস্বীকার করে আমেরিকার ঐ দুটি সংবাদপত্র। হেরল্ড-ট্রিবিউন জানায়, বইটি নাকি সমালোচনার উপযুক্ত নয়। হেরল্ড-ট্রিবিউন কিন্তু এমন একটি বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ করে যে বইটি প্রধানত ড. আপথেকারের বইয়ের ভিত্তিতে রচিত। শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক কমিউনিস্ট ছিলেন না বলেই হয়তো তার বইয়ের সমালোচনা বের হয়েছে. আর আপথেকার কমিউনিস্ট বলেই হয়তো তার ভাগ্যে জুটেছে পৃথক ফল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে জর্জ ম্যারিয়ন তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন, আপনার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আপনি বইয়ের পাতায় লিখলেন কিন্তু কোনো পাঠক যদি তা নাই পড়তে পারল তবে সে বই লিখে লাভ কি। কি মূল্য আছে এ-স্বাধীনতার? একেই কি বলে না—এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে ফিরিয়ে নেওয়া?

পাঁচ

পূর্ববর্তী অংশে আমরা দেখিয়েছি বুর্জোয়া সমাজে লেখকের এই তথাকথিত স্বাধীনতা কতটা সারবস্তুহীন। আমরা দেখিয়েছি বুর্জোয়াব্যবস্থার সমালোচনা যাতে পাঠক সাধারণের কাছে পৌঁছতে না পারে তার সর্ববিধ ব্যবস্থাই সেখানে আছে। কিন্তু এখানে যে-কথাটা বলা দরকার এই ছিটেফোঁটা স্বাধীনতাটুকুও তারা স্বেচ্ছায় বুর্জোয়া-ব্যবস্থার সমালোচকদের দেয়নি। প্রবল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের অনিচ্ছুক হাত থেকে এ-অধিকার কেড়ে নিতে হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি ১৭৯১ সালের ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। সে অধিকার ফিরে পেতে তাদের যে অনেক স্বেদ ও রক্ত ক্ষয় করতে হয়েছিল, ইতিহাসই তার সাক্ষী। আর একথাটা শুধু ফ্রান্স সম্পর্কেই সত্য তা নয়, সত্য সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া সম্পর্কে, সত্য ব্রিটেন আমেরিকা এমনকি ভারত সম্পর্কেও। আমরা দেখিয়েছি, পুঁজিবাদী সমাজ এক হাতে যা দিতে বাধ্য হয় অন্য হাতে তা ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থাও পাকা করে রাখে।

তাছাড়া, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষতার ভড়ং বজায় রেখে চলতে হয়, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই। এ-রাষ্ট্র সমাজের দশ শতাংশের প্রতিনিধি, অন্য নব্বুই শতাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার প্রয়াস তাকে করতেই হয়। অবশ্য এ-ভড়ং তারা যে সব সময় বজায় রাখতে পারে তা নয়। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের ফলে তার অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন সরাসরিই তাকে একনায়কত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের এ-ধরনের প্রতারণার প্রয়োজন নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজ খোলাখুলিভাবেই পার্টিজান। বুর্জোয়াতন্ত্র এবং তার প্রভাব নির্মূল করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যারা বুর্জোয়াতন্ত্রে ফিরে যেতে চায়, যারা বলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার ভাবাদর্শ পরিত্যাগ করুক, সমাজতান্ত্রিক সমাজে তারা

নিশ্চয়ই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে। লেনিন বলেছিলেন, "এই যদি হয় যে আমরা সমাজ-বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছি তাহলে কালেদিনের (প্রতি-বিপ্লবী জেনারেল) বোমার সঙ্গে প্রতারণার বোমা আমরা যোগ করতে পারি না।" "নৈরাজ্যবাদী থেকে শুরু করে রাজতন্ত্রী পর্যন্ত" সকলের স্বাধীনতার দাবিকে নাকচ করে দিয়ে লেনিন বলেছিলেন, আমাদের বিচার করে দেখতে হবে কি ধরনের স্বাধীনতা, কিসের জন্যে স্বাধীনতা, কোন শ্রেণীর জন্যে স্বাধীনতা। লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়ারা আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে, এ-স্বাধীনতা আমরা তাদের দেব না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়ারা এবং তাদের দালালেরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম কল্যাণ সাধনই এ-সমাজের লক্ষ্য। এ-সমাজে শ্রমিক মুক্ত পুঁজির মালিকের দাসত্ব থেকে, সংবাদপত্র মুক্ত কোনো সরকার কি ঘোষ পরিবারের কিংবা টাটা-বিড়লার কর্তৃত্ব থেকে, লেখক এবং শিল্পী মুক্ত টাকার থলির দাসত্ব থেকে, প্রকাশক কি সম্পাদকের খামখেয়াল থেকে। লেখক কিভাবে লিখবেন, কি নিয়ে লিখবেন তা কেউ তাকে বলে দেয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে লেখকের কি সম্পর্ক তা চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে মায়াকোভস্কির একটি উক্তিতে। ১৯২৭ সালে মায়াকোভস্কি বলেছিলেন, "আমি একজন মুক্ত মানুষ এবং লেখক। বৈষয়িকভাবে আমি কারোর উপর নির্ভরশীল নই। নৈতিকভাবে আমি সেই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে মুক্ত যা সামাজিক সাম্যের নীতির ভিত্তিতে রুশিয়াকে নতুন করে গড়ছে।"

সমাজতান্ত্রিক সমাজে লেখক তার স্বাধীন ইচ্ছাতেই যুক্ত হন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। কেননা একটা মহৎ আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই লেখক অর্জন করতে পারেন তাঁর প্রকৃত স্বাধীনতা।

টীকা

১. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আমেরিকার যে 'টাইম' সাপ্তাহিক পত্রিকা সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে নাচানাচি কম করেনি তাকেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে "The going literary view…is that Solzhenitsyn's fame depends on

politics more than art, that he is a great man, but not a great writer" (Time, July 15, 1974) সোলঝেনিৎসিন যে 'গ্রেট ম্যান' নন তা এতই স্পষ্ট যে তা প্রমাণ করার জন্য অযথা কালি খরচ করার প্রয়োজন নেই, আর তিনি যে 'গ্রেট রাইটার' নন তাতো 'টাইম' পত্রিকাই বলছে।

২. Quoted by Lenin in State and Revolution

৩. Herbert Apthekar : The Nature of Democracy, Freedom and Revolution (P. 11)

৪. Christopher Caudwell : Studies in a Dying Culture (pp. 193-194)

৫. Maurice Cornforth : Dialectical Materialism : An Introductory Course, Vol. III, pp. 250-252. NBA edition.

৬. Ibid, p. 231.

৭. George Marion : Stop the Press. New York

সোভিয়েত শিল্প-বিতর্ক ও আমরা

কিছুকাল আগে সোভিয়েত দেশের লেখক ও শিল্পীদের এক সভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীনপ্রধান সম্পাদক ক্রুশ্চভ ও অন্যতম সম্পাদক ইলিচভ যে ভাষণ দিয়েছিলেন ও-দেশের লেখক ও শিল্পীদের তা কতটা বিচলিত করেছে জানি না, এদেশের কাউকে কাউকে যে বিলক্ষণ বিচলিত করেছে তা চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছি। ক্রুশ্চভ তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন গত বছর শীতকালে। আর এক শীত এসে পড়ল। দেখাই যাচ্ছে এক মাঘে ক্রুশ্চভের শীত যাবে না—এ-আলোচনার জের আরও কিছুকাল চলবে আমাদের দেশে।

আলোচনা চলুক, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই বরং তা কাম্যই। কেননা, আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই সত্যে পৌঁছন সম্ভব। কিন্তু আমাদের এ আলোচনার লক্ষ্য কি? আমরা কি চাই সোভিয়েত দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে কি ভালো আর কি মন্দ তা বাৎলে দিতে? আমরা কি চাই সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টি কোন পথ ধরে চলবে তা ছকে দিতে?

কিন্তু চাইলেই কি আমরা তা পারি? আমরা কি সোভিয়েত বাস্তবতার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত? আমাদের আলোচনাটা কি প্রায় অন্ধের হাতি

দেখার মতো হয়ে উঠছে না ? ক্রুশ্চভ এবং ইলিচভ কতকগুলি ছবি, সাহিত্যকর্ম এবং সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঝোঁক সম্পর্কে তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। আমরা সে সব ছবি দেখিনি, সে সব রচনা পাঠ করিনি, সে বিশেষ ঝোঁক সমাজদেহে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে অবহিত নই। আমরা এখান থেকে, ওখান থেকে এক একটা উক্তি খুবলে নিয়ে কেউ বা উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করছি, কেউ বা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে, বিশ্বমানবের আশাভরসায় কেন্দ্রস্থল হিসাবে সোভিয়েত দেশের ভালোমন্দ সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগবোধ থাকা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়। আর স্তালিন যুগের অনাচার-অবিচারের অন্ধকার ইতিহাস প্রকাশিত হবার পর সে-ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সামান্যমাত্র সম্ভাবনা দেখলেও আগেভাগেই তার প্রতিবাদ জানান শ্রেয় মনে করি, সমাজতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই। কিন্তু আবার কথায়ই আছে, ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখেও ভয় পায়। ক্রুশ্চভ-ইলিচভ ভাষণে আমাদের দেশে যাঁরা একটু অধিকমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, প্রবাদ বাক্যটি যদি তাঁরা স্মরণে রাখতেন তাহলে রক্তসঞ্চালনের দ্রুততা হয়তো কিছুটা এড়ান যেত এবং আলোচনা কিছুটা বাস্তবানুগ হতো। তাতে সোভিয়েত দেশের লেখক ও শিল্পীরা, কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতারা কতটা লাভবান হতেন জানিনা—আমরা কিছুটা হয়তো লাভবান হতাম। যেহেতু ক্রুশ্চভ-ইলিচভ বিমূর্ত চিত্রকলা সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন বা সাহিত্য বা সঙ্গীতকলার কোনো কোনো বিশেষ ঝোঁক সম্পর্কে তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছেন অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নে 'বরফ গলার যুগ' শেষ হয়ে গেছে, কট্টর ঝ্দানভি যুগ ফিরে এসেছে—অন্তত এই ধরনের বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত উক্তি করার প্রয়োজন হতো না। ক্রুশ্চভ অপেক্ষা স্তালিন উদারপন্থী ছিলেন, এই ধরনের ভক্তিমার্গী নির্বুদ্ধিতাও সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করতে লজ্জিত হতো। মনে পড়ত বেবেলের ভাগ্যের কথা, মনে পড়ত মায়াকোভস্কি-এসেনিনের পরিণতির কথা, মনে পড়ত ঝ্দানভি আমলে জোশচেঙ্কো আখমাটোভাকে সাহিত্য জগত থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, পাস্তেরনাকের মতো কবিকে, পাউস্তোভস্কির মতো গদ্যশিল্পীকে গ্রহণ করতে হয়েছিল অনুবাদকের জীবিকা। মনে পড়ত স্তালিন-আমলে বিমূর্ত শিল্পের কোনো প্রদর্শনী সোভিয়েত দেশে করাই সম্ভব

হতো না। অন্তত পার্টি নেতাদের তীব্র আক্রমণের পর তার দরজা বন্ধ হতো এবং উদ্যোক্তাদের গায়ে আর কিছু না হক দু-একটি আঁচড়ের দাগ লাগত, 'তিরস্কৃত' লেখকেরা ইওরোপীয় লেখক সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পেতেন না।

এই সব কথা এখানে বলার দরকার হলো এই কারণে যে ত্বরিত-সিদ্ধান্ত আমাদের সত্যে পৌঁছে দেয় না, সত্য থেকে দূরেই নিয়ে যায়। নইলে ক্রুশ্চভ-ইলিচভ তাঁদের ভাষণে সোভিয়েত সাহিত্যনীতি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যে ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন তা নিশ্চয়ই তর্কাতীত নয়। কাল যদি আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতো এবং স্বদেশী কোন ক্রুশ্চভ ইলিচভ যদি ঐ-ভাবে এবং ঐ-ভাষায় ভারতের সাহিত্যনীতি ব্যাখ্যা করতেন আমরা নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করতাম। সাহিত্যকে শিল্পকে পার্টি যন্ত্রের 'নাট-বল্টু' করতে চাইলে তার পরিণাম সাহিত্যের পক্ষে বিষময় হওয়াই স্বাভাবিক। স্তালিন-যুগের বিশ-ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা তারই সাক্ষ্য দেবে। আর আঙ্গিকের দিক থেকেও সাহিত্য-শিল্পে 'ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিকের' নিয়ম চলে না। ভাব ভাষা এবং আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু তাই বলে সাহিত্য কি উদ্দেশ্যহীন বাক-বিলাস মাত্র? মার্কস বা এঙ্গেলস্ কি গূঢ় অর্থে উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের কথা বলেননি? মার্গারেট হার্কনেস ও মিনা কাউটস্কির কাছে লেখা চিঠি দুটিতে এঙ্গেলস্ তাহলে কি বলেছেন? বস্তুতন্ত্র কি বস্তু তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু স্পষ্টতই মার্ক্স এঙ্গেলসের বস্তুতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল তা কি অস্বীকার করা চলে? অথচ উত্তেজনার ঘোরে এসব কথা আমরা বিস্মৃত হচ্ছি বলেই মনে হয়। নাহলে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের নন্দনতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে উদধৃতি সংকলনে অকৃপণ হয়েও পূর্বোক্ত চিঠি দুটোর কথা আমরা ভুলে যাই কি করে? বস্তুতন্ত্র, সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা পার্টিজান তত্ত্বের অপব্যাখ্যা অতীতে (এবং হয়তো কিছু পরিমাণে বর্তমানেও) করা হয়েছে বলে কি স্নান-করা জলের সঙ্গে শিশুকেও বাইরে ফেলে দিতে হবে?

তাছাড়া সামাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাষ্ট্রের শক্তিকাঠামোকেই (power-structure) শুধু পরিবর্তন করে না, সমাজকে, সামাজিক মূল্যবোধকেও ঢেলে সাজাতে চায়। আর এই অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র পরিপূর্ণ বিপ্লব। কিন্তু রাষ্ট্রকে বা শক্তি কাঠামোকে যত দ্রুত পরিবর্তিত করা সম্ভব,

সমাজকে বা সামাজিক মূল্যবোধকে তত দ্রুত পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়। রূপান্তরকালীন অবস্থা এ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। একটু একটু করে সমাজকে, সামাজিক মূল্যবোধকে পরিবর্তিত করতে হয় সচেতন ভাবে। 'সচেতনভাবে' কথাটার উপর আমি একটু বেশি জোর দিতে চাই। আর সচেতনভাবে কিছু গড়তে গেলে নেতৃত্বের কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। নেতৃত্বের ভুল হতে পারে, ভুল নেতৃত্বের ফলে আন্দোলনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু তাই বলে নেতৃত্ববিহীন আন্দোলনের কথা কি কল্পনা করা যায়?

নতুন সমাজ গড়া, নতুন সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সাহিত্য-শিল্পে তা সঞ্চারিত করা—এও এক ধরনের আন্দোলন। এ-আন্দোলন ভিন্ন ধরনের, এর নেতৃত্বও হবে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু তবু তা নেতৃত্বই। ইওরোপে এতাবৎকাল যে সব সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলন হয়েছে তার কোনটা ছিল নেতৃত্ববিহীন? আপত্তি কি তাহলে শুধু কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের বেলায়ই? কিন্তু সমাজবাদী সাহিত্য-আন্দোলনে কমিউনিস্টরা ছাড়া নেতৃত্ব নেবে কে?

নেতৃত্ব আর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমার্থক নয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা সাহিত্যিক-শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পথ বন্ধ করা অবশ্যই নিন্দনীয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু লেখকের যদি স্বাধীনতা থাকে, শিল্পীর যদি স্বাধীনতা থাকে, তাহলে সমালোচনার স্বাধীনতাই বা থাকবে না কেন? সমাজতান্ত্রিক দেশে সমগ্র কর্মপ্রয়াস একটি লক্ষ্যে কেন্দ্রিত। সে দেশে বিজ্ঞান, অর্থনীতি সব কিছুর লক্ষ্য কমিউনিস্ট সমাজের ভিত্তি (base) গড়ে তোলা। সে কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে তীব্র সমালোচনা করা হয়ে থাকে। তাতে কেউ আপত্তি করে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাংস্কৃতিক প্রয়াসেরও তো লক্ষ্য কমিউনিস্ট সমাজের জন্য নতুন উপরিতল (super-structure) গড়ে তোলা। সাহিত্য-শিল্পকে তুলনা করা হয় দর্পণের সঙ্গে। দর্পণে যদি নতুন বাস্তবতার প্রতিফলন না ঘটে, যদি নতুন নতুন মূল্যবোধ প্রতিভাত না হয় —তবে তার সমালোচনা করলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে কেন?

নীতি হিসাবে এ দাবি নিশ্চয়ই করা চলে না যে সাহিত্য-শিল্প সমালোচনার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। তবে এ দাবি নিশ্চয়ই করব সমালোচনা দায়িত্বশীল হবে, সমালোচক প্রকৃত সাহিত্য-রসিক হবেন, সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সমস্যা এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হবেন। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি সাহিত্য

সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না—এমন দাবি নিশ্চয়ই করা চলে না। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক কাজ নিয়েই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকেন, সাহিত্য না পড়েন, সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা না করেন—তাহলে তাঁর সাহিত্যিক মতামত নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশে কেন, সব দেশেই সাহিত্যটা যেন ঢাকের বায়া, যে কেউ এসে তাতে দুটো চাটি মেরে যেতে পারেন। পুঁজিবাদী দেশে পয়সা থাকলে, বিজ্ঞাপনের ঘাৎঘোঁত জানা থাকলে নির্বোধও সাহিত্যের সমাজপতি হয়ে বসতে পারেন এবং বসেনও। তারপর তার উপদেশামৃতও উচ্চ মূল্যে বাজারে কাটে। এমন ঘটনা তো আমাদের দেশে হামেশাই ঘটে। তেমনি রাজনীতির ঘাটে-আঘাটায় ঘুরে হালে পানি না পেয়ে সাহিত্য ব্যাপারে 'ক' অক্ষর গো-মাংসের মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক হয়ে বসার এবং তোতা পাখির মতো আপ্তবাক্য আউড়ে যাবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অক্ষর পরিচয় থাকলেই যেহেতু বই পড়া যায় সমালোচক হয়ে বসতে অতএব বাধাটা কোথায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে 'যার কর্ম তার সাজে, অপরের হাতে লাঠি বাজে'। আর যেহেতু সে লাঠিতে মাথা দু-একটা ভাঙে—তাই অনধিকার চর্চা বন্ধ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজ করবেন, কি নিয়ে গবেষণা করবেন তা বিজ্ঞানীরাই স্থির করেন; অর্থনীতির আলোচনায়ও অর্থনীতিবিদেরাই যোগ দেন। সাহিত্যের ব্যাপারেও এই নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত। সাধারণ পাঠকের মতামত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা উচিত। কিন্তু নেতৃত্বের প্রশ্ন স্বতন্ত্র। যাঁরা সাহিত্যিক, যাঁরা শিল্পী, যাঁরা সঙ্গীতকার—নিজের সমস্যা সম্পর্কে তাঁরাই সবচেয়ে ওয়াকিবহাল। নেতৃত্বের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে—সে নেতৃত্ব আসা উচিত তাঁদের মধ্য থেকেই। একজন গর্কি যখন সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, একজন শস্টাকোভিচ যখন সঙ্গীত বিষয়ে কিছু বলেন লোকে তা সাগ্রহে শোনে। তাঁরা যে নেতৃত্ব দেন তা চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হয় না।

আলোচনা চলুক, আপত্তি নেই। কিন্তু আলোচনার সময় এই মূলকথাগুলি মনে রাখলে তবেই আলোচনা ফলপ্রসূ হবে। নইলে আলোচনা শুধু চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকবে নিষ্ফলা বন্ধ্যা খাতে।

সাহিত্য সমালোচনা ও গোঁড়ামি

গোঁড়ামি বর্জনীয়—স্বতঃসিদ্ধের মতো করে একথাটা বলতে যাওয়াটাও হয়তো এক ধরনের গোঁড়ামি। তবু আমি বলব এ-গোঁড়ামি শ্রেয়, বিশেষ করে সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে।

সাহিত্য বিজ্ঞান নয়। সাহিত্যের গুণাগুণ মাপবার কোনো অপরিবর্তনীয় গজকাঠি নাতারদাম গীর্জায় রক্ষিত নেই। তাই সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

সব সমালোচকই রসিক—একথা হয়তো সত্য নয়। কিন্তু শুধু অরসিক কেন, সুরসিক সমালোচকেরও ভুল হয়। ম্যাথু আরনল্ড 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'কে পাশ মার্ক দেন নি, তলস্তয়ের বিচারে শেকস্পীয়রের নাটকাবলী অনুত্তীর্ণ। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একদা মধুসূদনের মূল্য বিচারে ভুল করেছিলেন এবং উত্তরকালে তা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন।

কিন্তু অত পেছনে যাবার দরকার নেই। একটা হাল আমলের দৃষ্টান্ত নিলেও দেখা যাবে বিচার-বিভ্রাট এখনও ঘটে। বরিস পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' সমালোচক মহলে যেরূপ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বইটি প্রসঙ্গে যেরূপ বিপরীত মন্তব্য শোনা গেছে সম্প্রতিকালে আর কোনো বই সম্পর্কে তেমনটা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কেউ কেউ বইটিকে একবাক্যে স্থান দিয়েছেন

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজীর সঙ্গে,* আবার কেউ কেউ বলেছেন যে কাগজে লেখা হয়েছে উপন্যাস হিসাবে 'ডক্টর জিভাগো' তার চেয়েও মূল্যহীন। এবং এই দুই শিবিরেই এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা জ্ঞানী-গুণী এবং বিচক্ষণ সমালোচক বলে সুপরিচিত।

এ-ক্ষেত্রে মতামতের তীব্রতা সবটাই হয়তো নিছক সাহিত্যবোধপ্রসূত নয়, হয়তো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনৈতিক দাঁও কষাকষিও এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। কিন্তু শুধু এই কথা বললে সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে।

বইয়ের মূল্যায়ন সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয়, বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগের ফল।

যে-কোনো বই সম্পর্কে যে মন্তব্য আমরা অনায়াসে করে থাকি তা হচ্ছে—বইটা আমার ভালো লেগেছে কিংবা ভালো লাগেনি। আমার ভালো লাগা না-লাগা "রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা" নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য এই যে, কোন বই ভালো লেগেছে কিংবা লাগেনি বললে আসলে কিছুই বলা হয় না। কেননা, ভালো শব্দটির কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই।

যদি বলি রাম ছ' ফুট লম্বা—ফিতে দিয়ে মেপে তা প্রমাণ করা যাবে। যদি বলি রাম বুদ্ধিমান তবে, 'ইনটেলিজেন্স টেস্ট'-এর সাহায্যে সে উক্তির যাথার্থ্যও হয়তো যাচাই করে দেখা সম্ভব। কিন্তু যদি বলি রাম ভালো ছেলে তবে সে বিবৃতি সত্য কি না তা খতিয়ে দেখার কোনো উপায় নেই—কেননা, ভালো কথাটার একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন, রাম মদ্য পান করে না, পরদারে আসক্ত নয়, অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জন করে না কিংবা যে কোনো উপায়েই হোক সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে কিন্তু দেব-দ্বিজে তার অচলা ভক্তি, রোজ গঙ্গাস্নান করে, পুজো-আর্চা সন্ধ্যাআহ্নিক নিয়েই থাকে কিংবা মদ্যপ এবং পরদারে আসক্ত হলেও সে মস্ত বড়ো শিল্পী, কি বৈজ্ঞানিক, কি দেশপ্রেমিক। ভালো বই বললেও তেমনি কথাটার নানারকম মানে হতে পারে। যেমন বইটাতে প্রচলিত সমাজ-বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই, কিংবা বইটা মিলনান্ত, পড়ে মন খারাপ হয় না কিংবা বইটা প্রচণ্ড বিপ্লবী, পড়বামাত্র সমাজব্যবস্থাকে উল্টে দিতে ইচ্ছা করে কিংবা বইটা কোনো বিশেষ রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে রচিত। আবার এই একই কারণে যে-কোনো বইকে নিন্দেও করা যেতে পারে।

চা-টা গরম বললে তা থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখা যায়, কেননা গরমটা চায়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু ভালোটা তেমনি করে চায়ের সঙ্গে মিশে থাকে

না, সেটা আরোপিত। ব্যক্তির রুচির উপর তা অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল।

কিন্তু সাহিত্যরুচি মানুষের সহজাত নয়, অর্জিত। সভ্য সমাজে অবশ্য ইস্কুল-কলেজ-সিনেমা-রেডিও'র দৌলতে কিছুটা শিল্পানুভূতি অপ্রত্যক্ষভাবেই আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। কিন্তু তা নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের অনুভূতি। শুধু এ টুকুর ওপর নির্ভর করে সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করতে গেলে বিপত্তি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া প্রত্যেক যুগ এবং প্রত্যেক সমাজই কতগুলি সংস্কারের অধীন। অলক্ষ্যে তা আমাদের দৃষ্টিকেও আবিল করে তোলে। তাই নতুনকে সহজে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। পুরনো বই বিশেষ করে যে বই ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে তার সম্পর্কে যে আমরা মোটামুটি একমত হতে পারি তার কারণ দীর্ঘকালের আলোচনার মধ্য দিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি।

অতীত নিশ্চয়ই বর্তমানের ভিত্তিভূমি। তাই অতীতকে অস্বীকার করবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভিত তাই বলে অট্টালিকা নয়। শুধু অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে সাহিত্যের অগ্রগমন রুদ্ধ হবে। কোনো বিশেষ রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব দেখালে সাহিত্য হারাবে তার বৈচিত্র্য।

সমালোচনা আসলে এক বইয়ের সঙ্গে আর এক বইয়ের তুলনা কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে এক অলিখিত বইয়ের সঙ্গে তুলনা যা তিলোত্তমার মতো সব ভালো বইয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ জুড়ে কল্পনায় রচিত।

কিন্তু কল্পনায় রচিত এই বইটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, যে বইটিকে তুলনা করা হচ্ছে তার সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল হতে পারে, ফলত যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছব তাও হতে পারে ভ্রমাত্মক।

বইয়ের কাছ থেকে আমরা কি পাব তা অনেক পরিমাণ নির্ভর করে কি চাইব তার ওপর। আমাদের চাওয়াটা ভুল হতে পারে, এক একজনের এক এক রকম হতে পারে আর আমাদের অপ্রাপ্তিটাও তাই হতে পারে এক একজনের এক এক ধরনের।

তবে কি একটা বই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয় বা উচিত নয়? মহাকালের উপর বরাত দিয়ে আমরা কি শুধু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? তা কেন—আমাদের বক্তব্য আমরা বলব কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখব আমাদের বক্তব্য ভুল হতে পারে। সুতরাং অন্যমত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনব এবং বুঝবার চেষ্টা করব। এরই নাম বোধ হয় বিনয়।

শলোকভ

এবার (১৯৬৫) সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন শলোকভ—সোভিয়েত সাহিত্যের সম্মানিত প্রধান পুরুষ। তাঁকে নিয়ে মোট তিনজন রুশ লেখক এই বিশ্বনন্দিত পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলেন। অপর দু-জন ইভান বুনিন ও বরিস পাস্তেরনাক। স্বদেশে প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে অবশ্য পাস্তেরনাককে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

বুনিন আর পাস্তেরনাক, তাঁদের নিঃসন্দেহ সাহিত্যপ্রতিভা সত্ত্বেও, পুরস্কৃত হয়েছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক কারণে। বুনিন ছিলেন দেশত্যাগী আর পাস্তেরনাক সোভিয়েত-ব্যবস্থার সমালোচক। শলোকভ তা নন। তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার একনিষ্ঠ সমর্থক, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (প্রসঙ্গত, তিনিই একমাত্র কমিউনিস্ট লেখক যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন), গৃহযুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর মর্যাদার তুলনা হতে পারে একমাত্র গর্কির সঙ্গেই।

সুপ্রিম সোভিয়েতের ডেপুটি, আকাদেমির সদস্য—সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর জনপ্রিয়তার তুলনা নেই। তাঁর বইয়ের বিক্রির সংখ্যা বিশ-ত্রিশ লক্ষ। চৌত্রিশটি ভাষায় তাঁর অনুবাদ হয়েছে। তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস "দ্য কোয়ায়েট দোন" শেষ করতে লেগেছে চৌদ্দ বছর। ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সালের

মধ্যে চারখণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়। শেষ খণ্ডটি যেদিন প্রকাশিত হলো তার আগের দিন রাত্রি থেকে বইয়ের দোকানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মস্কোর অগণিত জনসাধারণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সাহিত্য-সম্মানে ভূষিত, এ বছর সাড়ম্বরে সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে তাঁর ষষ্ঠিতম জন্ম-বার্ষিক উদ্‌যাপিত হলো। আর এ-বছরই পেলেন তিনি নোবেল প্রাইজ, 'কোয়ায়েট দোন'-এর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবার ঠিক পঁচিশ বছর পরে। সন্দেহ নেই, এই দেরীর কারণ রাজনৈতিক—শলোকভের কমিউনিস্ট মতবাদ। তাঁকে পুরস্কার দিতে দেরী হয়েছে, নোবেল কমিটিও তা স্বীকার করেছেন, অবশ্য কি কারণে তা তাঁরা ব্যাখ্যা করেননি। তবে কথায় আছে 'বেটার লেট দ্যান নেভার'। পুরস্কার দেবার জন্যে তলস্তয়, চেহভ, গর্কিকে তো আর পাওয়া যাবে না।

দোন অঞ্চলের মানুষ, শলোকভ তাঁর সাহিত্যে দোন অঞ্চলের মানুষের জীবনগাথাই রূপায়িত করেছেন। 'টেলস্ অব দোন' তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ। সমালোচকদের মতে যদিও তা কোনো মহৎ সাহিত্যকর্ম নয়, তাতেই এর সূচনা। তারপর 'কোয়ায়েট দোন', 'ভার্জিন সায়ল আপটার্নড', 'দে ফট ফর দেয়ার কান্ট্রি' 'ম্যানস্ ফেট' ইত্যাদিতে সেই একই অঞ্চলের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন শলোকভ।

রুশ সাহিত্যের মূলধারার অনুপ্রেরণাতেই সম্ভবত শলোকভ প্রথম থেকেই মহাকাব্যোপম উপন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'দ্য কোয়ায়েট দোন' সব দিক থেকেই 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-এর আদলে রচিত। কী স্থাপত্যে, কী শিল্পরীতিতে, কী চরিত্র-চিত্রন পদ্ধতিতে, সর্বত্রই তলস্তয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। তলস্তয়ের অনুসরণেই তিনি ব্যক্তি-জীবন ও ইতিহাস, যুদ্ধ এবং গৃহস্থালীর চিত্র, জনসাধারণের আন্দোলন ও ব্যক্তি মানুষের আবেগকে এক সূত্রে গেঁথেছেন, দেখিয়েছেন কি ভাবে সামাজিক আবর্তন পরিবর্তিত করে ব্যক্তিগত নিয়তিকে, রাজনৈতিক সংগ্রাম নির্ধারিত করে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখ এবং সর্বনাশ। গ্রিগরি মেলেকভ এবং অ্যাকসিনিয়ার প্রণয়কাহিনী যদিও 'দ্য কোয়ায়েট দোন'-এর কেন্দ্রকাহিনী এবং তাই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে সচলও রাখে তবু সেই সঙ্গে তা আবার সমগ্র কসাক জীবনকেও ছুঁয়ে যায়, দোন তীরবর্তী এই আধাসামরিক আধাকৃষিজীবী এই খণ্ডজাতির সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারকেও রূপায়িত করে। আবার জারের আমল, প্রথম মহাযুদ্ধ, বলশেভিক বিপ্লব এবং

যুদ্ধেরও তা বিস্ময়কর জীবন্ত দলিল। বলতে কি, শেষের খণ্ডগুলি, বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ড তো খবরের কাগজের বিবরণ, সরকারি ঘোষণা ও অন্যবিধ তথ্যে বেশ কিছুটা ভারাক্রান্তই। সে দিক থেকে 'কোয়ায়েট দোন'-কে গল্পাকারে ইতিহাসও বলা যায়। তবু 'কোয়ায়েট দোন'-কে শুধু সামাজিক-রাজনৈতিক দলিল হিসেবে দেখানো ভুল হবে—'কোয়ায়েট দোন' সত্যকারের সাহিত্যকর্ম, বাস্তবতা সেখানে পুনর্নির্মিত, মানুষ জীবন, লেখকের জীবন-দর্শন শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত।

কমিউনিস্ট শলোকভ তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্য তাঁর সাহিত্যে কখনও গোপন করেন নি, পার্টির সদস্যদের তিনি আকর্ষণীয় বীর চরিত্ররূপে, 'পজেটিভ হিরো' রূপেই এঁকেছেন—কিন্তু তার রাজনৈতিক মতবাদ তিনি কখনও পাঠকদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন নি, বা মাদুলীর মতো স্থানে-অস্থানে ঝুলিয়ে রাখেন নি। তাঁর মতবাদ তাঁর দৃষ্টিকে আবিল করে নি, আরও স্বচ্ছ করেছে, তাই তাঁর বর্ণনাও যথাযথ এবং সত্যমূলক। আর তাই রুশ পাঠক গ্রিগরির ভাগ্যবিবর্তনের মধ্যে নিজেদের সাম্প্রতিক অতীতকে সহজেই চিনে নিতে পারে।

দোন অঞ্চলে সোভিয়েত হুকুমতের প্রতিষ্ঠা সাহজসাধ্য হয়নি, কসাকেরা নতুন ব্যবস্থাকে প্রথমে মেনে নিতে পারে নি—দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তারা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। এই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে রুশিয়ার আরও বহু অঞ্চলেই—'কোয়ায়েট দোন' তাই শুধু দোন অঞ্চলের কাহিনী নয়, সারা রুশ দেশেরও কাহিনী। সে কাহিনী আবার বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের, সংশয় ও সন্দেহের, অচলায়তন ও পরিবর্তনের সংঘাতের কাহিনী—আর শলোকভ তাকে রূপায়িত করেছেন জীবন্ত মানুষের মধ্য দিয়ে, তাদের জীবন, তাদের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে। কাহিনীকে শলোকভ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের লেজুড় করেন নি, জোর করে কোনো বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেন নি প্লটকে। তিনি শুধু কতকগুলি ঘটনাকে, বহুখাতে প্রবাহিনী জীবনকে তুলে ধরেছেন পাঠকের চোখের সামনে।

চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতায় আধুনিক সাহিত্যে শলোকভের জুড়ি মেলা ভার। 'কোয়ায়েট দোন'-এ অসংখ্য চরিত্রের ভিড়—শলোকভ শুধু যে প্রধান চরিত্রগুলিকেই অসীম যত্ন নিয়ে এঁকেছেন, তাই নয়, অপ্রধান চরিত্রগুলির তুচ্ছ খুঁটিনাটিও তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি।

সোভিয়েত পাঠকের কাছে 'কোয়ায়েট দোন'-এর আর একটি আকর্ষণ— দোন অঞ্চলের নিসর্গের, ঋতুচক্রের বর্ণাঢ্য প্রতিকৃতি।

'কোয়ায়েট দোন'-এর বিশালতা আরও এক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ। পটভূমির বিশালতায়, চরিত্র এবং ঘটনার ঠাসাঠাসিতে, প্রকৃতি-পটের বৈচিত্র্যে— মহাদেশোপম রুশিয়ার বিরাটত্বই যেন এখানে আভাসিত। উপন্যাসের ঘটনার ছত্রে ছত্রে বিচ্ছুরিত শক্তির দীপ্তি। কসাকদের প্রবল জীবন, গ্রিগরির দুঃসাহসিক কার্যাবলী, অ্যাকসিনিয়ার প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের বজ্রনাদী বিস্ফোরণ, আবেগের তীব্রতা—সবকিছুকেই অদ্ভুত শক্তিমত্তায় স্পন্দমান করে তুলেছেন শলোকভ। আর এদিক দিয়ে ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যের তিনি সুযোগ্য উত্তরসূরী।

শলোকভের দ্বিতীয় মহাগ্রন্থ 'ভ্য ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'—সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথ কৃষি প্রবর্তনের কালে যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তারই সাহিত্যিক প্রতিরূপ। কৃষিজমির যৌথকরণ এবং কুলাকদের উচ্ছেদ ছিল ত্রিশের যুগের জ্বলন্ত সমস্যা। 'ভ্য কোয়ায়েট দোন' অসমাপ্ত রেখে শলোকভ এই বিষয়ে একটি উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ১৯৩২ সালে 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড' প্রধানত একটি সামাজিক রেখাচিত্র, কিন্তু এ উপন্যাসের জনপ্রিয়তা শুধু এ কারণেই নয়। 'কোয়ায়েট দোন'-এর তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ হলেও, 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এরও প্রধান আকর্ষণ মানবিক মহানাটক।

এই উপন্যাসের প্রাধন চরিত্র দাভিদভ একজন প্রাক্তন শ্রমিক। ১৯৩০ সালে বাছাই করা যে পঁচিশ হাজার পার্টি সদস্যকে গ্রামে পাঠান হয়েছিল যৌথকৃষি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে দাভিদভ ছিল তাদের একজন। দন নদীর তীরে গ্রেমিয়াচি লগ গ্রামে এসে দাভিদভ সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নেতৃত্ব করে কুলাকবিরোধী অভিযানে আর সেই সঙ্গে ধরা পড়ে লুশ্‌কা নামে বিশ্বাসঘাতিনী এক মোহিনীর প্রেমের ফাঁদেও। যৌথখামারের সভাপতিরূপে দাভিদভের নির্বাচনে প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের ঠিক সাতাশ বছর পরে, ১৯৬০ সালে। এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্লট আবর্তিত হয় গ্রামে লুকিয়ে থাকা একদল প্রতিবিপ্লবীর চক্রান্তকে কেন্দ্র করে। চক্রান্ত অবশ্য ব্যর্থ

হয় কিন্তু প্রতিবিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিহত হয় দাভিদভ ও নেগুলনভ। তবু কাহিনীর পরিসমাপ্তি আশাবাদী সুরেই।

এই উপন্যাসেও নতুন করে শলোকভের চরিত্র-চিত্রন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। ময়দান্নিকভ, দাভিদভ, নেগুলনভ, পিতামহ শ্চুকর প্রভৃতি চরিত্র-গুলি কায়াপরিগ্রহ করে বইয়ের পাতা ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসে। বিপ্লবীদের মতো প্রতি-বিপ্লবীদের চরিত্রও সমান যত্ন নিয়ে আঁকেন শলোকভ।

শলোকভের তৃতীয় সুবৃহৎ উপন্যাস 'দে ফট ফর দেয়ার কান্ট্রি' এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় এর কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। ইংরেজি 'সোভিয়েত লিটারেচার' পত্রেও তা মুদ্রিত হয়েছে ইংরেজি জানা পাঠকদের জন্যে। যুদ্ধের উপর শলোকভের আর দুটি বড় গল্প হলো—'দ্য রাশ্যান ক্যারেক্টর' ও 'ম্যানস ফেট'। 'দ্য রাশ্যান ক্যারেক্টারে' শলোকভ রুশ জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন। একজন সাধারণ রুশ নাগরিক, যুদ্ধ এসে যার শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দিল—'ম্যানস ফেট' তার ভাগ্য বিবর্তনের এক আবেগঘন সাহিত্যিক রূপায়ণ।

শলোকভ-এর প্রায় সব লেখারই বাঙলা তরজমা হয়েছে কোনো-না-কোনো সময়ে। অবশ্য তা পাঠ করে বাঙালী পাঠক মূলের স্বাদ কতটা পাবেন বলা কঠিন। কসাকদের মুখের ভাষা এবং প্রবাদ-প্রবচনকে শলোকভ এমন নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন যে তার স্টাইল, কোনো সমালোচকের ভাষায়—'despair of translators'। আর বাঙালী অনুবাদক তো তরজমা করেন ইংরেজি তরজমা থেকে।

কোনো কোনো সমালোচক শলোকভকে বলেছেন 'the poet of a disappearing agricultural world'। কথাটা এক অর্থে সত্য। যদিও শলোকভ বেশ কয়েকটি পাঁচসালা সাতসালা পরিকল্পনার সমসাময়িক, কল-কারখানা নিয়ে তিনি কখনও কিছু লিখতে উৎসাহ বোধ করেননি। প্রথম জীবনে কিছুকাল অবশ্য তিনি মস্কোতে বাস করেছিলেন, শ্রমজীবী হিসাবে জীবিকা অর্জনও করেছিলেন। তারপরই তিনি ফিরে আসেন নিজের গ্রাম ভেশেনস্কায়ায় সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে। সেখানেই তিনি থাকেন, মস্কোয় আসেন কদাচিৎ। তার প্রিয় হবি মাছধরা, শিকার এবং পশুপালন।

বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, ক্রুশ্চভের ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে তিনি এমন

কি আমেরিকাও গিয়েছেন—কিন্তু ইওরোপ বা আমেরিকা তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করেনি। ইওরোপ-আমেরিকা বা বড় বড় শহরের জঁাকজমকের চেয়ে নিজের শান্ত গ্রামটিতে থাকতেই তিনি ভালোবাসেন। সরল শ্রমজীবী মানুষের সাহচর্যই তাঁর অভিপ্রেত। যথার্থ মাটির মানুষ তিনি, দোন অঞ্চলের মানুষ তাঁর সাহিত্যে দোন অঞ্চলের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়।

শলোকভ কমিউনিস্ট, বুদ্ধি দিয়ে ততটা নয় যতটা হৃদয় দিয়ে। হৃদয়বান মানুষ হিসেবেই তিনি কমিউনিজমকে গ্রহণ করেছেন। লেখক হিসাবেও তিনি হৃদয়বান। তার সাহিত্যে বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিরই প্রাবল্য। তত্ত্বের কচকচি তিনি পছন্দ করেন না। সাহিত্যনীতির আলোচনায় তিনি বড় একটা যোগ দেন না—কিন্তু যখন মুখ খোলেন তখন কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভেয়েত লেখক কংগ্রেসে তিনি এক কথায় সমস্ত সোভিয়েত সাহিত্যকে 'ধূসর একঘেয়েমী' বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। কবি-সাহিত্যিকদের বলেছিলেন মস্কো শহর ছেড়ে এসে গ্রামে "সত্যিকারের সাধারণ মানুষের" মধ্যে বসবাস করতে। আমাদের কবির মতো তিনিও জানেন সাহিত্যে 'নকল শৌখিন মজদুরির' স্থান নেই। শহরে বাস করে, কফিখানায় আড্ডা জমিয়ে, দু-চারটে মার্ক্স-লেনিনের বদহজমের উদ্গার তুলে জনসাধারণের সাহিত্য রচনা করা যায় না। সে ধরনের রচনা না সাহিত্য না জনসাধারণের। তার স্থান একমাত্র আস্তাকুঁড়েই।

শলোকভ সাহিত্যও করেন, রাজনীতিও করেন। কিন্তু সাহিত্যের রাজনীতি থেকে তিনি সর্বদাই দূরে থেকেছেন। শলোকভ স্তালিন-প্রশস্তি কখনও করেননি তা হয়তো নয়, কিন্তু লেখকদেয় প্রতি অবিচার হলে তার প্রতিবাদও তিনি করেছেন। সমালোচনার ফলে নিজের উপন্যাসও হয়তো তিনি সংশোধন করেছেন তবু লেখক সংঘের মাথামোটা আমলাদের বা নির্বো' সমালোচকদের নির্মম সমালোচনা করতেও তিনি কখনও পেছপা হননি।

পুরস্কার সাহিত্যকৃতির মানদণ্ড নিশ্চয়ই নয়। এবং শলোকভেরও এই নতুন পুরস্কার লাভ নয়। কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করলে পুরস্কারের মর্যাদ' বাড়ে। সন্দেহ নেই শলোকভকে পুরস্কৃত করায় নোবেল পুরস্কারেরই মর্যাদ' বেড়েছে। আর যে পুরস্কার দেবার জন্যে চার্চিল ছাড়া লোক খুঁজে পাওয়' যায় না সে পুরস্কারে মর্যাদা যে একেবারে তলায় এসে ঠেকেছিল নিতান্ত অন্ধ ছাড়া কে তা অস্বীকার করবে?

অতিকথনের দৃষ্টান্ত

দুদিনত্‌সেভের বইয়ের খ্যাতি এদেশে এসে পৌঁচেছিল বই এসে পৌঁছুবার আগেই। পশ্চিমী সমালোচকদের দৌত্যে আমরা এদেশে বসেই শুনতে পেয়েছিলাম, সোভিয়েত-যুগে যে সব উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে—'নট বাই ব্রেড এ্যালোন'-ই তার মধ্যে একমাত্র বই যাতে ধ্বনিত হয়েছে 'প্রকৃত রুশ মানবতার কণ্ঠস্বর' (authentic voice of Russian humanity)।

স্বনামধন্য এক ইংরেজ সমালোচক তো উচ্ছ্বসিতভাবেই লিখেছিলেন, দুদিনত্‌সেভের ড্রেন-পাইপের মধ্য থেকেই হয়তো বেরিয়ে আসবে নতুন সোভিয়েত-সাহিত্য—একদা রুশ-সাহিত্য যেমন বেরিয়ে এসেছিল গোগোলের কোটের মধ্য থেকে।"

পশ্চিমী সমালোচকেরা, যাঁরা সাধারণত সোভিয়েত-সাহিত্য চিমটের ডগা দিয়ে ছুঁতেও নারাজ তাঁরাই যখন দুদিনত্‌সেভের বই নিয়ে এবংবিধ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন তখনই সন্দেহ হয়েছিল এ উচ্ছ্বাস সাহিত্যিক ততটা হয়তো নয়, যতটা রাজনৈতিক। সন্দেহ হবার কারণও ছিল—সমালোচকদের কাছ থেকেই আমরা শুনেছিলাম, দুদিনত্‌সেভ "সোভিয়েত বাস্তবের" অন্ধকার দিকটাই চিত্রিত করেছেন। আর দুঃখের হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিষে আজকের আবহাওয়া

যখন দূষিত তখন একান্ত রসবাদী সমালোচকও সাহিত্য-বিচারে (বিশেষ করে যে সাহিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি প্রতিকূলভাবে চিত্রিত) রাজনীতি আমদানি না করে পারেন না। দুদিনত্‌সেভের বইয়ের ক্ষেত্রে অন্তত যে তা করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সোভিয়েত সাহিত্যের বিরুদ্ধে পশ্চিমী সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ এই যে, সোভিয়েত সাহিত্য ছকে বাঁধা, চরিত্রগুলি সেখানে মানবিক গুণাগুণ-বর্জিত এবং তারা চলাফেরা করে সরল রেখা ধরে। সে সাহিত্যে জীবনের জটিলতা প্রতিফলিত নয়—সে সাহিত্যের সমস্ত পরিকল্পনাটাই প্রচারমূলক। এ সমালোচনা অংশত যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই আর আজ তা এমন কি সোভিয়েত দেশেও স্বীকৃত হচ্ছে। যদিও জীবনের জটিলতা বলতে এই শ্রেণীর সমালোচকরা যা বোঝেন তা কতটা ঘাতসহ এবং সাহিত্যমাত্রেই প্রচারমূলক কিনা এবং কি অর্থে তা নিয়ে তর্কের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। সে তর্ক অবশ্য আপাতত মুলতুবি রাখা যেতে পারে এবং সোভিয়েত-সাহিত্য সম্পর্কে পশ্চিমী সমালোচনার কতটা সত্য আর কতটা নয়—তুলাদণ্ড নিয়ে তা মাপতে বসারও প্রয়োজন নেই। কেননা, এই মাপ-জোকের ফলাফল যাই দাঁড়াক, সোভিয়েতসাহিত্য সম্পর্কে পশ্চিমীদের সমালোচনা অন্তত দুদিনত্‌সেভের বই সম্পর্কে যে পুরোপুরি প্রযোজ্য তাতে সন্দেহ নেই।

ছক দুদিনত্‌সেভের বইতেও আছে এবং 'নট বাই ব্রেড এ্যালোন'-এর কুশীলববৃন্দ ত্রিমাত্রিক গভীরতা পেয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। আর জীবনের জটিলতা? এ-বইয়ে জীবন কতটা প্রতিফলিত হয়েছে সেইটেই ভাববার বিষয়।

একজন আবিষ্কারক ড্রেন পাইপ বানাবার একটি উন্নতধরনের মেসিন উদ্ভাবন করে আমলাতন্ত্র এবং কায়েমীস্বার্থের হাতে কি ভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিল তাই নিয়ে 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এর কাহিনী অংশ গঠিত।

নায়ক লোপাতকিন ছিল ইস্কুল-মাস্টার। যুদ্ধে গিয়েছিল সে—শরীরে এবড়ো-খেবড়ো ক্ষতের দাগও আছে একটা। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা মেনে নিয়ে যদি ইস্কুল-মাস্টারিতেই লেগে থাকত সে, তাহলে তার জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যেত হয়তো। কিন্তু রুটি খেয়ে বেঁচে থাকাটাকেই যারা চরম বলে মেনে নেয় লোপাতকিন তাদের দলের লোক নয়—জীবনের

দিকে ঝোঁকে লোপাতকিন। ড্রেন পাইপ তৈরির স্বয়ংক্রিয় একটা মেসিনের ছক তৈরি করে সে পেশ করে যন্ত্রবিজ্ঞান-গবেষণালয়ের কাছে। উদ্ভাবকের সার্টিফিকেট মেলে সহজেই। মেসিনটিকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে ডাকও আসে। লোপাতকিন ইস্কুল-মাস্টারিতে ইস্তফা দিয়ে আনন্দিত মনে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। এই থেকেই তার জীবনে বিপর্যয়ের সূচনা।

যন্ত্রবিজ্ঞান-গবেষণালয়ের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা আভদিয়েভও অনুরূপ একটা মেসিনের ছক তৈরি করেছে। কাজেই চাপা পড়ল লোপাতকিনের মেসিন। লোপাতকিনের মেসিনের জন্যে বরাদ্দ টাকা নিয়ে আভদিয়েভের মেসিন বানান চলতে থাকল। কিন্তু লোপাতকিন হার মানতে নারাজ। একাকী সে লড়তে লাগল শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক চক্রের বিরুদ্ধে—যার মধ্যে আছে উপমন্ত্রী সুতিকভ, বিজ্ঞানবিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা আভদিয়েভ আর স্থানীয় ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা দ্রজদভ।

দ্রজদভ 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অমায়িক লোক সে, কারখানার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও আছে তার। দ্রজদভ কর্মপটু। কারখানা পরিচালনা করে সে কড়া হাতেই। তার পরিচালনাগুণে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে কারখানার। কিন্তু সে কায়েমী স্বার্থের উপাসক—কেননা তার একমাত্র লক্ষ্য নিজের উত্তরোত্তর পদোন্নতি। তার সুন্দরী স্ত্রী নাদিয়া কিন্তু একটু অন্যধরনের মানুষ। দ্রজদভের ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতার বড়াই প্রথমটা তাকে মুগ্ধ করত। কিন্তু বৈষয়িক সাফল্য ছাড়া আরও কিছু কামনা করত সে।

লোপাতকিনের মধ্যে মনের ক্ষুধা মেটাবার মতো আত্মিক গুণের সমাবেশ দেখতে পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো নাদিয়া—সেই আকর্ষণ থেকে প্রেম।

এদিকে আভদিয়েভের মেসিন কাজে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় নতুন করে আবার ডাক পড়ল লোপাতকিনের। আভদিয়েভের দলও চুপ করে বসে নেই। লোপাতকিনের মেসিনের ডিজাইন করছিল যে তার মারফত ঐ মেসিনের মূলতত্ত্বটা চুরি করে আর একটা মেসিন বানিয়ে ফেলল তারা। আবার লোপাতকিনের মেসিনের কাজ মাঝ পথে বন্ধ হলো কিন্তু তবু আত্ম-বিশ্বাস হারাল না লোপাতকিন। আরও নিখুঁত, আরও কর্মক্ষম মেসিন বানানোর সঙ্কল্প করল সে নতুন করে।

ততদিনে দ্রজদভের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে নাদিয়া। বয়েস হয়েছে দ্রজদভের, নাদিয়ার ব্যাপার ভেঙে দুমড়ে দিয়েছে তাকে। আগেকার মতো সহিষ্ণুতা বা আত্মবিশ্বাস এখন আর নেই তার। শিল্পক্ষেত্রের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবার মিথ্যা অভিযোগে লোপাতকিনকে অভিযুক্ত করবার জন্য প্রতিপক্ষ যে চক্রান্ত করছিল দ্রজদভও তাতে যোগ দেয় এবার।

বিচারের নামে প্রহসন খাড়া করা হয় একটা। সাজা হয় লোপাতকিনের—আট বছর সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে কাটাতে হবে।

লোপাতকিনের এক প্রভাবশালী বন্ধু চক্রান্তকারীদের হাত থেকে ওর মেসিনের ছকটা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তারই তত্ত্বাবধানে উরাল অঞ্চলের এক কারখনায় তৈরি হয় লোপাতকিনের মেসিন এবং চক্রান্তকারীদের চোরাই করা মেসিনের তুলনায় তার কার্যকারিতাও অচিরেই প্রমাণিত হয়। এদিকে আইনের চাকাও ঘোরে—লোপাতকিনের বিরুদ্ধে মামলাটা যে সাজানো তা ধরা পড়ে যায়। আঠারো মাস পরে শ্রমশিবির থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসে লোপাতকিন। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়েছে সে। ভবিষ্যতের বন্ধ দরজাটা এবারে খুলে গেছে তার সামনে।

এই মিলনান্ত পরিণতির মধ্যেও একটু 'কিন্তু' তবু থেকে যায়। লোপাতকিন জয়ী হয়েছে বটে কি চক্রান্তকারীদের গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি, আমলাতন্ত্রও রয়ে গেছে অক্ষত। লোপাতকিনের সংগ্রাম তাই শেষ হয়েও শেষ হয় নি। মনে মনে সে সকল্প করে নতুন সংগ্রামের।

উপন্যাস হিসাবে 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন' পুনরুক্তিদুষ্ট, শ্লথগতি। মেসিনের এক ড্রয়িং থেকে আর এক ড্রয়িং-এর মধ্যদিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হয়েছে কাহিনী—ক্লান্তিকরভাবে। ৪৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাসের শেষ পাতা পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ খানিকটা ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। লোপাতকিনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের চক্রান্ত বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করতে পারেন নি লেখক। ফলে পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখতে অসমর্থ হয়েছেন তিনি। নাদিয়া-লোপাতকিনের প্রেমের উপাখ্যানটিও ট্রিটমেন্টের দোষে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। কাহিনীর বৃহত্তম অংশটাই আপিস ঘরের দমবন্ধ-করা আবহাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ—বর্তমান রুশিয়ার জনজীবনের পরিচয় এ-বইয়ে সামান্যই পাওয়া যাবে।

চরিত্রচিত্রণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত, ছকে বাঁধা। নায়ক লোপাতকিন একনিষ্ঠ,

একটু পাগলাটে ধরনের আত্মভোলা মানুষ—অন্তত লেখক তাকে এই ভূমিকা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রতিভাবান চরিত্রের এই গতানুগতিক কাঠামোতেও প্রাণসঞ্চার করতে পারেন নি দুদিনত্‌সেভ্‌—ফলে লেখক-আরোপিত ভূমিকাটি মুখোশের মতো অভিব্যক্তিহীনভাবে এঁটে থাকে লোপাতকিনে।

শুধু লোপাতকিন কেন, নাদিয়া, গালিত্‌স্কি, বসকো, দ্রজদভ ইত্যাদি কোনো চরিত্রই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি। সব কটি চরিত্রই যেন লেখকের হাতে সুতো দিয়ে বাঁধা পুতুল। লেখকের আঙুলের কারসাজিতে মঞ্চের সামনে এসে তারা হাত-পা নেড়ে নিজ নিজ ভূমিকা অভিনয় করে যায় —তবু তারা পুতুলই-যে তা ভোলা যায় না।

দুদিনত্‌সেভের রঙের বাক্সে মনে হয়, শাদা এবং কালো মাত্র দুটি রঙই আছে। তাঁর চরিত্রগুলি তাই হয় ভালো, নয় মন্দ। আর মাত্র ঐ দুটো বিশেষণ সম্বল করে বাস্তব জীবনের জটিল মানুষকে পরিমাপ করতে যাওয়াটা দুঃসাহসের পরিচয় বই কি!

সরাসরি কমিউনিস্ট-বিরোধিতা অবশ্য নেই দুদিনত্‌সেভের বইয়ে (কোনো কোনো পশ্চিমী সমালোচক এতে হতাশও হয়েছেন।) কমিউনিজম বা সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা নয়—দুদিনত্‌সেভের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল—আমলাতন্ত্র।

আমলাতন্ত্রের উপর আক্রমণ অবশ্য সোভিয়েত সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু দুদিনত্‌সেভের আক্রমণের ধারাটা স্বতন্ত্র। সোভিয়েত সাহিত্যে এতকাল যে ছক অনুসরণ করা হয়েছে—তাতে দেখা গেছে আমলাতন্ত্রকে শেষ পর্যন্ত সংশোধন করেছে পার্টি। দুদিনত্‌সেভের বইয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে পার্টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত (অনুল্লেখ অস্বীকৃতি কিনা তা অবশ্য নেহাতই অনুমানের বিষয়)—এখানে লড়াই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একক ব্যক্তির। শুধু তাই নয়, সমষ্টি এবং ব্যষ্টির প্রশ্নটি এ-বইয়ে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে মনে হয় লেখকের সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব ব্যষ্টির দিকে—যদিও এ-প্রস্থান কাহিনীর ছকে অপ্রমাণিতই থেকে গেছে।

তাছাড়া আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এ দুদিনত্‌সেভ যে ছবি এঁকেছেন তাতে মনে হবে, সোভিয়েত দেশে অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কোনো আবিষ্কার, নতুন কোনো উদ্ভাবনার স্বীকৃতি সহজে মেলে না। একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে দুদিনত্‌সেভ বলিয়েছেন : এতো

বুর্জোয়া দেশ নয় যে যান্ত্রিক উদ্ভাবনা একজনের কাছে না হলে আর-একজন শিল্পপতির কাছে গিয়ে বেচবে। মানতেই হয়, এ উক্তি সোভিয়েত ব্যবস্থার স্বপক্ষে যায় না। বইতে তিন-চারজন উদ্ভাবকের উল্লেখ আছে (বসকো, আরথাভস্কি প্রভৃতি)। তারা সকলেই ব্যর্থ, হতাশাগ্রস্ত। লোপাতকিন অবশ্য শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের প্রতিরোধ ভাঙতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু লেখক এ-ঘটনাটিকে যেভাবে এঁকেছেন তাতে একে ব্যতিক্রম বলেই মনে হবে।

ব্যতিক্রম যেহেতু নিয়মকেই প্রমাণ করে—তাই এইটেই ধরে নিতে হয় সোভিয়েত দেশে এ-ধরনের অবিচারের প্রতিকারের কোনো নিয়মতান্ত্রিক পথ নেই। খবরের কাগজে অভিযোগ করে চিঠি লিখলে সে অভিযোগের যাথার্থ্য যাচাইয়ের জন্য তাদেরই শরণ নেওয়া হবে—যারা অভিযুক্ত। আর সে ক্ষেত্রে সে চিঠি যে কখনও ছাপাখানার মুখ দেখবে না তাতো এক রকম স্বতঃসিদ্ধ (বসকো এবং লোপাতকিন—দুজনেরই এ বিষয়ে একই অভিজ্ঞতা)। পার্টির কাছে অভিযোগ করলেও তার পরিণতি একই হবে। সুতরাং প্রতিকার পেতে হলে ব্যক্তিগতভাবে লড়াই করে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। লোপাতকিন সেই পথই বেছে নিয়েছে। কিন্তু এ-পথেরও বিপদ আছে। বানানো মিথ্যা অভিযোগে লোপাতকিনের সাইবেরিয়ার লেবার-ক্যাম্পে নির্বাসিত হওয়াটা হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—বই থেকে এ-রকম একটা ধারণাও হতে পারে।

"সোভিয়েত বাস্তবে"র এই রকম একটা ছবি পশ্চিমীদের খুশি করবে নিশ্চয়ই। আর তাঁরা যে এ-বইকে রাজনৈতিক মূলধন করবেন—আজকের আবহাওয়ায় তাও স্বাভাবিক।

দুদিনত্‌সেভ নিজেও অবশ্য এতে অস্বস্তি বোধ করেছেন। ইংরেজি সংস্করণের পরিশিষ্টে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেনও, ".. certain journalists—'unfriendly experts on Russia'—at once saw only the passsges that interested them..... The negative facts—the 'dirt' which I washed out when I cleansed come dirty linen —these wore taken as weapons, as proof of conclusions prepared long in advance......when I read these articles, I was horror stricken......"

হয়ত সোভিয়েত বাস্তবের এই রকম একটা মসীবর্ণ ছবি আঁকা সত্যই দুদিনত্‌সেভের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এ-কথা তো সুবিদিত যে, সাহিত্যের বিচার লেখকের সদিচ্ছা বা তার অভাবের উপর নির্ভরশীল নয়।

আধুনিক সাহিত্যে মানুষ

কিছুকাল আগে একটি বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল, তার নাম, 'ম্যান ইন মডার্ন ফিকশন'। বইটি আকারে ছোট, লেখকও তেমন খ্যাতিমান নন, তবু বিষয়বস্তুর গুরুত্বে তা বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য সীমাবদ্ধ গ্রন্থের নামকরণেই তা অনুস্যূত আর গ্রন্থের ভূমিকাতেও লেখক বলেছেন, আধুনিক কথাসাহিত্যে মানুষের যে প্রতি-মূর্তি, তথা মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা বাণীরূপ পেয়েছে তাই তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র।

অবশ্য একে সীমাবদ্ধতা বলা সঙ্গত কি না তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কেননা, গল্প-উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু মানুষই, এবং মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের আলোচনা শূন্যগর্ভ, যদিচ সাহিত্যতত্ত্ব আর সমাজতত্ত্ব এক নয়। আলোচ্য গ্রন্থে অবশ্য সাহিত্যের প্রকরণগত সমস্যা উপেক্ষিত হয়েছে, শিল্পোৎ-কর্ষকে নিরিখ ধরা হয়নি,—সেদিক থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীকে একদেশদর্শী বলা যেতে পারে। তথাপি, আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে কতকগুলি মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে করেছেন তা আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। লেখক অবশ্য তাঁর আলোচনা হাল আমলের মার্কিন কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি যে সামান্য লক্ষণ দেখতে

পেয়েছেন তা আটলান্টিকের দুইতটের সাহিত্যেই কমবেশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং হয়ত আমাদের দেশের সাহিত্যেও। সাহিত্যকে যাঁরা চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক মূল্য দিয়ে থাকেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁরা চিন্তার খোরাক কিছু পাবেন বলেই মনে হয়।

লেখক, এডমণ্ড ফুলারের নিজের, মনে হয়, এ-বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। তাই হয়তো নিজের বইকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'সংখ্যালঘুর মত' এই অভিধায়। ফুলারের এই বর্ণনা নিছক তথ্য হিসেবেই গ্রাহ্য। কেননা, কোন মত কত বেশি সংখ্যক লোক পোষণ করে তা দিয়ে সেই মতের যাথার্থ্য বিচার হতে পারে না। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কারই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের মতেই সত্য হয়েছে অঙ্গীকৃত। অধিকাংশ আমেরিকান ফুলারের মতের অংশীদার না হতে পারেন তাতে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পাবে না। সমস্যাটা যেখানে সত্য নির্ণয়, গণতন্ত্রের স্থান স্বভাবতই সেখানে গৌণ।

ফুলারের মতামত সবটাই গ্রহণযোগ্য, এমন কথা তাই বলে অবশ্য বলা যায় না। ফুলার জাতিতে আমেরিকান, ধর্মে খ্রীষ্টান আর পেশায় শিক্ষক। 'ম্যান ইন মডার্ন ফিকশন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের এই কুলপঞ্জী স্মরণীয়। কেননা, তাঁর ধর্ম এবং পেশা দুই-ই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে।

ফুলার স্পষ্টই বলেছেন, তিনি জুডিও-ক্রিশ্চান মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং সেই মূল্যবোধে মানুষের যে প্রতিমূর্তি অঙ্গীকৃত হালের কথাসাহিত্যের মানুষকে তিনি সেই নিরিখেই বিচার করেছেন এবং বিচার করে হতাশ হয়েছেন। ফুলার অবশ্য প্রায় এক নিঃশ্বাসেই রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন তিনি শিল্পীর উপকরণ নির্বাচনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে তা সবই শিল্পের উপকরণ। তাঁর বিচারের মাপকাঠি এই যে শিল্পীর নির্বাচিত তথ্য সত্য কি না এবং সেই তথ্যের ব্যাখ্যা যুক্তিসিদ্ধ কি না। তবু অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রুচিবাই থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন কথা বলা কঠিন।

কিন্তু কিছুটা গোঁড়ামি, কিছুটা রক্ষণশীলতা এবং কিছুটা রুচিবাই ফুলারের দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছু পরিমাণে আবিল করলেও তিনি যখন বলেন, আজকের সাহিত্যে মানুষের যে প্রতিমূর্তি পাওয়া যায় ধ্রুপদী সাহিত্যের তুলনায় মাপে তা অনেক খাটো সে মন্তব্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করতে পারি না। তেমনি তিনি

যখন বলেন আজকের উপন্যাস গত যুগের তুলনায় চিন্তার সম্পদে দীন, নিরক্ত, সে কথাও অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়।

ফুলার দেখিয়েছেন গত শতকে এবং এই শতকের প্রথমার্ধে লেখকদের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল সমাজের অবক্ষয়, আর এখন তা দাঁড়িয়েছে মানুষের ব্যক্তিত্বের ক্ষয়। গত যুগের সাহিত্যে যে মানুষের ছবি পাই সে মানুষ ব্যক্তিত্ববান, দায়িত্বশীল, সে দোষ করে কিন্তু সংশোধনের অতীত নয়। আজকের মোহমুক্ত সাহিত্যিকের চোখে মানুষ ব্যক্তিত্বহীন, সমষ্টির অংশমাত্র, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নীতিবোধবিবর্জিত, সংশোধনের অতীত। সে মানুষ সমাজ বহিভূর্ত। আউটসাইডার। কাম্যুর ম্যরসোল সেই মানুষের প্রতিনিধি। এই মানুষ অবশ্যই সত্যিকারের মানুষের চেয়ে ছোট, ব্যক্তিত্বে খাটো।

সাহিত্যের এই অবস্থার জন্য ফুলার লেখক ও সমালোচক উভয় গোষ্ঠীকেই দায়ী করেছেন। গল্প-উপন্যাস মাত্রই জীবনের টীকা—লেখক নিজে সে সম্পর্কে সচেতন না হলেও। এতএব, জীবন-সম্পর্কে কোনো লেখকের যদি একটি সুসমঞ্জস ধারণা না থাকে তাহলে শিল্পী হিসাবে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি অসম্ভব। ঔপন্যাসিকের কোনো একটি 'থীসিস' নাও থাকতে পারে কিন্তু 'প্রেমিস' থাকা আবশ্যিক।

আজকের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকেরই জীবন-সম্পর্কে কোনো সুসমঞ্জস ধারণা নেই, তাঁদের কোনো 'থীসিস' তো নেই-ই, 'প্রেমিস'ও বিকৃত। স্টাইনবেক থেকে সুরু করে বিটবংশের কেরুয়াক পর্যন্ত চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েস, মাদকসেবীকে সাহিত্যে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যেন তারাই মানবজাতির সহানুভূতি ও অনুকম্পার একমাত্র স্বত্বাধিকারী। নারীত্বের চরম প্রকাশ তারা দেখতে পান শুধু বারবণিতা ও বিকৃতকামের সেবিকাদের মধ্যেই। যদিও ইতিমধ্যে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, হালের সাহিত্যে আমরা তাকে দেখি ভোগের যন্ত্র হিসাবেই—পুরুষের বিকৃতকামকে চরিতার্থ করাতেই যার কৈবল্যপ্রাপ্তি।

আজকের সাহিত্যিক কেমন যেন নিরাসক্ত, দায় দায়িত্বহীন। রাজপথে দুর্ঘটনা ঘটলে যে জনতার ভিড় জমে, আজকের লেখক যেন সেই কৌতূহলী দর্শকদেরই একজন মাত্র। আজকের সাহিত্যিক তাই যখন মানুষের দুঃখ-ভোগের চিত্র আঁকেন তাতে থাকে না অনুরাগের স্পর্শ। তাই সে চিত্র হয়ে পড়ে আবেগবর্জিত, প্রাণহীন। আজকের সাহিত্যিকের আদর্শ যেন সব

কিছু মার্জনা করা। হাল আমলের সাহিত্য তাই উত্তরোত্তর হয়ে উঠছে ক্লিনিকাল সাহিত্য। কিন্তু মনোবিশ্লেষণের কেস-হিষ্ট্রি থেকে মানুষের সর্বতোমুখী পরিচয় পাওয়া যায় না। এই ক্লিনিক্যাল সাহিত্যের মানুষ তাই পুরো মানুষ নয়, খণ্ডিত মানুষ।

এই সাহিত্য, বা ফুলার যাকে হয়ত বলবেন সাহিত্যের বিকার, তা যে আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়েছে—তিনি এর জন্য দায়ী করেছেন সমালোচকদের, সাহিত্য-পুরস্কারের জুরীদের। এডমণ্ড উইলসন, জন অ্যালরিজের মতো প্রখ্যাতনামা সমালোচকরাও ফুলারের লেখনীর তিরস্কার থেকে অব্যাহতি পাননি।

সাহিত্যের এই অবস্থা যদি কোনো রোগের লক্ষণ হয় তাহলে বলতেই হবে। উপসর্গ চিনতে ফুলার ভুল করেননি। কিন্তু তাঁর ডায়াগ্‌নোসিস সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। সামাজিক মূল্যবোধকে কোনো বিশেষ ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করা বিজ্ঞানসম্মত কিনা সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, তিনি যাকে জুডিও-ক্রিশ্চান মূল্যবোধ বলেছেন তাতে আস্থার অভাবটা রোগের কারণ নয়, পরিণতি। বরং যে নরম্যান মেইলারকে তিনি নস্যাৎ করেছেন, তাঁর বক্তব্যকেই অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। মেইলারের বক্তব্যের সারকথা এই যে সমসাময়িক আমেরিকানদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে 'হিপ' কিংবা 'স্কোয়ার'—একজন বিদ্রোহী, অপরজন 'কনফরমিস্ট'। হয় তোমাকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে নিতে হবে, নয়তো সর্বগ্রাসী সমাজ তোমাকে গ্রাস করবে। আর সে ক্ষেত্রে জীবনে সফল হতে গেলে তোমাকে কনফরমিস্ট হতেই হবে।

হিপস্টার বা বিটবংশীয়দের উন্মার্গগামিতাকে বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কিনা তা নিয়ে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সে আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় পাওয়ার এলিট ও অর্গানাইজেশন ম্যান অধ্যুষিত গণসমাজ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা থেকেই এই সমাজদ্রোহের জন্ম, যদিও তা হয়তো বিপথগামী।

ফুলার রোগ নিরূপণে ভুল করেছেন বলেই, তিনি যে নিদান দিয়েছেন তাও ব্যর্থ। ব্যাধি আসলে সাহিত্যের নয়, সমাজের। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমাজবাদী রূপান্তরেই মানবতন্ত্রের নবায়ণ সম্ভব। আর তখনই হয়ত সাহিত্যে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে ধ্রুপদী যুগের সেই বিস্ময়কর, পূর্ণাঙ্গ মানুষকে।

অর্থহীনতার দর্শন

'দি আউটসাইডার' নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আলবের কামুর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু প্রথম উপন্যাস হলেও কামুর সাহিত্যে 'আউটসাইডার' একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তাঁর দর্শনচিন্তার সার্থক ব্যাখ্যানরূপে।

আউটসাইডারের ঘটনাস্থল আলজিরিয়া এবং কেন্দ্রচরিত্র কোনো বেসরকারি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানী ম্যরসোল। 'দি আউটসাইডার' নামকরণের মধ্যেই আছে ম্যরসোল চরিত্রের সংকেত।

ম্যরসোলকে বলা যেতে পারে সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি। জগত-ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত। দৈহিক অনুভূতি ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই নেই তার। বইয়ের একেবারে প্রথম পাতা থেকেই ম্যরসোল চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আউটাইডারের কাহিনীর শুরু ম্যরসোল-এর মাতৃবিয়োগ থেকে। কিন্তু মায়ের মৃত্যু সংবাদে ম্যরসোল-এর কোনো ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। একটু বিব্রতই হয় বরং সে, কেননা আপিস থেকে দুদিন ছুটি নিতে হয় তাকে। মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে গিয়েও রাতজাগা এবং কাঠফাটা রোদ্দুরের মধ্যে শবানুগমনের শারীরিক কষ্টটুকু ছাড়া আর কোনো দুঃখ বা বেদনাবোধ জাগে না তার মনে। মায়ের শেষকৃত্যের পরদিন অনায়াসে সে সাঁতার কাটতে যেতে

পারে, ভাব জমিয়ে তুলতে পারে আধ-চেনা একটি মেয়ে মারির সঙ্গে, তারপর তাকে নিয়ে হাসির ছবি দেখতে যাওয়া এবং রাত্রিবাস করা এ-সবতো matter of course মাত্র। কিন্তু এই মেয়েটি সম্পর্কেও বিশেষ কোনো আবেগ বা অনুরাগ দেখা যায় না ম্যরসোল-এর মনে। মারি যখন জিজ্ঞাসা করে ম্যরসোল তাকে বিয়ে করবে কিনা, সে জানায় তার আপত্তি নেই। মারি জিজ্ঞাসা করে, ম্যরসোল তাকে ভালোবাসে কিনা। জবাবে ম্যরসোল জানায়, তার কাছে এ প্রশ্ন অর্থহীন—তবে, সম্ভবত, সে তাকে ভালোবাসে না। মারি বলে 'এই যদি তোমার মনোভাব তবে আমাকে বিয়ে করবে কেন?' ম্যরসোল বলে, 'ব্যাপারটার সত্যিই কোনো গুরুত্ব নেই—তবে মারি যদি এতে খুশি হয় তাহলে এই মুহূর্তেই সে তাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।'

এদিকে মারির সঙ্গে যখন পুরোদস্তুর 'প্রণয়লীলা' চলছে—পাশের ঘরের প্রতিবেশী সন্দেহজনক চরিত্রের রেমঁর সঙ্গে তার হঠাৎ যোগাযোগ ঘটে যায়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ম্যরসোল চরিত্রের আর একটি দিক আলোকিত হয়ে ওঠে—প্রেমের মতো বন্ধুত্বের ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। কাউকে সে ভালোবাসে না, তাই ঘৃণাও করে না কাউকে—বন্ধুত্ব তার কাছে ফাঁকা কথা—তাই সন্দেহজনক চরিত্রের রেমঁ এসে যখন জিজ্ঞাসা করে, ম্যরসোল তার সঙ্গে দোস্তি পাতাবে কিনা, সে বলে তার আপত্তি নেই। কোনো অনুরাগ-বিরাগ না থাকা সত্ত্বেও ম্যরসোল রেমঁর সঙ্গে শুধু যে বন্ধুত্বই পাতায় তা নয়—রেমঁ ও এক আরবের এক জঘন্য কলহের মধ্যেও জড়িয়ে পড়ে। সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি ম্যরসোল-এর কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাই রেমঁকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও ম্যরসোল-এর বাধে না। তারপর কতগুলি আকস্মিক ঘটনার সরণি বেয়ে ম্যরসোল নিজেকে আবিষ্কার করে সমুদ্র-সৈকতে রেমঁর শত্রু সেই আরবটির মুখোমুখি। আরবটি একটি চকচকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত। ম্যরসোল-এর হাতে রিভলবার। খানিকটা চোখ-ধাঁধানো রৌদ্রের প্রভাবে, নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই আরবটাকে গুলি করে ম্যরসোল। তারপর তার নিঃসাড় দেহটার উপর পরপর আরও তিনবার গুলি চালায়। এই হত্যাকাণ্ড গল্পের একটি পর্বান্ত সূচিত করে। দ্বিতীয় পর্বে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ম্যরসোলকে দেখা যায় কারাকক্ষে। কিন্তু এখানেও তার কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। নিজের ভাগ্য সম্পর্কে সে তেমনি উদাসীন, তেমনি নিস্পৃহ। রেমঁকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যাসাক্ষ্য

দিতে যার আপত্তি হয় নি—আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছে আদালতে এই কথা বলতে সে নারাজ হয়। মামলার সময়ও তার এই নিরাসক্তি বজায় থাকে। বিচারে ম্যরসোল-এর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু তবু তার মধ্যে বিশেষ কোনো ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সমস্ত কাহিনীর মধ্যে মাত্র একবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, নিষ্ক্রিয়তা অপসৃত হয়—সে হচ্ছে ধর্মযাজক যখন কারাকক্ষে এসে তাঁকে কৃতকার্যের জন্যে অনুশোচনা করতে বলে, পরলোকে সুখ-শান্তির দোহাই দেয়। হঠাৎ সে ক্ষেপে গিয়ে ধর্মযাজককে আক্রমণ করে। সেই 'great rush of anger' যেন তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। যাজক চলে যাবার পর ম্যরসোল-এর মন ভরে যায় 'পৃথিবী সম্পর্কে একটা কোমল বৈরাগ্যে'। মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি এসে ম্যরসোল-এর আত্মোপলব্ধি হয়, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সে বোঝে, সারা জীবন সে সুখেই কাটিয়েছে, সে বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় নতুন করে, একেবারে শুরু থেকে। তার এই বাসনা যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য সে কামনা করে তার প্রাণদণ্ডের সময় যেন অনেক লোক উপস্থিত থাকে এবং তারা যেন ঘৃণা দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করে।

এই আপাতসরল গল্পটির মধ্যে কামু একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন—আর এই তত্ত্বটিই হচ্ছে ম্যরসোল চরিত্রের সাংকেতিক বাক্য।

ম্যরসোল চরিত্র বুঝতে হলে কামুর এই দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার।

কামুর দার্শনিক তত্ত্বের সাংকেতিক শব্দটি হচ্ছে 'অর্থহীনতা' (absurd)। কামুর মতে জীবন অর্থহীন—কেননা, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করা যায় না—আর যুক্তির চেয়ে বড়ো আর কি আছে? অতএব পৃথিবী অর্থহীন। কোনো মানবিক আবেগ, অনুভব, আদর্শেরই কোনো মূল্য নেই। একটি মাত্র ধ্রুব রক্তাক্ত ভবিষ্যত মানুষের জন্যে অপেক্ষা করছে—তা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুতেই জীবনের সর্বাঙ্গীণ অর্থহীনতা ও মূল্যহীনতার সমাপ্তি। জীবনের এই অর্থহীনতার উপলব্ধি হয় তখনই যখন মানুষ মরীয়া হয়ে জীবনের অর্থ খোঁজে। এই অর্থহীনতা শাশ্বত—তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। অতএব বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। অবস্থা অসহনীয় হলে বিদ্রোহ করা যেতে পারে—কিন্তু এই বিদ্রোহের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। বিদ্রোহ শুধু অন্যায়ের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিবাদ—তার বেশি কিছু নয়। আর এই বিদ্রোহ শুধু অন্তরের

ব্যাপার। অর্থাৎ এ তত্ত্বের মূলকথা দাঁড়ায় শুধুই নেতি, শুধুই অস্বীকৃতি। প্রশ্ন উঠতে পারে—জীবন যার কাছে এতই অর্থহীন সে আত্মহত্যা করলেই তো পারে। প্রশ্নটা কামুর মনেও উঠেছে। কামু এক সময় লিখেওছিলেন—আত্মহত্যার সমস্যাটিই হচ্ছে দর্শনের জগতের একমাত্র সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জীবনের অর্থ নেই—একথা স্বীকার করলে তার স্বাভাবিক পরিণতি কি আত্মহত্যা? "অর্থহীনতা কি এইটেই দাবি করে যে আমি নিজেকে হত্যা করব?" কামু অবশ্য এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই দিয়েছেন—কেননা আত্মহত্যা হচ্ছে অর্থহীনতা থেকে পলায়ন। আত্মহত্যা কাপুরুষতা। "The man under Sentence of Death is freer than the suicide—than the man who takes his own life"[১] কেননা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত লোক নিজের সাহসের বলে সমাজের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, নিজের বুদ্ধির স্বাধিকারের বলে মৃত্যুকে ব্যর্থ করতে পারে। অর্থাৎ, Only in the conscious and disinterested commission of a crime can the inherited sense of undifferentiated guilt be transcended and personality fulfilled in the concrete expression of predetermined evil. Thus the individual redeems himself from guilty society by the most violent demonstration of his non-responsibility.[২]

এতত্ত্ব নিষ্ক্রিয়তার তত্ত্ব, আত্মসমর্পণের তত্ত্ব। অর্থহীনতার উপলব্ধি মানুষকে দেয় সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি—ভবিষ্যত তার কাছে হয়ে পড়ে অর্থহীন। তার কাছে বর্তমানই একমাত্র সত্য—তার একমাত্র সম্বল বেঁচে থাকার শারীরিক অনুভূতিটুকু। সুতরাং বিদায় যুক্তি, বিদায় মানবিক আবেগ-অনুভূতি, বিদায় সামাজিক ন্যায়নীতি—বাঁচো শুধু দৈহিক অনুভূতি সম্বল করে, বাঁচাটাই বড়ো কথা।

ম্যরসোল কামুর এই দার্শনিক তত্ত্বেরই ব্যক্তিরূপ। সে তাই সমাজে outsider, নিজের কাছেও আগন্তুক। নিরবচ্ছিন্ন বর্তমানে বাস করে সে।

১। The Myth of Sisyphus : Albert Camus

২। The Sense of Guilt and the Influence of Dostoievsky : Randell Swingler, Modern Quarterly Miscellany. No. 1

পারিপার্শ্বিককে স্বীকার করে নিয়েছে সে—তার মনে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তার জীবনদর্শন একটা আছে; কিন্তু সেটা চিন্তা দিয়ে বোঝা নয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে সে যখন এমন একটা ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে—যার পরিণতি পূর্বে বর্ণিত হত্যাকাণ্ড, যা তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে—তখনই তার এই অনুভূত দর্শনের পরিচয় পাই আমরা। আদালতে দাঁড়িয়ে সে ভাবে: "I have always been far too much absorbed in the present moment, or the immediate future, to think back···I hadn't the right to show any friendly feeling or possess good intentions." কেননা, পৃথিবী অর্থময়—এই মিথ্যা বিশ্বাসের উপরই সব মানসিক আবেগ-অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত। যে স্থান খুঁজে নিয়েছে অযৌক্তিক সমাজের বাইরে—সমাজের ফাঁকা ন্যায়নীতির খেলায় কেন মাতবে সে। তার মধ্যে আবেগ নেই, উত্তেজনা নেই, উত্তাপ নেই —এমন কি নিজের ভাগ্য সম্পর্কেও নেই কোনো উদ্বেগ। নেই তার কারণ সে জানে: "···I was to die sooner than others, obviously. 'But', I reminded myself, 'that it is common knowledge that life is not worth living anyhow. And on a wide view, I could see that it makes little difference whether one dies at the age of thirty or three scores and ten—since, in either case other men and women will continue living, the world will go on as before. Alas, whether I died now or forty years hence, this business of dying had to be got through inevitably." মরতে যখন হবেই, তখন দু'দিন আগে আর দু'দিন পরে কি এসে যায়। তাই অনায়াসে সে ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁসুলির সওয়ালের তারিফ করতে পারে—যদিও সে সওয়াল তার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে তুলেছে। এই কারণেই নিজের কৌঁসুলির সওয়াল জবাবের সময় সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারে। সেই সময়কার Only one incident stands out, towards the end, while my counsel rambled on, I heard the tintrumpet of an ice-cream vendor in the street, a small, shrill sound cutting accross the the flow of words.

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর যে ম্যরসোল-এর সুপ্তি ভাঙে তার কারণ এই যে, নিরাসক্তভাবে সে একটি হত্যাকাণ্ড করেছে, সমাজের নিয়ম ভেঙেছে—তাই

সমাজের থেকে অর্শানো পাপবোধ থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। সে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত—তাই সমাজের উর্ধ্বে ওঠার পথ তার কাছে মুক্ত। মুক্ত বুদ্ধি এখন তাকে দিতে পারে সেই শক্তি—যা মৃত্যুকে ব্যর্থ করে। তাই ম্যরসোল মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (অবশ্য কামুর নিজস্ব অর্থে) ঘোষণা করে বলতে পারে : "all that remained was to hope that on the day of my execution there should be a huge crowd of spectators and that they should greet me with howls of execration.' তাছাড়া মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে স্বাধীনতারও স্বাদ পায়, কেননা অবাস্তবতা থেকে মুক্তিই স্বাধীনতা। ম্যরসোল তাই ভাবে, With death so near, Mother must have felt like someone on the brink of freedom ready to start life all over again....And I too, felt ready to start life over again.

'দি আউটসাইডার,' পড়তে পড়তে সংগতভাবেই আর একটি বই এবং আর একটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে—তা হচ্ছে 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট' ও রাসকোলনিকভ। ম্যরসোল-এর মতো রাসকোলনিকভও নিঃসঙ্গ, সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি। সেও হত্যাকারী আর সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের যোগ সামান্যই। রাসকোলনিকভ ও ম্যরসোল উভয়ের জীবনেই হত্যাকাণ্ড সংকট এবং সমাধানের সূচক।

কিন্তু ম্যরসোল আর রাসকোলনিকভ-চরিত্রে মিল যতটা, গরমিলও বোধ হয় তার চেয়ে কম নয়।

দুই বইয়ের দুই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য পাশাপাশি রেখে পড়লেই এই গরমিলটা ধরা পড়বে।

রাসকোলনিভ হত্যা করেছিল সচেতনভাবে, পূর্বে পরিকল্পনা করে—তবু তার মনে দ্বিধা ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল, সংশয় ছিল। ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্টের একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই রাসকোলনিকভের এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বারে বারে সে নিজেকে প্রশ্ন করছে—এ কাজ কি তার দ্বারা সম্ভব ? সে কি এ কাজের উপযুক্ত ? এমন কি কুঠার হাতে ইভানোভনার ফ্লাটের দরজার সামনে এসেও তার সংশয় কাটে না—ঘরের মধ্যে ঢুকেও ইতস্তত করে সে। আবার সে দুর্বল হয়ে পড়ে...কুঠার সহ হাত আর উঠতে চায় না। কিন্তু যতই দুর্বল মনে হয় নিজেকে, ততই উত্তেজনা বাড়ে। অবশেষে মরীয়া হয়ে "scarcely

conscious of himself and almost without effort, almost mechanically, brought the blunt side on her. He seemed not to use his own strength in this. But as soon as he had brought the axe down, his strength seemed to return to him."

ম্যরসোল কৃত হত্যাকাণ্ডটির পেছনে কোনো সচেতন পরিকল্পনা ছিল না। আরবটিকে হত্যা করে সে খানিকটা পরিবেশের প্রভাবে, প্রায় অচেতন ভাবে। 'Then everything began to reel before my eyes, a fiery gust came from the sea, while the sky cracked in two, from end to end, and a great sheet of flame poured down through the rift. Every nerve in my body was a steel spring, and my grip closed on revolver. The trigger gave, and the smooth underbelly of the butt jogged my palm. And so, with that crisp, whipcrack sound, it all began. I shook off my sweat and the clinging veil of light...I fired four shots more into the inert body..."

হত্যাকাণ্ড সংঘটনে রাসকোলনিকভের ভূমিকা সকর্মক আর ম্যরসোল-এর অকর্মক—দৃশ্য দুটি থেকে দুটি চরিত্রের এই দুটি বৈশিষ্টই ধরা পড়ে। রাস-কোলনিকভ আর ম্যরসোল-এর এই চরিত্রগত পার্থক্যে আবার দস্তয়েভস্কি আর কামুর জীবনদৃষ্টির পার্থক্যই সূচিত।

ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ, লাভ-লোকসানের প্রশ্ন জড়িত থাক আর না থাক রাসকোলনিকভ হত্যা করেছিল সুপরিকল্পিত ভাবে আর তার পেছনে ছিল একটা দার্শনিক তত্ত্ব যাচাই করার প্রেরণা। অবশ্য অর্থের প্রয়োজনও ছিল রাসকোলনিকভের, কিন্তু সেটা গৌণ উদ্দেশ্য—ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্টের কাহিনীর বিকাশের মধ্য দিয়ে তা ক্রমশ পরিস্ফুটও হয়ে ওঠে। রাসকোল-নিকভের এই দার্শনিক হেতুটি তার নিজের জবানবন্দীতেই শোনা যাক :

In short I maintain that all greatmen, or a little out of the ordinary, that is to say, capable of giving some new word, almost from their very nature be criminals—more or less of course.

Otherwise it is hard for them to get out of the common

rut ; and to remain in the common rut is what they can't submit to, from their very nature again, and to my mind they ought not indeed to submit to it.

দস্তয়েভস্কি মনে করতেন মানুষ তার পারিপার্শ্বিক, বা যে সমাজের দ্বারা সে পারিপার্শ্বিক সীমিত তা মেনে নিতে চায় না তাই মানুষ সে সমাজের আইনের সীমা লঙ্ঘন করতে চায়। আইনের সীমা লঙ্ঘনটা হচ্ছে অযৌক্তিক সমাজের (কামুর ভাষায় Absurd) বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ আর প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবাদের নিষ্ফলতাই সে বুঝতে পারে—অনুশোচনা তাড়িত হয়ে তখন তাকে আশ্রয় নিতে হয় ঈশ্বরের ক্রোড়ে।

রাসকোলনিকভ আইনের সীমা লঙ্ঘন করে অতিমানব হতে চেয়েছিল। ম্যরসোল-এর মতো সেও ছিল নিঃসঙ্গ, ভিড় সে এড়িয়ে চলত—কিন্তু তাই বলে সে স্নেহ, প্রেম, করুণা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ বিবর্জিত ছিল না। আগাগোড়াই তার মধ্যে সবলতা ও দুর্বলতা, নির্মমতা ও করুণার একটা দ্বন্দ্ব ছিল। আইনের সীমা লঙ্ঘন করার সঙ্গে সঙ্গে রাসকোলনিকভ শক্তি ফিরে পেয়েছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত করুণাই তার কাল হলো। সোনিয়ার সংস্পর্শে এসে তার চরিত্রের দুর্বলতা ও করুণার দিকটাই প্রবল হয়ে ওঠে। সে ক্রমশ বুঝতে পারে—হত্যা কোনো সমস্যারই সমাধান করেনি, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করেছে যে রাসকোলনিকভের মধ্যে অতিমানবের উপাদান নেই। তখন আসে অনুশোচনা। ঈশ্বরের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করে সে।

দস্তয়েভস্কির এই তত্ত্বের মধ্যে কর্ম আছে, বুদ্ধি এবং যুক্তিরও স্থান আছে! রাসকোলনিকভের প্রতিটি সিদ্ধান্ত বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যাচাই করা। সামাজিক মূল্যবোধও তার মধ্যে একেবারে অস্বীকৃত নয়।

কামু যে ম্যরসোলকে দিয়ে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন, তার পেছনেও আছে একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের তাগিদ। সে তত্ত্বের মধ্যে গূঢ়তর একটা মিলও চোখে না পড়ে পারে না। হয়তো এই কারণেই অস্তিত্ববাদীরা দস্তয়েভস্কিকে পূর্বসূরীর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তবু দস্তয়েভস্কি আর কামু প্রতিপাদিত তত্ত্বে অমিলও যথেষ্ট।

কামুর তত্ত্বে কর্ম নেই, বুদ্ধি ও যুক্তির স্থান অস্বীকৃত, মানবিক মূল্যবোধ উপহসিত। কামু ঈশ্বর মানেন না। তাই মূল্যহীন পৃথিবী থেকে পলায়নের পথ তাঁর নেই—অগত্যা অর্থহীন সমাজকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নেবার পরামর্শ দেন তিনি।

ম্যরসোল চরিত্র তাই নিষ্ক্রিয়। জীবনদর্শন তার একটা আছে কিন্তু তা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয়, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা। তার কাছে সামাজিক মূল্যবোধ অস্বীকৃত।

এই প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্যেই রাসকোল্‌নিকভে অনুশোচনা আছে, ম্যরসোলে নেই।

দস্তয়েভস্কি তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত জীবন থেকে পলায়নের পরামর্শ। কামুর তত্ত্বে বরং এক হিসেবে জীবনের স্বীকৃতি আছে। তবু দস্তয়েভস্কির তুলনায় তা অনেক বেশি অমানুষিক বলে মনে হয়।

ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় সিরিল কোনোলি লিখেছেন, 'দি আউট-সাউডার' নাকি মোটেই মরবিড নয়—কেননা এতে দানব নেই, বলাৎকার নেই, অত্যাচারেরও কোনো নিদর্শন নেই। নেই যে একথা মানতেই হবে। তবু এই রকম একটা ভয়ঙ্কর শূন্যবাদী, জান্তব দৃষ্টিভঙ্গীকে 'মরবিড' ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে তা আমার জানা নেই।

তবে একথা ঠিক, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতবাদ সম্পর্কে যতই আপত্তি করার থাক না কেন—বইটি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবার পথে তা কোনো বাধাসৃষ্টি করে না। কামু গল্প বলতে জানেন, এবং ভালো করেই বলেন।

দি আউটসাইডার কামুর প্রথম বই। তবে এতে দীর্ঘ অনুশীলন ও প্রকরণ সিদ্ধির ছাপটা সুস্পষ্ট। হেমিংওয়ে ধরনের কাটা কাটা বাক্য সাজিয়ে গল্পটি বলেছেন কামু। এটি সচেতন অনুকৃতি। ম্যরসোল-এর জীবনকে দেখার 'বিস্ময়মিশ্রিত ক্লান্তি'র ভঙ্গীটা চমৎকার ফুটেছে এই স্টাইলে। গল্পটি আগা-গোড়া উত্তমপুরুষে বলা। ম্যরসোল চরিত্রের সঙ্গে কামুর এই সচেতন স্টাইলের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে। সহজেই তাই চরিত্রটি পাঠকের মনকে অধিকার করে বসে এবং তার পরিণতি সম্পর্কে পাঠককে কৌতূহলী করে রাখে।

উত্তমপুরুষে গল্প বলতে গেলে লেখককে একেবারে অনুপস্থিত থাকতে হয়—চরিত্রটি সম্পর্কে নিজে তিনি একটি কথাও বলতে পারেন না, চরিত্র বিশ্লেষণের সুযোগও থাকে না এতে। তাই উত্তমপুরুষে বলা গল্পের 'আমি'কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৌণ চরিত্র হয়ে থাকতে হয়—লেখকের অন্যরূপ ইচ্ছা থাকলেও। কামু কিন্তু অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এই টেকনিকের ব্যবহার করেছেন। অল্প কয়েকটি ইঙ্গিতময় কলমের আঁচড়ে অদ্ভুত স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন চরিত্রটিকে।

একটি-দুটি উদাহরণ দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

একেবারে গোড়াকার লাইনটি ধরা যাক :

Mother died today. Or, may be, yesterday ; I can't be sure......

কিংবা

I have fixed up with my employer for two day's leave ; obviously, under the circumstances, he could not refuse. Still I had an idea he looked annoyed and I said without thinking : Sorry, Sir, but its not my fault.

এর পর কি আর লেখককে বক্তৃতা করে বোঝাতে হয় মারসোল লোকটি কেমন ?

মনোযোগী পাঠক আউটসাইডারের পাতায় এমনিধারা অজস্র উদাহরণ পাবেন।

মার্কসবাদ ও ভারতবোধ

'অন্নে সুখ নেই' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সংকলন। নানা সময়ে লেখা মোট বারোটি প্রবন্ধ এই সংকলনে একত্র করা হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে চার ভাগে এই প্রবন্ধগুলিকে ভাগ করা যায়—ইতিহাস, সাহিত্য, ক্রিকেট, ও সাম্প্রতিক রাজনীতি। এর মধ্যে সাহিত্যই প্রাধান্য পেয়েছে। সংকলনে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা ছটি—তার মধ্যে তিনটি আবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে।

নানা বিষয়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করার কৈফিয়ৎ হিসাবে মুখবন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছেন: "আমার মনে ঐ বিবিধ প্রবন্ধে আপাতপ্রভেদ সত্ত্বেও একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে। যদি পাঠকের মন তাতে সায় দেয় তো সুখী হব।"

ঐক্যসূত্র নেই যে তা বলতে পারি না। একই ব্যক্তি যখন একাধিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মনন তাঁর সেই সব রচনায় অবশ্যই প্রতিভাত হয়—এবং তাঁকে নিশ্চয়ই ঐক্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেদিক থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য পাঠক হিসাবে মেনে নিতে পারা যায়, কিন্তু সমালোচকের সমস্যা তাতে মেটে না।

নানা গুণ সন্নিপাতে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতো চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এ যুগে

বিরল। তিনি একাধারে সুপণ্ডিত, অধ্যাপক ও তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক, সুবক্তা এবং সুলেখক। নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল। সাহিত্য থেকে রাজনীতি, ইতিহাস থেকে চিত্রকলা, দর্শন থেকে ক্রিকেট পর্যন্ত নানা বিষয়ে তাঁর অবাধ আনাগোনা। তাঁর সমস্ত ভালোবাসাগুলিকে তিনি যদি এক মলাটের নিচে একত্র করেন তো তার সঙ্গে তাল রাখা আমাদের মতো ক্ষীণজীবী সমালোচক-দের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, অভ্যস্ত চিন্তার গণ্ডির বাইরে তিনি এমন নিঃসংকোচে চলাফেরা করেন এবং নির্দ্বিধায় বিতর্কমূলক প্রতিপাদ্য উপস্থিত করেন যে তার সম্যক আলোচনা এক ছোট নিবন্ধের পরিসরে প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সে চেষ্টা, অতএব, করা হবে না। যদিও ইতিহাস-বিষয়ক অংশে 'ভারতীয় সংহতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি আজকের পরিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় অনেক অনুধাবনযোগ্য কথা বলেছেন এবং যদিও 'ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল' একটি উপাদেয় রচনা—আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে মোটামুটি তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে। এই তিনটি প্রবন্ধ হলো : 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ', 'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব' এবং 'অল্পে সুখ নেই'। প্রথম দুটি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে পরিচয়-এ প্রকাশিত হয়েছে এবং শেষোক্ত প্রবন্ধটি সংকলনটির নাম-প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধ তিনটিতে মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণ, সোভিয়েত-চীন মতভেদকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসে স্তালিন-ব্যক্তিতন্ত্রের নিন্দাপ্রসূত বুদ্ধিজীবীমহলে দ্বিধা ও সংশয় ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ-সব প্রশ্ন আজকের দিনে অনেক বুদ্ধিজীবীকেই আলোড়িত করছে। সুতরাং, তা অবশ্যই বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

দুই

মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের প্রশ্নটি শ্রীমুখোপাধ্যায় খুব জোরালোভাবে উত্থাপন করেন 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' প্রবন্ধটিতে, পরিচয়-এর পৃষ্ঠায়, ১৩৬৮ সনের শারদীয় সংখ্যায়। প্রবন্ধটির উপলক্ষ ছিল শ্রীগোপাল

হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক সংকলনের অন্তর্গত শ্রীসুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার নবজাগরণ' নামক রচনাটি। বিতর্কের বিষয় ছিল, বাঙালী রেনেসাঁসের যা অন্তর্দ্বন্দ্ব, শ্রীসরকারের ভাষায় 'প্রাচ্যাভিমান' ও 'পশ্চিমী দৃষ্টির' দ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথে তা কতটা ছিল বা আদৌ ছিল কিনা।

আজকে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, হীরেনবাবুর প্রবন্ধের বক্তব্য বিশেষ করে তাঁর ভাষার তীব্রতা সেদিন আমাদের অনেককেই বিস্মিত করেছিল। সুশোভনবাবু তাঁর প্রবন্ধে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন তা মোটের উপর মার্কসবাদীমহলে স্বীকৃত ছিল—যদিও 'প্রাচ্যাভিমান' ও 'পশ্চিমী দৃষ্টি' এই দুটি নতুন পদের (term) ব্যবহারে হয়তো বা কিছুটা ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ ঘটেছিল। কিন্তু পরিচয়-এর পরবর্তী সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৬৮) কি অর্থে তিনি ঐ নতুন পদ দুটি ব্যবহার করেছিলেন সুশোভনবাবু তা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং হীরেনবাবুর অন্য আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, হীরেনবাবু সে ব্যাখ্যা বা সে বক্তব্য গ্রহণ করেননি, পরিচয়-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি তিনি একটি কমা-সেমিকোলনও না বদলে, আলোচ্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা হীরেনবাবুর পক্ষে অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল, কেননা সুশোভনবাবুর প্রবন্ধকে উপলক্ষ করে আসলে তিনি মার্কসবাদের ভারতীয়করণ বিষয়ে একটি নতুন তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তাই দেখি পরবর্তীকালে লেখা তাঁর প্রবন্ধসমূহে তিনি বারে বারেই ঘুরে-ফিরে সেই একই বিষয়ে ফিরে এসেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' প্রবন্ধে যে বক্তব্য কিছুটা অসম্পূর্ণ ছিল, 'অল্পে সুখ নেই' এবং তারও পরে লেখা 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' (পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৭০) প্রবন্ধে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে, সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

মার্কসবাদের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই এবং ভারতবর্ষে মার্কসবাদ একটা চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি (decisive force) হিসাবে দেখা দিতে পারবে কি না তা অবশ্য এই প্রশ্নের সমাধানের উপর নির্ভর করছে। মার্কসীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-বাস্তবতা ইত্যাদির অনুশীলনের অপ্রতুলতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা বিষয়ে হীরেনবাবুর তিরস্কারও শিরোধার্য। কিন্তু হীরেনবাবু যখন লেখেন: "মনে পড়ছে রজনীপাম দত্তের কথা যে পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই যখন সমাজবাদের বাস্তব উদ্ভব, তখন ইওরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না

করলেও দেখতাম যে বেদ, :উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত" (রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ), তখন হীরেনবাবুর ভাষাতেই বলতে হয়: "আর্যবাক্য বলেও মানতে পারি না তাঁর কথা।" রজনীপাম দত্তের মত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তিনি কোথায় এ-কথা বলেছেন হীরেনবাবু যদি তার হদিশ দিতেন, কি প্রসঙ্গে এবং কি ভাবে তিনি ও-কথা বলেছেন তা আমাদের খতিয়ে দেখার সুযোগ হতো।

কিন্তু সে যাই হোক, ইতিহাসের কারবার কি হতে পারত তা নিয়ে নয়, কি হয়েছে তাই নিয়ে। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে মার্কসের জন্ম জার্মানিতে এবং কর্মস্থল ইংলণ্ড। ইংলণ্ড ছিল সে সময়ের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ। এই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই মার্কস তাঁর অনেকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বলতে কি, মার্কসবাদ উনিশ শতকের মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য—জর্মান দর্শন, ইংরেজি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও ফরাসী দর্শনের ন্যায়সংগত উত্তরাধিকারী। (It is the legitimate successor to the best that was created by mankind in the nineteenth century in the shape of German philosophy, English political economy and French Socialism.—Lenin : The Three Sources and Three Component Parts of Marxism)। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, পশ্চিমেই যার প্রথম বিকাশ হয়েছিল, তারই এক বিশেষ স্তরে মার্কসবাদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল; মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে। কিন্তু মার্কসবাদ যেহেতু সত্য তাই তা সর্বজনীন। নিউটনীয় গতি-তত্ত্ব (যার প্রয়োগক্ষেত্র হয়তো সীমাবদ্ধ) ইওরোপে বিজ্ঞানের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষে কি আপেল গাছ থেকে মাটিতে না পড়ে শূন্যে উঠে যায়! নানা বিজ্ঞানের যা শ্রেষ্ঠ ফল—আজও পর্যন্ত যা পশ্চিম থেকেই আমদানী হয়ে থাকে—তা ভোগ করতে কেউ তো দ্বিধা করে না। আমাদের বাড়ির অনতিদূরে হিন্দুদের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুদের একটি মঠ আছে। একদিন কানে এল সেখানে এক বক্তা উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করছেন। বক্তৃতা কিন্তু হচ্ছিল 'মাইক' সহযোগেই এবং মঠে বিজলী বাতির সমারোহও কিছু কম ছিল না।

কোনো তত্ত্ব, কোনো বিশ্ববীক্ষা—তা যদি সত্য হয় তবু বিদেশ হতে

আগত বলেই তা বর্জন করতে হবে—এ-মনোভাব নিশ্চয়ই কূপমণ্ডূকতা। আর এ-কূপমণ্ডূকতাকে কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

মার্কসবাদ কতকগুলি আপ্তবাক্যের সমষ্টি নয়, মার্কসবাদ একটি বিশ্ববীক্ষা, একটি পদ্ধতি। মার্কসবাদ কর্মের পথপ্রদর্শক। এবং এই হিসাবেই এই দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণ প্রয়োজন এবং সম্ভব।

সমসমাজের কল্পস্বর্গীয় আদর্শ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করেছে এবং এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে এ-দেশেও নানা সময়ে নানা ভাবে এই আদর্শ আত্মপ্রকাশ করেছে। হীরেনবাবু সঙ্গতভাবেই এর উল্লেখ করেছেন। এবং এই হিসাবে মার্কসবাদ আকাশ-থেকে-পড়া অভিনব কিছু বস্তু নয়। কিন্তু আবার এক হিসাবে মার্কসবাদ সম্পূর্ণ নতুন। সেদিনকার সেই সমসমাজের কল্পনা, বা সমানাধিকারের ধারণা আর আজকের সমানাধিকারের ধারণা এক নয়। সব মানুষই ঈশ্বরের অংশ, বা সব মানুষের মধ্যেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ঐক্য আছে—এই দিক দিয়ে বিচার করলে সব মানুষ সমান—এই ছিল সেকালের সাম্যের ধারণা। খ্রীস্টধর্ম মনে করে সব মানুষই আদি পাপের অংশ নিয়ে জন্মেছে, সেদিক থেকেই তারা সমান। আজকের দিনে সমানাধিকার বলতে আমরা বুঝি মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমানাধিকার। এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে তা না বললেও চলে। হীরেনবাবুর এ-সব কথা জানা নেই—এমন ইঙ্গিত করার মতো ঔদ্ধত্য আমার নেই। কিন্তু তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে সেই অবহিতির উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি বললেও অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী হব। বরং তিনি যখন "কার্ল মার্কসের প্রিয় উদ্ধৃতি"—'Man is the measure of everything'-এর সঙ্গে চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' পংক্তিটির তুলনা করেন তখন উল্টোটাই মনে হয়। কেননা, চণ্ডীদাসের এই মানুষ আসলে দেহ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বলতে চণ্ডীদাস 'সবার উপরে দেহ সত্যই' বুঝিয়েছেন। আজ আমরা পংক্তিটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করি তার মধ্যে অনেক পরিমাণে আমাদের নিজস্ব চিন্তা মেশানো থাকে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বেদ-উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যেও তাঁর আপন মনের মাধুরী অনেকখানি মিশে আছে আর সে মন বহুল পরিমাণে "পাশ্চমী দৃষ্টি" প্রভাবিত। কথাটা হীরেনবাবুর সম্পর্কেও প্রযোজ্য কিন্তু তিনি নিজে এ-সম্পর্কে সচেতন না থাকায় গোলযোগ বেধেছে।

ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর অশ্রদ্ধাশীল উক্তিতে হীরেনবাবু সংগতভাবেই রুষ্ট হয়েছেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় দিকগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, ভারতীয় বস্তুবাদ বিশেষ করে লোকায়তিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে মনে হয় হীরেনবাবু অন্য আর এক চরম মতের দিকে ঝুঁকেছেন। নইলে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতি বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য অভিঘাতের ফল—এ-প্রস্তাবে হীরেনবাবু এত ক্রুদ্ধ হবেন কেন? আর এর মধ্যে "পশ্চিম ইয়োরোপের বদান্যতার" প্রশ্নই বা আসে কী করে? হীরেনবাবু আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে নিজেই তো বলেছেন: "…অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজ এদেশে ইতিহাসের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে, তার এদেশ জয় এবং শাসনের ফলে ইতিহাসের চাকা এগিয়ে চলে নতুন যুগের সম্ভাবনাকে কাছে এনে দিয়েছে;…" (পৃঃ ১২) আর মার্কসও তো ব্রিটিশ শাসনকে 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র' (unconscious tool of history) এবং সেই হিসাবে তার 'পুনরুজ্জীবনশীল ভূমিকার' (regenerating role) কথা বলেছেন।

মার্কসবাদের ভারতীয়করণের উপায় হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ', 'অল্পে সুখ নেই' ও বিশেষ করে 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' প্রবন্ধে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণের যে প্রস্তাব হীরেনবাবু উত্থাপন করেছেন—তা কতটা গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারছি না। পোল্যাণ্ডের মতো ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশে তো বটেই, মোটের উপর যে-কোনো খ্রীস্ট-ধর্মাবলী দেশে জনজীবন যে-ভাবে ধর্ম ও ধর্মসংস্থার সঙ্গে বাঁধা—ভারতবর্ষে তা নয়। ও দেশে ধর্ম রাজনীতিকে যতটা প্রভাবিত করে—এদেশে তা করে না। রেনেসাঁস-রিফরমেশন যেভাবে খ্রীস্টধর্মকে প্রভাবিত করেছে—ভারতবর্ষে তার দৃষ্টান্ত নেই। ওদেশে কৃষক-বিদ্রোহ ও ধর্মসংস্কার-আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে যে-ভাবে একাকার হয়ে গেছে তার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল। এর ফলে ওদেশে ধর্ম-আন্দোলনের অন্য ধরনের একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে—যার সঙ্গে আদর্শের (ideal) দিক থেকে সমাজতন্ত্রের অনেকখানি মিল আছে। এবং ও-সব দেশে ধর্মসংস্থা ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা যে-ভাবে দেখা দিয়েছে—আমাদের দেশে তা দেখা দেয় নি, কোনোদিন দেবে কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ এ-ব্যাপারে যে-ভাবে অগ্রসর হচ্ছে—মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের

সাঙ্গীকরণের জন্য আমাদেরও সে-পথ ধরে চলতে হবে এ প্রস্তাব সহসা মেনে নেওয়া কঠিন।

তিন

'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে হীরেনবাবু সোভিয়েত পার্টির বিংশ কংগ্রেসকে 'কম্যুনিস্ট আত্মসমালোচনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিংশ কংগ্রেসে মুক্তবুদ্ধির যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ-গঠনের সোভিয়েত কর্মকাণ্ডের যে শুভ বিকাশ ঘটেছে, বিশ্বশান্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস যে-ভাবে দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে—তিনি যে তার অকুণ্ঠ সমর্থক —'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব' ও 'অল্পে সুখ নেই' এই দুটি প্রবন্ধেই তার পরিচয় মিলবে। কিন্তু দুটি প্রবন্ধই একটু খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে, হীরেনবাবু যদিও ব্যক্তিতন্ত্রের সমর্থক নন—সোভিয়েত ইউনিয়নে হালে স্তালিনের ভূমিকার যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তাতে তিনি খুশি নন।

বিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রশ্নটি যে-ভাবে আলোচিত হয়েছে তা হয়তো সমালোচনার অতীত নয়। ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও ফল-পরিণাম সম্পর্কে সোভিয়েত বিশ্লেষণ যথেষ্ট দূরপ্রসারী নয়—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো কোনো নেতার এই ধরনের সমালোচনার মধ্যে হয়তো কিছুটা সারবস্তু আছে। শুধু সমালোচনা যথেষ্ট নয়, প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার (institutional reforms) প্রয়োজন—এ দাবিরও হয়তো যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে।

কিন্তু হীরেনবাবুর সমালোচনাটা, মনে হয়, ঠিক ওদিক দিয়ে যায় নি। স্তালিনের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে কিনা—এই প্রশ্নটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মুশকিল হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশ্নটা ঠিক ওভাবে ওঠে নি—স্তালিনের প্রতি সুবিচার-অবিচারের অ্যাকাডেমিক প্রশ্নরূপে আদৌ সমস্যাটা সামনে আসে নি। স্তালিনের মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকেই, সোভিয়েত অর্থনীতি, বিশেষ করে কৃষি-ব্যবস্থা নানা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, সংগঠনে নানারূপ গলদ ধরা পড়েছিল, আমলাতন্ত্র জেঁকে বসছিল সর্বব্যাপী হয়ে। স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত নেতারা জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা

খুলে বলার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে এক রিপোর্টে কিছু না রেখে-ঢেকে কৃষি-সংকটের কথা খোলাখুলি জনসাধারণকে জানান হয়। এই রিপোর্টের মূল বক্তব্য, গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা যদিও তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জানত—তবু নেতৃত্বের তরফ থেকে তার সরাসরি স্বীকৃতিতে দেশের মধ্যে ঘোরতর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অসংখ্য সমস্যা যার সঙ্গে ঘর করা ভবিতব্য বলে মনে করে লোক হাল ছেড়ে বসেছিল তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা সর্বস্তরে শুরু হয়। লোকে প্রশ্ন করতে থাকে এই সব সমস্যা এতকাল জমে থাকল কী করে। এমন সব গুরুতর ভ্রান্তি সম্ভব হল কী করে। যাদের এ-সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কথা ছিল তারা কি করছিলেন। আর শুধু কৃষিই তো নয়, শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নানা গলদ ধরা পড়তে লাগল। সোভিয়েত নেতারা এই সব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে একটু একটু করে আবিষ্কার করতে লাগলেন—স্তালিন, যাকে এতকাল অভ্রান্ত বলে ভাবা হয়েছে, তাঁর নীতিতে গুরুতর ভুলভ্রান্তি ছিল। ব্যক্তিতন্ত্রের আবহাওয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সমাজবাদী আইনের শাসনের ক্ষেত্রেও গুরুতর গলদ ধরা পড়তে লাগল। দেখা গেল ১৯৪৮ সালের তথাকথিত 'লেনিনগ্রাদের ঘটনা' যাতে দুজন শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েত নেতা ভজ্‌নেসেনস্কি ও লজেভস্কি দণ্ডিত হন—তা একেবারে সাজানো ঘটনা। এমনিভাবে স্তালিনের নানা অপকর্ম একটু একটু করে ধরা পড়তে থাকে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী যা হয়তো কারো কারো জানা ছিল, তার একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই হল বিংশ কংগ্রেসের পটভূমিকা—স্তালিন-ব্যক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প সংগ্রাম শুরু হয় এই পটভূমিকাতেই। ইতালির কমিউনিস্ট দৈনিক 'লুনিতা'-র বৈদেশিক বিভাগের সম্পাদক গিসেপি বোফ্‌ফা যিনি বিংশ কংগ্রেসের কিছু আগে থেকে একবিংশ কংগ্রেস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থান করেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা 'ইনসাইড দ ক্রুশ্চভ এরা' গ্রন্থে এই পটভূমিকার সুন্দর ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠকেরা তা পড়ে দেখতে পারেন।

আমরা, যারা ব্যক্তিতন্ত্রের অনাচার থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছি তাদের পক্ষে স্তালিনের প্রতি কতটা সুবিচার করা হয়েছে আর কতটা অবিচার করা হয়েছে তুলাদণ্ড দিয়ে তার পরিমাপ করা যত সহজ আগুনের আঁচ

যাদের গায়ে লেগেছে তাদের পক্ষে তা ততটা হয়তো সহজ নয়। তা ছাড়া কালের সান্নিধ্যও বিষয়মুখ মূল্যায়নের অন্তরায় হতে পারে।

স্তালিনের ভূমিকার সাম্প্রতিক মূল্যায়নে কিছু আতিশয্য আছে কিনা সোভিয়েত মহাফেজখানার সাহায্য ব্যতিরেকে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন কিন্তু এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় সোভিয়েত মূল্যায়নে স্তালিনের চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলি উপেক্ষিত হয়নি। বিংশ কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ১৯৫৭ সালে ক্রুশ্চভ এক ভাষণে বলেছিলেন: "We see two sides to Comrade Stalin's activities: the positive side, which we support aud value highly and the negative side which we criticise, condemn and repudiate…" এই উদ্ধৃতিটি আমি আহরণ করেছি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নবলিখিত ইতিহাসের সংশোধিত সংস্করণ থেকেই। হীরেনবাবু তার ১৯৫৯ সালে লেখা প্রবন্ধ 'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব'-তে নিজেই বলেছেন, ''সোভিয়েত বিশ্বকোষে সম্প্রতি স্টালিন সম্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছে, তাতেও পূর্বেকার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনি তাকে হেয় না করে তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিভা ও অবিস্মরণীয় অবদানের বাস্তব বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে।'' (অল্পে সুখ নেই—পৃঃ ৪৫)। আবার দ্বাবিংশ কংগ্রেসেরও পর ১৯৬২-৬৩ সালে সোভিয়েতের শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভায় ক্রুশ্চভ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও স্তালিন চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলির দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি আছে।

সুতরাং, কি করে মেনে নেওয়া যায় হীরেনবাবুর এই উক্তি "স্টালিন যুগের শেষার্ধ সম্বন্ধে বক্তব্যের মধ্যে মাত্রাজ্ঞান থাকে না?" এবং না জিজ্ঞাসা করেই বা পারা যায় কি করে "অর্ধসত্যের ছড়াছড়ি''-টা হীরেনবাবু কোথায় দেখলেন?

হীরেনবাবু যখন লেখেন, "তথ্যকে অভিপ্রায়ানুযায়ী বিকৃত করা হয়েছে, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে পর্যন্ত শুধু উপেক্ষা নয়, অস্বীকার করা হয়েছে," তখনও না বলে পারা যায় না—সত্যের সঙ্গে এই অভিযোগ ঠিক সংগতিপূর্ণ নয়। আর ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে বলতেই হয়—এর সূচনা হয়েছিল স্তালিন আমলেই এবং স্তালিন যুগে তা অব্যাহতভাবে চলেছে। বরং সম্প্রতিকালেই তা সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে। চল্লিশ বছরের অভ্যাস দু-চার বছরে সংশোধন করা দুরূহ—তাই তার জের এখনও কিছু কিছু আছে। কিন্তু কি করে ভুলি তা স্তালিন আমলেরই জের?

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতারা স্তালিনের অপকর্মের কতটা শরিক ছিলেন হীরেনবাবু সংগতভাবেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। 'গিল্ট বাই অ্যাসোসিয়েশন' বা সঙ্গদোষের পাপ তাদের উপর নিশ্চয়ই কিছুটা বর্তায়। এবং সে আমলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা, যেমন, মলোটভ, কাগানোভিচ, ম্যালেনকভ—এবং বেরিয়া তো বটেই—যে এই ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত ছিলেন না তা তো দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ভুরি ভুরি তথ্য সহযোগে প্রমাণও করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে ক্রুশ্চভ-মিকোয়ান প্রমুখ কি দোষমুক্ত ছিলেন? তারা কি কিছু জানতেন না? যদি জানতেন তো স্তালিনের আমলে তাঁরা মুখ খোলেননি কেন? ১৯৬২-৬৩ সালে ক্রুশ্চভ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, গ্রেপ্তার ইত্যাদির ঘটনা তারা জানতেন না তা নয়—তবে তারা জানতেন না নির্দোষ লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

ক্রুশ্চভের এই উক্তি মিথ্যা বলে প্রমাণ করার মতো কোনো দলিল আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

হীরেনবাবু প্রশ্ন তুলেছেন আইন লঙ্ঘনের এই সব ঘটনা নিবার্য ছিল, না, অনিবার্য ছিল। জন্ম থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে উৎখাত করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছিল, ভিতর থেকে শিশু সোভিয়েতের পতন ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছিল, কোনো কোনো বীরপুঙ্গব সদম্ভে ঘোষণা করছিল ডিম ফুটবার আগেই বলশেভিক মুরগীর ছানাদের পিষে মারতে হবে এবং হিটলারি পঞ্চমবাহিনীর অস্তিত্বও কোনো কল্প-কাহিনী নয়—আর তা নয় বলেই কিছু কঠোরতা অনিবার্য ছিল। প্রতিবিপ্লব নখদন্তহীন নয় এবং নখদন্ত ব্যবহারে সে কার্পণ্য করে না বলেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সংজ্ঞা অনুসারেই শত্রুদের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ও মিত্রদের জন্য গণতন্ত্র। স্তালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে-অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য তা তিনি মিত্রদের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করেছেন নির্বিচারে। জরুরী অবস্থা বিদ্যমান ছিল বলেই এই অনাচার দীর্ঘদিন ধরে চলতে পেরেছে—কিন্তু তাতে অনাচার কখনও সদাচার হয়ে যায় না। চীনা আক্রমণের ফলে আমাদের দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে গণতন্ত্রের কিছুটা সংকোচন অনিবার্য ছিল কিন্তু সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শাসক সম্প্রদায় যখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বিচারে কারারুদ্ধ করেছে তাকে কি আমরা সংগত কাজ বলে মনে করেছি? না কি তা অনিবার্য ছিল?

তা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে যে জরুরী অবস্থার কথা হীরেনবাবু বলেছেন তা কি লেনিনের মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয়েছে না আগেও বিদ্যমান ছিল? ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধ চলছিল, যখন সমস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নে সশস্ত্র হস্তক্ষেপে প্রবৃত্ত—অবস্থা কি তখন কিছু কম বিপজ্জনক ছিল? কই লেনিন তো তখন রাজনৈতিক বিরুদ্ধ-বাদীদের কোতল করা প্রয়োজন মনে করেননি! সমাজবাদী আইন লঙ্ঘনের এই ধরনের দৃষ্টান্ত তো তখনকার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না!

এক সময় ছিল যখন সোভিয়েতের নিষ্কলঙ্ক শুভ্র খ্যাতিতে বিন্দুমাত্র কালির দাগ লাগাতে পারে খবরের কাগজে এমনি ধরনের কোনো খবর বের হলে এক কথায় তাকে বুর্জোয়া প্রোপাগাণ্ডা বলে নাকচ করে দেওয়া হতো। এখন আবার উল্টো আর এক ঝোঁক দেখা যায়—খবরের কাগজে যা কিছু বেরোয় তাকেই ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেওয়া। হীরেনবাবুর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেও এই শেষোক্ত ঝোঁক দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলাম।

যেমন ধরা যাক "মার্শাল জুকভের কল্যাণে…ক্রুশ্চভ তাঁর বিরোধী নেতাদের ঘায়েল" করেছিলেন এই ডয়েশ্চার-প্রচারিত গল্পটি তিনি বিশ্বাস করে অভিযোগ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর "অবিস্মরণীয় অবদানের" কোনো স্বীকৃতি নাকি লালফৌজ সংক্রান্ত পুস্তিকায় নেই। লালফৌজ সংক্রান্ত হীরেনবাবু কথিত পুস্তিকাটি দেখিনি কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সংশোধিত সংস্করণে জুকভের নাম আছে।

কিংবা ধরা যাক, বিংশ কংগ্রেসের গোপন অধিবেশন প্রদত্ত তথাকথিত ক্রুশ্চভ রিপোর্টের কথা। এই রিপোর্টের কোনো সরকারি ভাষ্য প্রচারিত হয়নি। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' প্রচারিত বিবরণটি কতদূর প্রামাণ্য যাচাই করার উপায় নেই। কিন্তু তবু হীরেনবাবু লেখেন "মোটামুটিভাবে ঐ বিবরণকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।" (পৃঃ ৪৫) অথচ পরবর্তীকালে সোভিয়েত থেকে ব্যক্তিতন্ত্র সম্পর্কে যে-সব দলিল প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, দ্বাবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চভের রিপোর্ট, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ক্রুশ্চভের ভাষণ ইত্যাদির সঙ্গে ঐ বিবরণের বড়ো রকমের অনেক গরমিল ধরা পড়ে।

খবরের কাগজের উপর হীরেনবাবুর এই আস্থা আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে অল্প কিছুকাল আগেই বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে হীরেনবাবুর বক্তৃতার বিকৃত বিবরণ সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার করে তাঁর বিরুদ্ধে রীতিমতো একটা গণ-হিস্টিরিয়া সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল।

কিন্তু হীরেনবাবুর মতামত যতই বিতর্কমূলক হোক, তাঁর বই যে চিন্তার খোরাক জোগায় তাতে সন্দেহ নেই।

হীরেন্দ্রনাথের ভারতবোধ

প্রায় এক দশক আগে 'অল্পে সুখ নেই' নামে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, এক হিসেবে বলা যেতে পারে 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি' তারই জের; সময়ের দিক থেকে তো বটেই, বক্তব্যের দিক থেকেও বটে। 'অল্পে সুখ নেই' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, পরবর্তী প্রায় আর-এক দশকের চিন্তার ফসল সমাহৃত হয়েছে 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'তে। জের বলছি শুধু সে-কারণেই নয়। 'অল্পে সুখ নেই' সংকলনের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' শীর্ষক রচনায় মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের যে প্রশ্নটি অত্যন্ত জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ, 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'তে নাম-প্রবন্ধ ছাড়াও একাধিক প্রবন্ধে তারই জের টেনেছেন তিনি। তবে এই সব প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যকে আরও একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও, নানা সময়ে লেখা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে তাঁর এই প্রস্তাব, যাকে প্রায় একটা নতুন তত্ত্বই বলা যায়, পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এ-জন্যে প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার এবং হীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ পাণ্ডিত্যের অধিকারী তাতে এ-কাজ তিনি অনায়াসেই করতে পারেন। আশা করব, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুপরিণত মননের সেই ফসল আমাদের সকল সংশয়ের অবসান ঘটাবে।

আপাতত অবশ্য ভয়ে ভয়ে একটা কথা না বলে পারছি না, মার্কসবাদের ভারতীয়করণের প্রস্তাবটা হীরেন্দ্রনাথ যেভাবে উত্থাপন করেন তাতে এই সমালোচকের মনে নানা সংশয় দেখা দেয়। কথায় আছে চুন খেয়ে মুখ তাতলে দই দেখে ভয় হয়। মার্কসবাদের চীনাকরণের যে-পরিণাম আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি তাতে এ ধরনের কথা শুনলেই গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু সংশয় শুধু সে-কারণেই নয়। মার্কসবাদের ভারতীয়করণের প্রকরণ হিসেবে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণের যে-প্রস্তাব তিনি করেন তাতে মন সায় দিতে অনিচ্ছুক হয়। ধর্ম সম্পর্কে এ-সমালোচকের অনীহা মজ্জাগত। কিন্তু এটা কোনো ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচির প্রশ্ন নয়। আসল কথা হলো ইতালি কি পোল্যাণ্ডের মতো ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশে জনজীবন যেভাবে ধর্ম এবং ধর্মসংস্থার সঙ্গে বাঁধা, ভারতে তা নয়। ওসব দেশে কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ধর্ম যেভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করে, এদেশে তা করে না। অতএব ওসব দেশে ধর্মসংস্থা ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা যেভাবে দেখা দিয়েছে, আমাদের দেশে তা দেখা দেয় নি, কোনোদিন দেবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। সুতরাং, ওসব দেশ এ-ব্যাপারে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, মার্কসবাদ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের জন্য আমাদেরও সে-পথ ধরে চলতে হবে এ-প্রস্তাব সহসা মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়বে।

তবে, একথা অবশ্য স্বীকার্য, মার্কসবাদের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতবর্ষে মার্কসবাদ একটা চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি হিসেবে দেখা দিতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরই তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে। বিতর্ক তা নিয়ে নয়—ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে আমরা কি বুঝি এবং তার কতটুকু এবং কোন অংশ গ্রহণযোগ্য—যত বিতর্ক তা নিয়েই। আর এ-বিতর্ক নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে চলবে এবং চলা উচিত। ভারতের মতো বিশাল দেশের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন এক নিমেষে সমাধান হয়ে যাবে এমন অর্বাচীন আশা নিশ্চয়ই কেউ পোষণ করে না।

'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'তে হীরেন্দ্রনাথ যে-বক্তব্য উপস্থিত করেন তারই আরও একটু বিশদ অনুসৃতি 'ভারতবর্ষ ও মানবিকতা' প্রবন্ধটি। স্বভাবতই এ-প্রবন্ধের অনেক প্রতিপাদ্যের সঙ্গেও অনেকেই হয়তো দ্বিমত হবেন। বিশেষ করে মানবতাবাদ (humanitarianism) এবং মানবিকতাবাদকে (huma-

nism) তিনি যেভাবে একাকার করে ফেলেন তাতে কজন সায় দিতে পারবেন জানি না। হীরেন্দ্রনাথ নিজেই যে এ-ব্যাপারে সংশয়মুক্ত তা নন। তিনি লেখেনও, "আর কেউ কেউ শাসাবেন যে পরোপচিকীর্ষা মানবিকতার সঙ্গে সমার্থক নয় পরদুঃখে বিগলিতহৃদয় মহানুভবতার সঙ্গে মানবিকতার প্রভূত প্রভেদ আছে। সংজ্ঞার বিচার করতে গেলে অবশ্যই সে-প্রভেদ আছে" (পৃ ২৬)। আবার তারপরে ঐ একই বাক্যে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই লেখেন, "কিন্তু দুর্গতের আর্তি দূর করার কামনার সঙ্গে মানবিকতা সম্পর্কশূন্য নয়। কাকতালীয় ন্যায়ের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মানবিকতা ও মানবদুঃখে বিচলিতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকলেও নিকট সম্পর্ক আছে।" এবং শেষ পর্যন্ত যেভাবে যুক্তি ও তথ্য হাজির করেন তাতে দুয়ের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। চণ্ডীদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য" পংক্তিটির পরবর্তীকালের মনের মাধুরী মেশানো যে-ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করেন, তাও বৈজ্ঞানিক বিচারে টিকবে কিনা সন্দেহ। তবে তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে একমত যদি না-ও হই তাহলেও এটা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর অনেক যুক্তি সহসা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, ধীরস্থিরভাবেই তার বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

এই পর্যায়ের তৃতীয় রচনা 'ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম'-এর সঙ্গে, বলতে স্বস্তি পাই, অনেক বিষয়েই একমত হতে পারি। বলতে কি এই রচনাটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না হলে হীরেন্দ্রনাথের প্রতি অবিচারের সুযোগ থেকে যেত।

এই সংকলনে রচনার সংখ্যা উনিশটি। লেখকের ভাষায় "বহু বিষয়ের উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে ঘটেছে।" এর মধ্যে দুটি হল অত্যন্ত সুলিখিত এবং তথ্যবহুল ভ্রমণকাহিনী—'মোঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে' এবং 'দেশে দেশে বান্ধব'। দুটি—'দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' এবং 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'—১৯৬৮ সালের চেকোস্লোভাক সংকট সম্পর্কে।

চেকোস্লোভাক সংকটের সময় পশ্চিমবাঙলার কিছু বুদ্ধিজীবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সংবাদপত্রে যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন এই প্রবন্ধদুটিতে হীরেন্দ্রনাথ তীব্র আবেগবিদ্ধ অথচ ব্যক্তিগত বিদ্বেষহীন সংযত ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: "বাঙলাদেশে কয়েকজন ইতিহাসের অধ্যাপক বিক্ষুব্ধ বিবৃতি দিয়েছেন—তাদের স্মরণ করতে হবে বিপ্লবের মূল্য দিতে হয় প্রচণ্ড, বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার জন্যও মূল্য কম দিতে হয় না, এবং বারবার

বিপ্লব কিভাবে বিপন্ন হয়েছে বিপথে গেছে তা জেনে আজ চেকোশ্লোভাকিয়ার কিয়ৎসংখ্যক বিদগ্ধ জনের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সমগ্র সোশালিস্ট ব্যবস্থাকে নিদারুণ সঙ্কটে ফেলে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে বলা অনুচিত, অন্যায় প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অপরাধ" (পৃ ১৪৪)। দুটি প্রবন্ধই হয়তো কিছু পরিমাণে কালচিহ্নিত, তবু সংকলনে এ-দুটির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন ছিল। কেননা, চেকোস্লোভাক সংকট এমন একটি ঘটনা যার শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া কোনোমতেই চলে না। এবং এই ঘটনার সুগভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখনও অবসিত হয়নি।

'জওয়াহরলালজী নেহরু' ও 'গান্ধীজী' শীর্ষক রচনা দুটিতে হীরেন্দ্রনাথ দুই শীর্ষস্থানীয় জাতীয় নেতার চারিত্র্য এবং ভূমিকার সশ্রদ্ধ অথচ অবিমুগ্ধ মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষ করে 'জওয়াহরলালজী নেহরু' রচনাটি প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চারিত্র্যবিচারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নেহরুজীর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সে-কারণেই, নেহরুজীর ব্যক্তিত্বের দুর্বলতার দিকটাও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি লেখেন, "ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামে জওয়াহরলালের ভূমিকা ইতিহাসে কীর্তিত হতে থাকবে। স্বাধীন ভারতের কর্ণধাররূপে দেশ গঠন ও বিশ্বশান্তি স্থাপনে তাঁর প্রয়াসের বিবরণও ইতিহাস সহজে বিস্মৃত হবে না। কিন্তু নিছক রাজনীতির বিচারে শুধু স্তুতিই তাঁর প্রাপ্য নয়। বহু কঠিন ও কঠোর সমস্যা অপূর্ণ রেখে তিনি চলে গেছেন। অতি-মানবিক শক্তির অধিকারী হয়েও অতি-মনবিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি ব্যবহারে তিনি অপারগ ছিলেন। হয়তো এ-জন্যই তিনি কখনও বিপ্লবী ভূমিকায় নামতে পারেন নি, দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বনেও স্বীকৃত হতে পরেননি। সংসারে রুচি ও প্রগতির মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য যতদিন না ঘটে, ততদিন হয়তো তাঁর মতো ব্যক্তির জীবনে ও কীর্তিতে কিছু পরিমাণে ব্যর্থতা না থেকে পারে না।" (পৃ ১৩৬)

'যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা' ভিয়েতনামীদের অসমসাহসিক লড়াইয়ের প্রাণবন্ত বিবরণ। 'জয় হোক' এবং 'বাঙলাদেশ: তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' রচনা দুটিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়েছেন লেখক।

কী যুক্তি বিস্তারে কী তথ্য সমাবেশে এই সংকলনের সবচেয়ে উল্লেখ্য প্রবন্ধ

সম্ভবত 'মার্কস-এর কালজয়ী শিক্ষা' এবং 'সোভিয়েট বিপ্লব ও আমরা'।

নানা সময়ে লেখা নানা বিচ্ছিন্ন রচনাকে একত্রে গ্রথিত করার একটা বিপদ আছে—তাতে অনেক সময়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটে। এ-সংকলনও সেই ত্রুটিমুক্ত নয়। তাছাড়া একদশক একটা দীর্ঘসময়—এর মধ্যে মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। তার ফলে আগেকার রচনার সঙ্গে পরেকার রচনার চিন্তাধারার কিছু অসংগতিও দেখা দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর একটা উপযোগিতাও আছে—একজন মানুষকে তার বিকাশের ধারায় পাওয়া যায় এর মধ্য দিয়ে। সেটা উপরি পাওনা।

হীরেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ-সংকলনের উনিশটি রচনার মধ্যে কোন-কোনটির সঙ্গে একমত হতে পারলাম আর কোন-কোনটির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না—এটা বড় কথা নয়। দোষ গুণতে গেলে গুণ খুঁজে পাওয়া ভার হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই সংকলনে পাই ব্যক্তিমানুষ হীরেন্দ্রনাথকে, "ভারতবর্ষের ভূমিতে একান্তভাবে প্রোথিত যার সত্তা" এবং জানতে পারি "তার পক্ষে মার্কস-বাদ কেমন করে 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দ'-এর ভিত্তিস্থল হতে পারে, 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' মন্ত্রের সার্থকতম অস্ত্ররূপে উপলব্ধ হতে পারে।" এই পাওনা কি কম?

'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি'র অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু রাজনীতি, কিন্তু প্রত্যেকটি রচনাই সাহিত্য হিসাবে পাঠ্য। হীরেন্দ্রনাথ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, সুপণ্ডিত অধ্যাপক, প্রবীণ রাষ্ট্রনেতা; কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্যই তাঁর স্বস্থান।

হালের কথাসাহিত্য

অবশেষে বাঙলা কথাসাহিত্যে সত্যিই কি ঋতু বদলের পালা এল, যেমন এসেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে? বাঙলা কবিতা সেদিন যেমন চেনার-অতীত বদলে গিয়েছিল, বাঙলা কথা-সাহিত্য কি তেমনি কোনো গুণগত রূপান্তরের মুখোমুখি? যার ফলে পুরনো লেখকেরাই শুধু নন, বাতিল হবে 'পুরনো' রীতিও?

ভালো-মন্দ-মাঝারি সব রকমের গল্প-উপন্যাসই অবশ্য বাঙলা ভাষায় অজস্র লেখা হচ্ছে। তার মধ্যে দু-একটিতে বেশ-খানিকটা নতুনত্বেরও স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, অন্তত রীতির দিক থেকে, স্বীকার করতেই হয়। তবু, প্রশ্নটার ইতিবাচক উত্তর দেবার সময় এখনও এসেছে বলে মনে হয় না।

গত কয়েক বছরে নতুন লেখক অনেকে অবশ্য এসেছেন। তাঁদের কারো কারো মধ্যে শক্তিমত্তারও পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই তা এখনও প্রতিশ্রুতি মাত্র, পরিপূর্তি নয়। তাই পুরনোরা বাতিল হয়ে গেছেন, কথাটার মধ্যে উষ্মা থাকতে পারে, সত্য নেই।

নতুন নতুন লেখকের আবির্ভাব হবে, জীবনকে তাঁরা একটু নতুন চোখে দেখবেন, অন্তত দেখবার চেষ্টা করবেন, তাঁদের সজীব মনের স্পর্শে সাহিত্যে কিছুটা নতুনত্বের স্বাদ লাগবে। সাহিত্যের মূল ধারাটি এইভাবে পুষ্ট হবে,

প্রসারিত হবে, প্রবাহিত হবে কাল থেকে কালান্তরে—যে-কোনো প্রাণবান সাহিত্যের এইটেই লক্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, শরৎচন্দ্র এসেছেন, তারপর প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ এসেছেন, তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণ এসেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত তাঁদের অনেকেরই শক্তি আজও অবসিত হয়নি। তাঁদের পরিণত প্রতিভার দানে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে আশা করা যেতে পারে, অন্তত আশা হারাবার কারণ ঘটেনি।

কিন্তু তাই বলে বাঙলাসাহিত্য এখানেই থেমে থাকেনি—মন্দিরে এসেছে নতুন ভক্তের দল। 'ফসিল' গল্প নিয়ে সুবোধ ঘোষের দীপ্তিমান আবির্ভাব ঘটেছে, এসেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু প্রভৃতি আরও অনেকে। এদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক শক্তিমান লেখকেরই তা থাকে। গল্প বলার ভঙ্গীতে কিছু নতুনত্ব এসেছে, নতুন বিষয় এসেছে, জীবনের অনেক অনাবিষ্কৃত দিকের উপর তাঁরা আলো ফেলেছেন। নতুন দৃশ্য নয় শুধু, নতুন দৃষ্টিও এসেছে তাঁদের সঙ্গে। সাহিত্য এগিয়েছে, নবায়িত হয়েছে।

তাই বলে পূর্ববর্তীরা বাতিল হননি। প্রবীণ তারাশঙ্কর এই সেদিনও 'সপ্তপদীর' মতো সার্থক গল্প লিখেছেন। কয়েক বছর আগে তখনই প্রায়-প্রবীণ প্রেমেন্দ্র মিত্র নতুন রীতির যে চমক এনেছিলেন তেলেনী পোতা আবিষ্কার-এ তা আজও অনুকরণীয়। সাহিত্যের অগ্রগতি ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়, অঙ্গীকার করে।

তাই বলে সাহিত্যে শুধু ক্রমবির্বতনই আছে, আবর্তন নেই—এমন কথা বলা হচ্ছে না। এমন এক-একটা সময় নিশ্চয়ই আসে যখন সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন পথে বাঁক নেয়। ইওরোপীয় রেনেসাঁস সাহিত্যের চেহারা বদলে দিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব সাহিত্যে স্থায়ী চিহ্নপাত করে গেছে। এটা স্বভাবিক।

সাহিত্য মানসকুসুম। মানুষের মনোজগতে যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে, মূল্যবোধ বদলে যায়—সাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় তখনই। নতুন বক্তব্য নতুন রীতি দাবি করে, নতুন রীতির জন্ম হয়, উদ্ভব হয় নতুন আর্ট ফর্মের। রেনেসাঁস পরবর্তীকালে যখন ব্যক্তিমানুষ স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন আর্ট ফর্ম হিসেবে তখনই উপন্যাসের জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের

পরবর্তীকালে কবিতার ক্ষেত্রে যে ঋতুবদলের সূচনা হয়েছিল তারও একটা বাস্তব কারণ ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উনিশ শ ষাট সালের এপ্রিল-মে মাসে বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে এমন কি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল যে ধরে নিতে হবে সাহিত্য এখন থেকে নতুন খাতে প্রবাহিত হবে, পুরনো খাতে জল যাবে শুকিয়ে, শুধু জেগে থাকবে বালুর ঝিকিমিকি ?

সাদা চোখে এমন কোনো কারণ তো ধরা পড়ছে না, এমন কোনো মূল্য-বোধের প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে না সাহিত্যে যা আনকোরা নতুন। পিঠেটা কেমন, খেলে তবে তা বোঝা যায়—এই ঔদারিক প্রবচনটা যদি সত্য হয় তাহলে বলতেই হবে, বাঙলা সাহিত্যের জলবায়ু রাতরাতি বদলে গেছে এমন কথা বলবার মতো কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই। তবু কোনো কোনো মহলে কথাটা উঠেছে আর উঠেছে যখন তখন তা খতিয়ে দেখতে দোষ কি।

নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্য চল্‌ছে। তা নিশ্চয়ই কৌতূহলের সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ্যণীয়। কিন্তু পরীক্ষা মানেই সাফল্য নয়, মনে রাখা দরকার।

তা ছাড়া, যে রীতিটি নিয়ে কোনো কোনো মহলে মাত্রাতিরিক্ত রকমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হচ্ছে, আসলে তা তত নতুনও নয়। রীতি হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যে "চেতনা-প্রবাহের" (stream of consciousness) আভাস দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে, হেনরী জেমস-এর অন্তর্মুখীন রচনাধারায়। তখন অবশ্য কোনো কোনো মহলে এমন কথা উঠেছিল—নভেল কি হবে, কি হওয়া উচিত, জেমস তার শেষ কথা বলে দিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত রীতিই "শ্রেষ্ঠ এবং নতুনতম"। কিন্তু পরবর্তীকালে সমালোচকেরা মত পাল্টেছেন। এডউইন ময়ার (Edwin Muir) লিখেছেন, (The Jamesian novel is not a resumption or a fulfilment of the previous tradition, or an improvement on it, but a minor offshoot.) জেমসীয় নভেল পূর্বতন ঐতিহ্যের অনুবর্তন বা পরিপূর্তি নয়, সম্প্রসারণও নয়, গৌণ একটি প্রশাখা মাত্র।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে জেমস জয়েস্‌ এবং ভার্জিনিয়া উল্‌ফ চেতনা-প্রবাহ এবং স্বগতভাষণ (internal monologue) রীতির চর্চা করেছিলেন। তখন তা নিয়ে হৈ চৈ-ও কম হয়নি। উত্তেজনা এমন হয়েছিল যে শ্রীমতী

উল্‌ফের মতো স্থিতধী সমালোচক ও বেনেট-ওয়েলস-গলসওয়ার্দিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। এরা তিনজনই হয়তো মাঝারী লেখক। কিন্তু শ্রীমতী উল্‌ফের আপত্তির কারণ ছিল প্রধানত রীতিগত। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে ওয়েলস্‌-বেনেট প্রমুখ তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে অনুসরণ করেননি, তাঁরা সেই স্বৈরাচারি দৈত্যটার শাসন মেনে নিয়েছেন যার দাবি প্লট চাই, ট্রাজেডি বা কমেডি চাই, চরিত্রগুলি বিশ্বাসযোগ্য এবং জীবন্ত হওয়া চাই। আর তা মেনে নিয়েছেন বলেই তাঁরা জীবন থেকে সরে এসেছেন। কেননা, Life is not a series of giglamps symmetrically arranged, life is a luminous halo, a semitransparent envelope surrounding us from the begining of consciousness to the end. কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাইরে থেকে ভেতরে চোখ ফিরিয়ে শুধু অর্ধ-স্বচ্ছ চেতনা প্রবাহকে ধরতে গেলে সমাজকে ধরা যায় যায় না, উজ্জ্বল স্মৃতিপুঞ্জের ভিড়ে ব্যক্তিও হারিয়ে যায়। চৈতন্য মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র আর অংশ যে সমগ্রের সমান নয় তাতো জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ। চেতনাপ্রবাহ বা স্বগত ভাষণ রীতির সীমাবদ্ধতা এইখানেই—সমগ্র বাস্তবতাকে ধারণ করবার শক্তি তার নেই। আর তাই তা ধ্রুপদী রীতিকে খারিজ করতে পারেনি—যদিও হয়তো কিছু পরিমাণে তাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই জয়েস-উলফ্‌ জন্মাবার পরও ইংরেজি নভেল সেই "পুরনো" রীতিতেই লেখা হচ্ছে। খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক প্রিস্টলি তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ, 'লিটারেচার অ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ন ম্যান'-এ জোরের সঙ্গে বলেছেন, আধুনিক উপন্যাসের ধারাকে জয়েস কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেননি। তিনি নভেলের ধারা বদলে দিয়েছেন, পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের পথ প্রশস্ত করেছেন—এটা একেবারেই বাজে কথা।

কথ- ছাড়া, বাঙলা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই রীতি প্রয়োগ নতুন নয়। রি নাথের 'ঘরে-বাইরে'তেই এই রীতির পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। এর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃশীলা প্রভৃতি ত্রয়ী উপন্যাসে, গোপাল হালদারের 'একদা' এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরীতে' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই রীতির একটি পরিণত রূপ। বাঙলা সাহিত্যে এই বই ক'খানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে "পুরনো" ধারায় উপন্যাস লেখা বন্ধ হয়ে যায়নি। তারাশঙ্কর-মানিকের সার্থক উপন্যাসগুলি বরং তথাকথিত "পুরনো" রীতিতেই লেখা। আর মানুষের মনের জটিল

অলিগলিতে মানিক যত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেছেন আর কেউ তা করতে পেরেছেন বলে জানি না।

বাঙলা গল্প-সাহিত্যে সত্যি যদি কোনো সংকট দেখা দিয়ে থাকে তবে তা এই কারণে নয় যে রীতিটা পুরনো। সাহিত্য প্যারিসীয়ান বিলাসীনীর হ্যাট নয় যে সপ্তাহে সপ্তাহে তার ডিজাইন না পাল্টালে মাথা কাটা যাবে। আসলে ঘাটতি দেখা দিয়েছে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার তার অভাব দেখা যাচ্ছে। তরীর তলার বাঁধন যেখানে আল্‌গা সেখানে হাত না লাগিয়ে নায়ের পৈঠায় বিচিত্র রঙের নক্সা এঁকে কী হবে!

লেখকের বলবার মতো কথা যদি থাকে, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যদি সমৃদ্ধ হয়, আর লেখবার কলম যদি না হয় শক্তিহীন—তবে যে রীতিতেই তিনি লিখুন তা প্রাণের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠবে। নতুন কিছু করতেই হবে সাহিত্যের পক্ষে এটা সব সময় সুস্থ আদর্শ নয়। নতুন কিছু করার জন্যই যে বই লেখা হয়, অচিরেই দেখা যায় তা পুরনো হয়ে গেছে।

বৈচিত্র্যই সাহিত্যের প্রাণ। নানা লেখক নানা রীতিতে লিখবেন, নানা দৃষ্টিতে দেখবেন জীবনকে আর তা থেকে মানুষ পাবে নানা বিচিত্র রসের সন্ধান এইটেই স্বাভাবিক। কোনো বিশেষ রীতির দাসত্ব করতে হবে—এই দাবি সাহিত্যের বিকাশের পথ রোধ করে। সাহিত্যে ও রকম 'ওঅন ওয়ে ট্রাফিকের' নিয়ম চলে না।

বাঙলা ছোট গল্প : সাম্প্রতিক ঝোঁক

পরিসংখ্যানে বিশেষ পারদর্শিতা দাবি করতে পারি না তবু হাল আমলের বাঙলা গল্প-উপন্যাসের প্রধান ঝোঁক কোন্ দিকে তা নির্ণয় করতে হলে কিছুটা সংখ্যাতত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। এ-রীতির সীমাবদ্ধতা সুবিদিত। পরিসংখ্যান যা প্রকাশ করে তা বিভ্রান্তিকর আর যা গোপন করে তাই আসল—বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের এ-মন্তব্য অনেকেরই নিশ্চয় জানা আছে। কিন্তু বছর বছর বাঙলা ভাষায় গল্প-উপন্যাস যত প্রকাশিত হয় তা সব পড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। সব পড়বার যোগ্যও নয়। তাছাড়া, অরণ্যের শুমারী করতে গিয়ে আগাছার হিসাব কে করে ?

কিন্তু কথাটা তা নয়, আসলে পরিসংখ্যানও নিশ্ছিদ্র নয়। র‍্যাণ্ডম স্যাম্পেলিং-এর কোনো বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি, তদুপরি আমার পড়াও এলোমেলো। গত কয় বছরে উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস যতগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাও সব পড়ে উঠতে পেরেছি এমন দাবি করতে পারি না। তবে, পেশাগত কারণে গত কয় বছরে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন বাঙলা গল্প-উপন্যাস আমাকে পড়তে হয়েছে, কিছুটা মনোযোগ সহকারেই, শুধু শয়ন আর নিদ্রাগমের ফাঁকটুকু ভরাবার জন্যই নয়। ডি-ফিল-এর থীসিসের মতো নিশ্ছিদ্র না

হলেও সেই পড়ার অভিজ্ঞতা হয়তো আমাকে পুরোপুরি প্রতারিত করেনি, এই ভরসাতেই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত করা।

দুই

শারদীয় গল্প-সাহিত্য, অল্প সাহিত্য—একথা সকলেই হয়তো একবাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু এই মরশুমে ছোট-বড়ো, নামী-অনামী সব লেখকই কিছু-না-কিছু লিখে থাকেন। বাঙলা সাহিত্যের শিল্পগত উৎকর্ষ বিচারের পক্ষে এই মরশুমী পণ্য নির্ভরযোগ্য নিরিখ না হলেও হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, লেখকেরা কি ভাবছেন, হালফিল কোন্ বিষয়বস্তু তাঁদের পছন্দ, কিভাবে তাঁরা সেই বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করছেন—এ-থেকে তা বেশ আঁচ করা যায়।

প্রথমে তাই কয়েকটি শারদীয় সংখ্যার গল্প-উপন্যাসের,—প্রধানত গল্পের, খতিয়ান করব। কোনো নাম করব না। কেননা, কোনো বিশেষ পত্রিকা বা লেখকের নিন্দা বা প্রশংসা করার জন্য এ-আলোচনার অবতারণা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য বাঙলা কথাসাহিত্যের সর্বাধুনিক ঝোঁকটা বুঝতে চেষ্টা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তার মূল্যায়ন করা।

একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার কথাই ধরা যাক। পত্রিকাটিতে কোনো খ্যাতনামা লেখকের একটি প্রমাণ সাইজের উপন্যাস ছাড়া গল্প আছে উনিশটি। এর মধ্যে একটি রসরচনা একটি গোয়েন্দা-কাহিনী, আমাদের আলোচনা থেকে এই গল্প দুটিকে বাদ দিচ্ছি। বাকি সতেরোটির মধ্যে চৌদ্দটি গল্পই শহরের পটভূমিকায় লিখিত। এর মধ্যে আবার তিনটি ছাড়া আর সব কটি গল্পের শহরই কলকাতা। গ্রামের পটভূমিকায় লেখা গল্প আছে মাত্র দুটি। এই দুটি গল্পেরও পটভূমিকাই শুধু গ্রাম—গ্রামের মানুষ বা গ্রামজীবনের সমস্যা এখানে গৌণ। একটিতে সচ্ছল অবস্থার জনৈক গ্রাম্য প্রৌঢ়ের কৃপণতা নিয়ে কৌতুকরস পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে, অপরটিতে দেখানো হয়েছে কেমন করে গ্রাম-ভীরু একটি যুবক সরকারি কাজে গাঁয়ে এসে জীবন-সঙ্গিনী খুঁজে পেল।

শহরের গল্পগুলির পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণী থেকে এসেছে। প্রায় সবকটি গল্পেরই বিষয়বস্তু বৈধ বা অবৈধ প্রেম। মাত্র একটি গল্পে উদ্বাস্তু-সমস্যা স্থান পেয়েছে। মাত্র দুটি কি তিনটি গল্পে পাত্র-পাত্রীর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার আভাস আছে। অন্য গল্পগুলিতে অর্থনীতির

কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে। বহু গল্পই বহুবার লিখিত। নৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা প্রায় সব গল্পেই অনুপস্থিত। গল্পগুলি প্রায় সবই সুলিখিত। তরতর করে পড়ে যাওয়া যায় এবং পড়ে ভুলে যেতে দেরি হয় না।

যে পত্রিকাটির কথা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম—রাজনৈতিক মতের দিক থেকে সেটি দক্ষিণপন্থী, সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে রক্ষণশীল।

এবার একটি বামপন্থী পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় কি ধরনের গল্প বের হয়েছে দেখা যাক। বৃহদায়তন এই সংকলনে গল্পের সংখ্যা আঠারো। তার মধ্যে দুটি রসরচনা। বাকি ষোলটির মধ্যে বারোটি গল্পই শহরের পটভূমিকায় লিখিত। এর মধ্যে আবার দুটি ছাড়া সব গল্পেই কলকাতাকে পটভূমিকা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। গ্রাম নিয়ে গল্প আছে তিনটি। এছাড়া আরও একটি গল্পে গ্রাম আছে কিন্তু তবু এটিকে ঠিক গ্রামের গল্প বলা যায় না। শহরের জনৈক লেখকের গ্রামে গিয়ে কোনো সাহিত্যসভায় পৌরোহিত্য করার অভিজ্ঞতাই এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

এই সংকলনের ষোলটি গল্পের মধ্যে দশটিরই পাত্র-পাত্রী এসেছে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। বাকি ছটি গল্পের মধ্যে দুটির পাত্র-পাত্রী কৃষক, একটিতে জেলে, একটিতে শ্রমিক, একটিতে ভিখিরি এবং শেষটিতে আধ-ভিখিরি দিনমজুর। সরাসরি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গল্প আছে মাত্র দুটি। আর একটি গল্পেও রাজনীতি আছে কিন্তু পরোক্ষভাবে। অন্য গল্পগুলির প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং আশাভঙ্গ। কোনো গল্পেই কোনো নৈতিক সমস্যা উত্থাপিত হয়নি। এখানে নৈতিক কথাটা দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, সুনীতি-দুর্নীতি অর্থে নয়।

এবার উল্টে দেখা যাক একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রগাতবাদী মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা। এই সংখ্যার ছটি গল্পের মধ্যে তিনটিই শহর নিয়ে। এর মধ্যে একটি গল্পে বিদেশী পটভূমিকা ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি তিনটির মধ্যে একটি ঠিক গল্প নয়, ব্যঙ্গধর্মী স্কেচ। একটি গল্পে পটভূমিকা স্পষ্ট নয়। এই গল্পে প্রবীন লেখক বিনাটিকিটে রেলভ্রমণ নিয়ে দায়সারা গোছের রোমান্সের গন্ধ মেশানো কৌতুকরস পরিবেশনের প্রয়াস পেয়েছেন। মাত্র একটি গল্পে, বলা যায়, গ্রাম্য পরিবেশ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, যদিও এ-গল্পে জেলেদের জীবন এবং সংগ্রামকে রূপায়িত করা হয়েছে তবু একধরনের সংকীর্ণ আত্মমুখী আঙ্গিক ব্যবহারের ফলে এখানেও পরিবেশ অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে।

এই পত্রিকাটির বারোটি সংখ্যা হাতের কাছে রয়েছে। এর মধ্যে শারদীয় সংখ্যার আলোচনা আগেই করেছি। বাকি এগারোটি সংখ্যায় গল্প বের হয়েছে সাতটি। এর মধ্যে পাঁচটি গল্পই শহর এবং কলকাতার পটভূমিকায় লেখা। গ্রামের পটভূমিকায় যে দুটি গল্প আছে তার লেখক একই ব্যক্তি। মাত্র একটি গল্পে রাজনীতি আছে, কিন্তু তাও পরোক্ষভাবে! একটি রাজনৈতিক মিছিল গল্পটির প্রেক্ষিত রচনা করেছে। তাতে পুলিসী সন্ত্রাসের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় কিন্তু কেন মিছিল, কাদের মিছিল, কিরকম মিছিল তা জানা যায় না। আর একটি গল্পে রাজনৈতিক নেতার জীবনের একটি দিক দেখানো হয়েছে। তাতে দলীয় রাজনীতির নোংরামি কিছুটা পরিমাণে প্রকটিত হলেও—সমস্যাটা সেখানে একান্তই ব্যক্তিগত।

শহরের পটভূমিকায় লেখা পাঁচটি গল্পের মধ্যে চারটি গল্পেরই পাত্র-পাত্রী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এর মধ্য তিনটি গল্পে কোনো নির্দিষ্ট কাহিনী নেই—যদিও তার মধ্যে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের ইতস্তত রেখাচিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বিশৃংখল, দুর্বোধ্য রচনারীতি গ্রহণের ফলে লেখক যে শেষ পর্যন্ত কী বলতে চান তা স্পষ্ট হয় না।

তরুণ লেখকদের একটি গল্প-সংকলনে দেখতে পাচ্ছি ষোলোটির মধ্যে পনেরোটি গল্পই নগর-ভিত্তিক। মাত্র একটি গল্পে গ্রাম আছে। উদ্বাস্তু জীবনের চিত্র পাওয়া যায় মাত্র দুটি গল্পে। সংকলনে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে একটিও গল্প নেই।

পরিসংখ্যানের এই নীরস তালিকা আর টেনে বড়ো করবার প্রয়োজন নেই। যদিও আমরা মাত্র তিনটি পত্রিকা এবং একটি গল্প-সংকলনের ভিত্তিতে উপরের তথ্য আহরণ করেছি তবু সব মতের এবং সব বয়সের লেখকদের রচনাই এর মধ্যে পড়েছে। তাই এর ভিত্তিতে যদি কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই, মনে হয়, তা বাস্তবানুগই হবে।

তিন

বছর পাঁচেক আগে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক এই বলে আক্ষেপ করেছিলেন যে বাঙলা গল্পের পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। উপরে আমরা যে হিসাব দিয়েছি তার দিকে তাকালে মনে হবে তাঁর আক্ষেপ ভিত্তিহীন নয়। পটভূমিকা, কাহিনী, পাত্র-পাত্রী, সমস্যা ও জিজ্ঞাসা—সব দিক থেকেই বাঙলা

গল্প ক্রমশ বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠছে। বাঙলা-সাহিত্যে এক সময় আঞ্চলিকতার যে জোয়ার এসেছিল আজ তাতে ভাঁটার টান ধরেছে। গ্রাম বাঙলা আজকের সাহিত্যে উপেক্ষিত। 'ছেড়ে আসা গ্রাম' ধরনের আবেগপ্রবণ 'নস্টালজিক' লেখা অবশ্য কখনও-সখনও চোখে পড়ে কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপ-শাসিত গ্রাম গত দুই-তিন দশকে কী রকম বদলে গেছে—যুদ্ধ, দাঙ্গা স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা, কমিউনিটি প্রজেক্ট, ভূমি সংস্কারের কল্যাণে ; গ্রামের শ্রেণী-বিন্যাসের, ভারকেন্দ্রের কী পরিবর্তন হয়েছে, এবং তার ফলে মানবিক সম্পর্ক কী দাঁড়িয়েছে হাল আমলের বাঙলা গল্পে তার পরিচয় সামান্যই পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে লেখা সমরেশ বসুর 'শানা বাউরীর উপকথা'-ই বোধহয় এর একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। গ্রাম সম্পর্কে দু-চারটে গল্প যা কখনও-সখনও লেখা হয় তা পড়লে মনে হয় কবিত্ব করা কিংবা বৈচিত্র্যসৃষ্টিই তার প্রধান প্রেরণা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অপ্রাকৃত পরিবেশ, মেলা উৎসব ইত্যাদির বর্ণবহুলতাকে ব্যবহারের দিকেই তাই সম্ভবত লেখকেরা ঝোঁকেন। অর্থাৎ এই গ্রাম-প্রীতির প্রেরণা সাহিত্যিক ততটা নয়, যতটা বৈষয়িক। এই একই প্রেরণায় কেউ কেউ আঞ্চলিকতার নামে নাগাভূমি কি আন্দামানের উপজাতিদের নিয়ে সাংবাদিক-সুলভ খুঁটিনাটির সমাবেশ করে বৃহদায়তন উপাখ্যানে সেই অতি পুরাতন জোলো রোমান্টিক বিরহ-মিলন-কথাকেই নতুন ভাবে পরিবেশন করেন।

কিন্তু এমন কি এই ভুয়ো আঞ্চলিকতাও আজকের বাঙলা কথাসাহিত্যে ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। বাঙলা কথাসাহিত্য আজ একান্তভাবেই হয়ে উঠছে নগরকেন্দ্রিক। চাষী-মজুর, শহর-গাঁয়ের খেটে-খাওয়া মানুষ, দ্বিধাজড়িত ভীরু পায়ে যারা সাহিত্যের আসরের দিকে এগিয়ে আসছিল অবহেলায় তারা কখন নিঃশব্দে ফিরে গেছে। বাঙলা গল্প-উপন্যাসে এখন মধ্যবিত্ত ভদ্র-শ্রেণীর নিরঙ্কুশ একাধিপত্য।

সনাতন বিরহ-মিলন-কথার ঢঙের অবশ্য কিছু কিছু যে পরিবর্তন হয়নি তা নয়। শরৎচন্দ্রের সেই 'মশারী খাটানো' নায়িকারা অবশ্য অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল, কালপ্রভাবে অনিবার্যভাবেই। এখনকার ইস্কুলে পড়া, আপিস-কাছারিতে চাকরি-করা মেয়েরা রসনার পথে নায়ককে জয় করবার চেষ্টা করবে কিংবা এ জন্মে কাশীবাস করে পরজন্মে নায়কের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে এমনটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না। কিন্তু পরিবর্তন যা ঘটেছে তা মোটের উপর ঢঙেরই। নায়ক-নায়িকা দুজনেই চাকরি

করুক বা স্বামীকে ছেড়ে এসে প্রেমিকের সঙ্গেই বসবাস করতে থাকুক কিংবা দেহ সম্পর্কে কুণ্ঠা বর্জন করে নাইটক্লাবেই বিচরণ করুক—জীবন-জিজ্ঞাসার একটিমাত্র সূত্রের উপরই বারবার দাগ কাটা হচ্ছে। তাহলো—যাহা চাই তাহা পাই না।

তরুণতম লেখকেরা, যারা কিছুকাল আগে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে "নতুন সাহিত্য আন্দোলন" শুরু করেছিলেন তাঁদের লেখাতেও এই ছকের বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। এঁদের একাধিক গল্পে একই ছকের বিরক্তিকর পুনরুক্তি চোখে পড়ল : নায়ক-নায়িকা দুজনেই হয় বেকার, না হয় দুজনেই চাকরি করে কিন্তু দুজনের ঘাড়েই সংসার আছে কিংবা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে তারা বিয়ে করে না, বিয়ে করলেও গোপন রাখে—প্রেম করে পার্কে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে-বাসে, ঘোড়ার গাড়িতে। এরা কথা বলে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে, কবিতার ভাষায়, শহীদ শহীদ ভাব করে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। বড় জোর একটু নেকিং, পেটিং, বড়ো জোর নায়িকার চুল নিয়ে খেলা করা, বড়ো জোর নায়ক নায়িকার পিঠের জামা মুক্ত করে মুখ ঘষবে। কিন্তু পার্ক এক সময় নির্জন হবে, রেস্তোরাঁ বন্ধ হবে, ট্রাম-বাস ঘোড়ার গাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে—তখন যে যার বাড়ি চলে যাবে। তারপর সেই 'কী পাইনি'-র হিসেব। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই—নতুন বোতলে এ সেই পুরনো মদই। উপরন্তু, এ-সব গল্পে নায়ক-নায়িকারা আরও পানসে, ব্যক্তিত্বহীন, নিরক্ত। অনেক গল্পেই দেখি বয়ঃসন্ধিকালীন জোলো ভাবালুতার প্রাবল্য, চমক সৃষ্টির ব্যবসাদারী প্রয়াস।

অবশ্য একথা স্বীকার্য, গত দু এক দশকে বাঙলা গল্পের আঙ্গিক-নৈপুণ্য ও প্রসাধন-কলার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। কিন্তু, 'টাইমস লিটারারী সাপ্লি-মেন্টের' ভাষায় বলা যায়, লেখার কৌশল এবং ক্ষমতা লেখার উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি লেখক মোটামুটি শিল্পচাতুর্য আয়ত্ত করতে পেরেছেন কিন্তু ক্রমেই দেখা যাচ্ছে খুব কম লেখকেরই নতুন কিছু বলবার থাকছে।

বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালে বাঙলা সাহিত্যের গাঙে সমাজচেতনার যে দু-কূলপ্লাবী বন্যাবেগ এসেছিল (তাতে কিছু বাড়াবাড়ি হয়তো ছিল) তাতে ভাঁটার টান ধরেছে, এখন তা শীতের মরা নদীর মতো ক্ষীণস্রোতা। দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা যে লেখক সমাজকে একদা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল—উদ্বাস্তু শিবিরে

মনুষ্যত্বের চরম অপমানেও আজ তারা নীরব থাকেন। কোনো বড় সামাজিক সমস্যা তাদের আলোড়িত করে না। নৈতিক সমস্যাও না। পুরোপুরি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে গল্প আজকাল এমনকি কট্টর প্রগতিবাদীরাও কদাচিৎ লেখেন।

কোনো আদর্শের তাগিদ নয়, কোনো বিশেষ সাহিত্যতত্ত্ব নয়, চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রভাবেই এখন সাহিত্যের বাজার ওঠানামা করে। অধিকাংশ লেখকই বাজারের দিকে চোখ রেখে লেখেন, যারা তা লেখেন না বলে দাবি করেন বা যাদের বই বাজারে কাটে না, উই আর ইঁদুরে কাটে বলে নিজেদের লেখাকে 'ইমাজিনেটিভ' সাহিত্যের পংক্তিভুক্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁদেরও অধিকাংশের লেখাতে ইমাজিনেশানের দৈন্য, জীবন-জিজ্ঞাসার তুচ্ছতা, অভিজ্ঞতার অভাব অতিমাত্রায় প্রকট। বস্তুতন্ত্র কি বস্তু, সমাজ-সচেতনতার লক্ষণ কি তা নিয়ে বিলক্ষণ মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু একথা বোধহয় প্রতিবাদের ভয় না করেই বলা যায় বাঙলা গল্প ক্রমশ বেশি পরিমাণে আত্মমুখী হয়ে উঠছে, তাতে বিষয়মুখিনতা বিরল হচ্ছে, ভঙ্গিসর্বস্বতার দুর্লক্ষণ প্রকট হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে নেতিবাদের প্রাবল্য। এটা আশা কি আশংকার কথা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু নিছক বিবৃতি হিসাবে কেউই বোধ হয় এর সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না।

যে বাঙলা গল্পের জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে, ভাবে-ভাষার বিষয় বৈচিত্র্যে যিনি নিজেই তাকে সাবালকত্বে পৌঁছে দিয়েছিলেন, বিশ্বসাহিত্যে তার স্থান করে দিয়েছিলেন—উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যে বাঙলা গল্পের সম্পদ ছিল —এই ক-বছরে সেই বাঙলা গল্পের এবংবিধ পরিণতি কি করে হলো তা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।

চার

এই শতকের তৃতীয় দশকে ইংরেজি কথাসাহিত্যের সংকীর্ণতা সম্পর্কে সমালোচক সিরিল কনোলী যে আলোচনা করেছিলেন, মনে হয়, বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান রক্তাল্পতার কারণ তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। কনোলি বলেছিলেন, "ইংরেজের জীবনে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অ্যাডভেঞ্চার বা বৈচিত্র্য বিশেষ নেই। শতকরা নব্বুই জন ইংরেজ লেখক বনেদী বুদ্ধিজীবী পরিবার থেকে এসেছেন। এই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের অভিজ্ঞতা বড়জোর তিন-

চার পর্বে সম্পূর্ণ—শান্তিপূর্ণ শৈশব, পাবলিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, তারপর কিছুদিন লণ্ডন বা মফঃস্বলে বাস, চাকরি, স্ত্রী, বাড়ি এবং কয়েকটি সন্তান-প্রাপ্তি। এর থেকে বড়োজোর একখানা বইয়ের উপাদান মিলতে পারে —কিন্তু এর পরে খুব আঁটোসাঁটো শ্রেণীবিভাগের ফলে আর পা বাড়ানোর উপায় নেই।"

সাধারণভাবে বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে কনোলির এই বিশ্লেষণ দ্বিগুণ সত্য। অধিকাংশ বাঙালী লেখকই এসেছেন মধ্যবিত্ত সমাজের সেই অংশ থেকে যারা কিছু লেখা-পড়া শিখেছে, চাকরি করে কিংবা বেকার, যারা সন্তুষ্ট নয় কিন্তু পোষমানা ভদ্রজীবন যাপন করে, কখনও কখনও প্রেম করে কিন্তু বিয়ে হিন্দুমতে হলেই খুশি হয়, ভাগ্যে বিশ্বাস করে, হঠাৎ বড়লোক হবার জন্য লটারির টিকিট কেনে, বছর বছর বংশবৃদ্ধি করে, ছেলেমেয়ের লেখা-পড়া-বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে চুল পাকায়। কোনো বড় সমস্যা তাদের আদৌ পীড়িত করে না। যারা বেকার বা কম মাইনে পায় তাদের কেউ কেউ অবশ্য ইউনিয়ন করে, কেউ কেউ বামপন্থী রাজনীতিতে সামিলও হয় কিন্তু সংখ্যায় তারা বেশি নয়। বাকিরা মাইনে বাড়ালে খুশি হয় কিন্তু নিজেদের গায়ে আঁচ লাগুক তা চায় না। ধরাবাঁধা জীবনের একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তারা বড়জোর শুঁড়িখানায় উঁকি মারে, রেস খেলে, পতিতালয়ে রাত্রি যাপন করে। যাদের বয়স কম, একই কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, বোমা ফাটায়, ইলেকশনের বাজারে দুটো পয়সা হাতাবার তাল করে, সর্বজনীন পুজোর উদ্যোগ করে, সারাদিন রকে বসে নরক গুলজার করে, মেয়েদের সম্পর্কে অভদ্র ইঙ্গিত করে, হাঙ্গামা লাগলে ট্রাম-বাস পোড়ায়, স্বপ্ন দেখে বোম্বাই ফিল্মের মতো কোন ধনীর দুলালী তাদের গলায় বরমাল্য দুলিয়ে দেবে।

এই মধ্যবিত্ত জীবনে বৈচিত্র্য কোথায়? তদুপরি দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশবিভাগে তাদের জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে, মূল্যবোধ হয়েছে বিপর্যস্ত। স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের যে রঙীন কল্পনা ছিল, বাস্তবের সঙ্গে তা মেলেনি। মোহভঙ্গজনিত হতাশা তাদের মধ্যে প্রবল। এদিকে শহুরে মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ দিনের পর দিন ক্ষীণতর হচ্ছে।

অধিকাংশ বাঙালী লেখকই এসেছেন এই শ্রেণী থেকে। প্রায় সকলেই তাঁরা শহরের বাসিন্দা। প্রায় সকলেরই সাহিত্য দ্বিতীয় পেশা, উপরি

আয়ের ' পন্থা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবগুলি দোষ এবং গুণ তাঁদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় নয়—আদর্শবাদ, সহানুভূতি কেতাবী ধরনের। গত রজনীতে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতির পর অনেকে প্রাতঃকালীন শিরঃপীড়ায় ভুগছেন। এদিকে অভিজ্ঞতার পুঁজি অল্প। তা নিয়ে একখানা বইও লেখা চলে কিনা সন্দেহ। অথচ গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনের বাইরে যাবার সাহস নেই, সাধনারও অভাব। তাই টেবিলের পাশে বসে কিছু স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে অনেকবারের দেখা কাছাকাছির চেনা জগতকে নিয়েই গল্পের ছক বাঁধতে হয়। প্রেরণা খুঁজতে হয় ইওরোপের দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যে। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য বড়জোর উনিশ শতকী সংবাদপত্রের পাতা উল্টে দেখা চলে, স্মরণ নেওয়া চলে কোনো বিবাহবিচ্ছেদ-মামলা-বিশারদ ব্যারিস্টারের স্মৃতিকথার।

এইসব লেখকের সঙ্গে একজন হেমিংওয়ে কি গ্রেহাম গ্রীনের কত না তফাত। গ্রেহাম গ্রীনের কঙ্গোর পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস 'দি বার্নট আউট কেস' (The Burnt Out Case) কিছুকাল আগে পড়েছিলাম। বইটি লেখার সময় গ্রীন যে ডায়েরি রেখেছিলেন সম্প্রতি তা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় বইটি লেখবার জন্য গ্রীন যে শুধু আর একবার কঙ্গো গিয়েছিলেন তাই নয়, সেখানে গিয়ে দীর্ঘকাল একটি কুষ্ঠাশ্রমে বাস করেছিলেন, প্রত্যেকটি চরিত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, 'নোট' নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় কুষ্ঠ-রোগ এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে যেখানে যত তথ্য পেয়েছেন সংগ্রহ করেছেন। তারপর তিনি বসেছেন উপন্যাস লিখতে।

আমাদের দেশের কোনো লেখক একখানা বই লিখতে এতটা পরিশ্রম করবেন এ-কল্পনাতীত। শুনতে পাই আজকাল কোনো কোনো লেখক বই লেখার জন্য দেশভ্রমণ করছেন। কিন্তু সে প্রায় টুরিস্ট-সুলভ ভ্রমণ। তা থেকে লেখার মাল-মশলা কতটুকু পাওয়া যেতে পারে। প্রাকৃতিক পটভূমিকায় তাতে কিছু বৈচিত্র্য হয়তো আসতে পারে কিন্তু তার মূল্য কতটুকু। সাহিত্যকে দর্পণের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। তাই যদি হয় তো তার সামনে দিয়ে রঙচঙে দৃশ্যের মিছিল চলে গেলে তাতে দর্পণের কী ক্ষতি-বৃদ্ধি। দর্পণের পিছনকার পারদের প্রলেপটা গাঢ় করে লাগালেই তবে প্রতিবিম্বের ডৌল এবং গভীরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই দিকটাই অবহেলিত হচ্ছে। নতুন জীবনবোধের অনুশীলনই সাহিত্যে প্রাণশক্তির যোগান

দিতে পারে। হাল আমলের সাহিত্যে এরই অভাব দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এই ঘাটতি পূরণের কোনো চেষ্টা দেখা যায় না, বরং অনুশীলনের আলস্য, চিন্তার অপরিচ্ছন্নতাকে ঢাকা দেবার জন্য নানা আধ-সেঁকা তত্ত্বের আমদানি করা হয়। বলা হয় মানুষকে আর শেখাবার কিছু নেই, সকলেই সব কিছু জেনে গেছে। সমস্ত মানবিক মূল্য সাহিত্যে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এখন ক্রমাগত আত্মহনন, বিদ্যুতের মতো দু-একটি অনুভবের কথা বলে চকিতে পলায়ন, সাহিত্যে এ-ছাড়া করণীয় আর কিছু নেই। যা কিছু লেখার পূর্বসূরীরা তা লিখে দিয়ে গেছেন। নতুন করে এখন আর কোনো গল্প লেখা সম্ভব নয়। এখন শুধু নিজের সঙ্গে কানামাছি খেলা, শুধু নিজেকেই দেখা ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে, ওপর থেকে, তলা থেকে।

এর জবাবে সবিনয়ে বলতে হচ্ছে—এটা অক্ষমতারই স্বীকারোক্তি। তলস্তয়-দস্তয়েভস্কির পর সমাজ যেহেতু এগিয়েছে, মানব-প্রগতি যেহেতু অন্তহীন—তাই দেখবার চোখ আর লিখবার কলম থাকলে বিষয়বস্তুর অভাব কখনও হবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরেও জীবন আছে, সে জীবনে বৈচিত্র্য আছে—কেতাবের জগৎ ছেড়ে সে জীবনে অবগাহন করলে—আখেরে ফল ভালো হবে বলেই মনে হয়। কেন না সাহিত্যের বিষয়বস্তু শেষ পর্যন্ত মানুষই এবং তার কাঁচামাল জীবন। এক বিশেষ ধরনের অর্কিড হয়তো হটহাউসেই ভালো ফলে কিন্তু মাটির অন্তস্তলে শিকড় চালাতে না পারলে মহীরুহের মৃত্যু অনিবার্য। সাহিত্য এই মহীরুহ, মাটি জীবন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কিছু অপ্রিয় সত্য

বাঙলা দেশের সমাজ-জীবনে আজ এক হতবুদ্ধিকর বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

গত এক দশকে বামপন্থী আন্দোলনের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। একদা যে কংগ্রেস সর্বশক্তিমান ছিল আজ তার শোচনীয় অবস্থা। মধ্যবর্তী নির্বাচনের (১৯৬৯) পর পার্টি হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুরূহ হয়ে উঠেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল যে আকস্মিক বা স্বল্পস্থায়ী কোনো অনুরাগ বা বিরাগের প্রতিফলন নয়—নানা পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ। বাঙলাদেশে সত্যি একটা দিনবদলের পালা এসেছে।

শুধু বামপন্থীদের অগ্রগতি হয়েছে বললে সবটা বলা হয় না। মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, অগ্রগতি হয়েছে সব চাইতে বেশি মার্কসবাদী পার্টিগুলির। ২৮০টি আসনের মধ্যে তাঁরা পেয়েছেন ১৫৫টি আসন। তাছাড়া নির্দলদের মধ্যে আরও অন্তত চার জন আছেন যাঁরা মার্কসবাদী বলে সুপরিচিত।

কিন্তু মার্কসবাদীদের এই অগ্রগতি কি মার্কসবাদের অগ্রগতির সূচক? জনজীবনে কি তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে? অন্তত যতটা প্রত্যাশিত ততটা প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে? এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে পারলে খুশি

হতাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাহলে পুরো সত্যিকথা বলা হতো না।

কথাটা বোধ হয় একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। নির্বাচনে মার্কস্‌বাদীদের জয়জয়কার হয়েছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, কলে-কারখানায় আপিস-দপ্তরে শ্রমিক-কর্মচারীরা বল-ভরসা পেয়েছেন, মাঠে-ময়দানে কৃষকেরা জমির লড়াই শুরু করেছেন—এ সবই সত্যি কথা। কিন্তু এরই পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি, এখনও অনায়াসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো যাচ্ছে, প্রাদেশিকতা প্রসার লাভ করছে এবং আরও যা দুশ্চিন্তার কারণ, যে শ্রমিক যে কর্মচারি রুজি-রোজগারের জন্যে লড়াই করছেন, ইউনিয়নে জোট বাঁধছেন, দুনিয়ার শ্রমিক এক হও ধ্বনি দিচ্ছেন, অনেক সময় তাঁদেরও একাংশ এতে লিপ্ত হচ্ছেন।

শুধু কি তাই? যেসব ছেলে-ছোকরারা চোঙা প্যান্ট পরে গলায় লাল রুমাল বেঁধে জঙ্গী শ্লোগান আউড়ে গলা ফাটাচ্ছেন তাঁরাই আবার পাড়ায় পাড়ায় সর্বজনীন নানা পূজার উদ্যোক্তা। সর্বজনীন পূজার হুল্লোড় দিন দিন ভীতি-জনকভাবে বাড়ছে।

শহর কলকাতায় চল্লিশ বৎসরাধিক কাল বাস করছি। কোনো দিন দেখিনি যুবক ছেলেরা বাঁক কাঁধে শ্রাবণী মেলায় যাবার জন্যে মিছিল করে তারকেশ্বর রওনা হয়েছে। এখন এ-দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ছে। শুধু কি তাই? এরা আবার রাজনৈতিক ঢঙে শ্লোগান দেয়···আমরা কারা? চলেছি কোথায়? ইত্যাদি।

একদিকে অনস্বীকার্যভাবেই রাজনৈতিক অগ্রগতি, আর তারই পাশাপাশি এই ধারা—এই দুয়ের মধ্যে সংগতি কোথায়?

যদি বলি বামপন্থীরা তথা মার্কসবাদীরা মানুষের ভোট পাবার লড়াইয়ে এক রাউণ্ড জিতেছেন বটে কিন্তু মানুষের মন পাবার লড়াই ফতে হতে অনেক দেরি তাহলে অনেকে বিপ্লবী কায়দায় আমার মুণ্ডপাত করবেন জানি, কিন্তু কথাটা তাই বলে মিথ্যে হয়ে যাবে না।

গত ক-বছরে বিপ্লবী বুলির অগ্নি উদ্‌গীরণ কম হয়নি, কিন্তু অনেককে চটাবার ঝুঁকি নিয়েই বলতে হচ্ছে, তার অধিকাংশই ভোট ধরার ছল। কিন্তু সমাজ-বিপ্লবই যাদের লক্ষ্য ভোটের চেয়ে মানুষের মন তাদের কাছে কোনো অংশে কম দামী নয়।

এই মন পাবার জন্যে বামপন্থীরা কী করেছে ?

আমাদের রাজনৈতিক প্রচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধ ভক্ষ্য ধনুর্গুণ নীতি অনুসৃত হয়েছে। কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজতন্ত্র কথাটা নিয়ে কচলাকচলি কম হয়নি—কিন্তু তা নিয়ে আদর্শগত প্রচার হয়েছে সামান্যই। তাতে বামপন্থী দলগুলির জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই বেড়েছে, সমাজতন্ত্র কথাটাও জনপ্রিয় হয়েছে—কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শ জনমনে চারিয়ে যেতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের ধারণাটা এখনও সাধারণভাবে এত অস্পষ্ট যে, এমনকি নিজলিঙ্গাপ্পা কি পাতিলও অম্লান বদনে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দিতে পারেন।

তদুপরি জনসাধারণের মন পাবার জন্যে বামপন্থীদের আয়োজনই বা কতটুকু! বামপন্থীদের মধ্যে এক কমিউনিস্টরাই তবু জনসংযোগের মাধ্যমের গুরুত্ব কিছুটা বোঝেন। দুই কমিউনিস্ট পার্টিই একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সাকুল্যে তা কত লোকের কাছে পৌঁছয় ?

বাঙলা ভাষায় যত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মোট প্রচারসংখ্যা হলো ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার। এটা ১৯৬৯ সালের সরকারি হিসেব। এর মধ্যে আনন্দবাজার-যুগান্তর প্রভৃতি ৭টি বড় বড় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার-সংখ্যাই ৭ লক্ষ ৪৫ হাজারের অধিক। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ৬০১টি পত্র-পত্রিকা। অর্থাৎ বাকি ৫৯৪টি পত্র-পত্রিকার প্রচারসংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষের কিছু বেশি। এর মধ্যে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী পত্র-পত্রিকাগুলির মোট প্রচার-সংখ্যা কত ? কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এক লক্ষও হবে কি না সন্দেহ !

দুটি কমিউনিস্ট পার্টি একত্রে বেশ কয়েক লক্ষ ভোট পেয়েছেন। কিন্তু তাদের পত্রপত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা এত কম কেন ?

আনন্দবাজার পত্রিকার নীতি খুব জনপ্রিয় এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। তা সত্ত্বেও তাদের প্রচারসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কিন্তু কমিউ-নিস্ট পার্টিগুলির বিস্ময়কর বাড়বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁদের পত্র-পত্রিকার প্রচারসংখ্যা সংগতি রাখতে পারছে না কেন, তা কি কেউ কোনো দিন ভেবে দেখেছেন ?

যে মাত্র লাখখানেক লোকের কাছে কমিউনিস্টরা তাদের পত্র-পত্রিকা মারফত পৌঁছতে পারেন তাদের কাছে বা কী তাঁরা পরিবেশন করছেন ? পত্রিকাগুলি অধিকাংশই পার্টির কার্যকলাপের বুলেটিন মাত্র, তত্ত্বগত আলোচনা সেখানে সামান্যই থাকে।

মানুষের মনের জন্য সংগ্রাম আসলে কতগুলি মূল্যবোধের জন্য সংগ্রাম—সংস্কৃতি যে সংগ্রামে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

প্রথম দেখা যাক, এই সংস্কৃতি আন্দোলনের কী অবস্থা।

ত্রিশের যুগে এই বাঙলা দেশে একটা শক্তিশালী প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বাঙলা দেশের নাম করার মতো প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকই একদা সেই আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দু দশকের মধ্যে সেই আন্দোলন কেন তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলল তার একটা গভীর বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত হলো না। এখন তো সে আন্দোলন স্মৃতিমাত্র। কয়েকটি পত্রিকা মাত্র টিমটিম করে বের হচ্ছে! অবস্থার যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন অচিরে ঘটবে তারও কোনো লক্ষণ দেখি না।

এই সেদিন তথাকথিত সংস্কৃতি আন্দোলনের একটি দলিল হাতে এসেছিল। এমন বন্ধ্যা দলিল গত এক দশকের মধ্যে পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

সাহিত্য-শিল্প নাকি সমাজের দর্পণ। গত দু দশকে বাঙলাদেশের সমাজ-জীবনে যে সুগভীর পরিবর্তন এসেছে তার কোনো উপলব্ধিই নেই এই দলিলে। কতগুলি মুখস্থ-করা রাজনৈতিক বুলি আওড়ান হয়েছে বন্ধু-বান্ধবদের একটি তালিকা রচনার গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে, যাদের কমিউনিস্ট বা প্রগতিবাদী বলে চালানো হয়েছে। এই তালিকার মধ্যে কতজন কমিউনিস্ট বা প্রগতিবাদী তা যেমন তদন্তসাপেক্ষ তেমনি খুঁজে দেখতে হয় তাদের মধ্যে কতজন সত্যিই সাহিত্যিকপদবাচ্য।

এই চিন্তার দৈন্য, বরং আরও সঠিকভাবে বললে—অভিজ্ঞতার দৈন্য, আজকের সাহিত্যিক ফসলে মারাত্মকভাবে প্রকট।

কিছুকাল আগে একদল অর্বাচীন ঢাক-ঢোল সহযোগ তত্ত্ব প্রচার করে-ছিলেন, মানুষ সম্পর্কে নাকি নতুন করে জানার কিছু নেই, সবই জানা হয়ে গেছে, সব কথাই লেখা হয়ে গেছে—নতুন করে লেখার কিছু নেই। এখন কাজ শুধু নিজেকেই দেখা—ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে, উপর থেকে, নিচ থেকে। যাঁরা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দেন কথাটা তাঁরা এভাবে না বললেও, মোটের উপর কিন্তু তাঁরাও একই পথের পথিক। সেদিক থেকে, এখন যারা প্রবীণত্বে প্রমোশন পেয়েছেন সেই তিরিশ ও চল্লিশের যুগের কবিরাই বরং সমাজসচেতনতার ধারাটি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তরুণতরদের মধ্যে শক্তিমান লেখক কেউ নেই, একথা বলছি না। আসলে অভাব অভিজ্ঞতার। অভাব সমাজচেতনার।

বাঙলা সাহিত্য এখন একান্তভাবেই কলকাতা-কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তার উপজীব্য মধ্যবিত্ত-সমাজ।

সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই কলকাতার বাসিন্দে। কফি হাউসের দমবন্ধ-করা আবহাওয়ার মধ্যে জীবনকে খুঁজতে গেলে তা পণ্ডশ্রম হতে বাধ্য।

গত দু-দশকে বাঙলাদেশের সমাজজীবনে যে দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে— তার ছাপ বাঙলা সাহিত্যে পড়েনি বললেই চলে।

দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর পরে সম্প্রতি পশ্চিম বাঙলার এক মফঃস্বল শহরে গিয়ে দিনকয়েক বাস করতে হয়েছিল।

বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চল আমার অপরিচিত নয়। এককালে দীর্ঘকাল সেখানে বাস করেছি, রাজনীতিও করেছি। তারপর অনেককাল ওমুখো হই নি। রেলে করে এক আধবার যাতায়াত করলেও ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি।

এবারে চোখ খুলে তাকাতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হল।

দুপাশে দিগন্তবিসারী খেতের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে প্রশস্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে। আর তার উপর দিয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রশান্ত নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে দিয়ে চলে যাচ্ছে বাস। খেত থেকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে হাত দেখিয়ে সেই বাস থামাচ্ছে চাষী, তারপর চাষের সরঞ্জাম সহ তাতে চেপে বসছে। তাদের কারো কারোর হাতে ট্রানজিস্টারও দেখেছি। গ্রামের অনেক বাড়িতেই এখন রেডিও। চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখছে। কোন কোন গ্রামে এমনকি বিজলী বাতির ঝলকও দেখা যায়। গ্রাম শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। শহরের অভাববোধ সেখানে অনুভূত হচ্ছে। নগর সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে সেখানে। বাঙলার পল্লীসমাজ আমূল বদলে যাচ্ছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে তার প্রভাব কতটা পড়েছে?

এক বন্ধু সম্প্রতি এক রেল-শহর ঘুরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা বলছিলেন। বৈদ্যুতীকরণের ফলে রেল শ্রমিকদের মধ্যে কী ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটছে তাঁর আভাস পেয়েছিলাম তাঁর বর্ণনায়।

আগে ইঞ্জিন চালক বলতে আমরা বুঝতাম কালিঝুলি মাখা একটা লোক। এখনকার বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের চালক অনায়াসে টেরিলিন পরে। রেলে

বৈদ্যুতীকরণের যত প্রসার হবে, রেল শ্রমিকের কাঠামোগত পরিবর্তন তত স্পষ্ট হবে। অদক্ষ শ্রমিক বাতিল হয়ে যাবে। এর ফলে শ্রমিকজীবনে যেসব সমস্যা ও সংকট দেখা দিচ্ছে সাহিত্যে কী তার প্রতিফলন হচ্ছে?

অন্য পরে কা কথা, যারা অ্যাষ্টেপৃষ্ঠে প্রগতিবাদের নামাবলী জড়াচ্ছেন তাঁরা এ সম্পর্কে এমনকি অবহিতও নন।

যদিও আজ গ্রামের মানুষের লড়াই, কলে-কারখানায় শ্রমিকের সংগ্রাম খবরের কাগজের শিরোনামা নিত্য জুড়ে থাকছে, বাঙলা সাহিত্যের আসরে তারা হয়ে পড়ছে অপাংক্তেয়। মাটির সঙ্গে যোগ হারিয়ে বাঙলা সাহিত্য হয়ে উঠছে এক ধরনের একজটিক প্ল্যান্ট।

মাঝে এক সময়ে আঙ্গিক নিয়ে যে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রগতিবাদী মহলে অপরাধ বলে গণ্য হত। তার প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত এখন দেখা দিয়েছে আঙ্গিক-সর্বস্বতা, এমনকি প্রগতিবাদী মহলেও। ফলে ছোটগল্প কি উপন্যাস ক্রমশ অপাঠ্য হয়ে উঠছে।

বলা হয়ে থাকে, সাহিত্যের রস পেতে হলে পাঠককেও কিছু শ্রমস্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, শ্রমস্বীকার করে পাঠক সারবস্তু কিছু পাবেন কি? যদি না পান, তবে কেন তাঁরা শ্রমস্বীকার করতে যাবেন? তারা বরং দেশ-নবকল্লোল মার্কা প্রি-ডাইজেস্টেড সাহিত্যই পড়বেন। বাস্তবে হচ্ছেও তাই, আপিসে-দপ্তরে যারা জঙ্গী, মুখ দিয়ে বিপ্লবী বুলির খৈ ফোটে, গল্প পড়তে হলে তারা দেশ-নবকল্লোলই পড়েন।

ফলে লড়াই শুরু হতে না হতেই সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রগতিবাদের পরাজয় ঘটছে। কিন্তু মানুষের মনের জন্য লড়াইয়ে জিততে না পারলে ভোটের জয় সংহত হবে না।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি

"জীবন্ত গাধা মৃত সিংহকে শুধু যে পদাঘাতই করে তাই নয়—আরও জঘন্য ব্যাপার হলো এই যে সে তার (সিংহের) উপর মুরুব্বীয়ানা ফলায় এবং তার (সিংহের) রাসভসুলভ গুণাবলীর প্রশংসায় রাসভ-নিনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।"

লেনিনের মৃত্যুর পর হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা-লেনিনবাদীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন কমরেড রজনী পাম দত্ত লেনিনের জীবনী-বিষয়ক গ্রন্থে। সম্প্রতি 'শারদীয় সাহিত্যে ছোট গল্প' (পরিচয়, পৌষ, ১৩৫৪) সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে এবং বুদ্ধদেব বসুর 'An Acre of Green Grass' শীর্ষক পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে (যদিও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে) মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতিভূষিত (যদিও অসাধুভাবে সম্পাদিত) কবি বিষ্ণু দে'র সাহিত্যদর্শন পাঠ করে কমরেড দত্ত'র উক্তিটি মনে পড়ল।

'সংস্কৃতির লাল রাস্তা' এবং সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা দেখে বিষ্ণুবাবু বুদ্ধদেববাবু এবং মানিকবাবুদের মধ্যে 'তৃতীয় পক্ষ' সেজেছেন। সেইজন্যই কমিউনিস্টদের ওপর দমননীতি সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ বিশেষ রাজনীতির স্ব-কপোল-প্রযুক্ত মতবাদের বা ব্যক্তি-গত কোনো নীতির মানদণ্ড পরিচালনা" দেখে বিষ্ণুবাবুরা "কমবেশী ক্ষিপ্ত"

হয়ে পড়েছেন এবং অশোক মেহতার মতই যুগান্তকারীভাবে আবিষ্কার করেছেন যে, "মানিকবাবুরা ভাবেন বাঙালী ও সোভিয়েট মন একই ছন্দে চলছে।" এই নতুন আবিষ্কারের প্রসাদে বিষ্ণুবাবু এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছেন যে তাঁর উগ্রতা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। বিষ্ণুবাবুকে শালীনতা শিক্ষা দেবার ধৃষ্টতা আমার বিন্দুমাত্র নেই। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যকে আদি ও অকৃত্রিম মার্কসবাদ বলে দাবি না করতেন তাহলে তাঁর এই অহেতুক উষ্মার জবাব দেবার প্রয়োজনও মনে করতাম না।

মার্কসের উদ্ধৃতি ভূষিত করে বিষ্ণুবাবু যা বলতে চেয়েছেন তার মোদ্দা কথা হলো এই যে, মার্কসবাদ বড়জোর শিল্প-সাহিত্যের উৎসের সন্ধান দিতে পারে—কিন্তু শিল্প বিচারের জন্য দ্বারস্থ হতে হবে বুর্জোয়া বিশারদদের কাছে। এরভে এবং গারোদির উল্লেখ করে (যদিও ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের মত গ্রহণ করেনি। কমিউনিজম তত্ত্ব ও শিল্প—লেঁার কাসানোভা দ্রষ্টব্য) বিষ্ণুবাবু যে দাবি করেছেন তার আসল তাৎপর্য এই।

ঈসথেটিকসের বিষ্ণুবাবুকৃত সংজ্ঞা জানি না, তিনি কোনো সংজ্ঞা নির্দেশও করেননি, তবে বুর্জোয়া অভিধানে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে সৌন্দর্যতত্ত্ব। বিষ্ণুবাবু এই সংজ্ঞাই মানেন মনে হয়, কারণ তিনি লিখেছেন, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন নিছক (বিশুদ্ধ ?) সৌন্দর্যচেতনা।

এটা বুর্জোয়া বুলি। কডওয়েল বলেছেন, সাধারণত ভাববাদী পন্থাকেই কাব্য বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্টতম বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই পন্থাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সত্য শিব সুন্দর :ইত্যাদি কথার দ্বারা (ইলিউসন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি, পৃঃ ৯) : আর ভাববাদ বুর্জোয়া দর্শনেরই অঙ্গ। বুর্জোয়া শিল্পীরা নিজেদের দেউলিয়াপনা ও দাসত্বের সাফাই হিসাবে 'আর্টের জন্যই আর্ট' ধুয়ো তুলে থাকেন। এই নিছক সৌন্দর্যচেতনা ঐ বস্তা পচা বুলিরই অপভ্রংশ মাত্র।

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু

সাহিত্যে কাব্যে বিচার্য হলো বিষয়বস্তু বা ভাব এবং প্রকাশভঙ্গী বা আঙ্গিক। বিষ্ণুবাবুর মতে, সমালোচনার কর্তব্য হচ্ছে ঐ বিশেষ স্তরের প্রক্রিয়ার ফর্ম পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাৎ বিষ্ণুবাবু সাহিত্য বিচারে ফর্মকে প্রাধান্য দিতে চান, কনটেন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফর্মের বিচার করতে চান। শিল্পবিচারে মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়—ফর্ম ও কনটেন্টকে আলাদা করে দেখেন বলেই বিষ্ণুবাবু এই দাবি করেছেন।

আসলে কিন্তু কন্‌টেন্টরই বাহন হলো ফর্ম বা টেকনিক। তাই কটন্‌টেন্টকে বাদ দিয়ে ফর্মের বিচার চলে না। উন্নততর ফর্মের জন্য সংগ্রাম নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু সে সংগ্রাম কন্‌টেন্টকে আরও সুষ্ঠুভাবে, আরও ভালো ও কার্যকরভাবে প্রকাশের প্রয়োজনেই। মানুষ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উৎপাদনের উন্নততর টেকনিকের জন্য সংগ্রাম করে। তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রেও উন্নততর টেকনিকের জন্য সংগ্রাম বক্তব্যকে আরও কার্যকরভাবে জনমানসে সঞ্চারিত করার প্রয়োজনেই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কসবাদী সমালোচনা ফর্ম ও কন্‌টেন্টের বিচার করে, মূল্য নিরূপণ করে।

বুর্জোয়াদের ভাবের ঘর আজ দেউলে হয়ে গেছে। সুতরাং ফর্মই তাদের একমাত্র উপজীব্য।

সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিলিপি নয়, জীবনের সমালোচনা। সাহিত্যে রূপ পায় সমকালের সামাজিক সত্য, অনুরণিত হয় আগামী কালের প্রাণস্পন্দন।

আজকের সামাজিক সত্য হলো এই যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তিমকাল উপস্থিত। বিপ্লবের শক্তি সংহত। আর আগামীকালের প্রাণস্পন্দন হলো বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ। (না, 'অবান্তর আশার দ্বারা উত্তেজিত করা' নয়— এই সত্য) বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের পক্ষে এই সত্যকে রূপ দেওয়ার অর্থ নিজেদের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা। সেই জন্যই তাঁরা আজকের সামাজিক সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের ফর্ম তাই সত্য গোপনের ফর্ম। এই ফর্মের চটকদার নামাবলী পরে তাঁরা নিজেদের দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন। একথা বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্পর্কেও সত্য। একটা সর্বাধুনিক নমুনা দিচ্ছি :

> "বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই, প্রাণ এক ছিটে
> না জানি কি অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
> স্বর্গহীন লুসিফর, বিলজেবব ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
> থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে, কাঁকরে, অভ্রে, লাইমে গ্রানিটে
> নিরন্ন নীরস নগ্ন, শুষে খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
> একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটের আভাস
> শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস"

(সাহিত্য পত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৫)

এ কবিতার যদি কোনো বক্তব্য থেকে থাকে—তা নৈরাশ্য। পাছে জনসাধারণ বিষ্ণুবাবুর এ নাকি কান্না গ্রহণ না করতে পারে এই জন্যই বিষ্ণুবাবু ফর্মের দেয়াল তুলে আত্মরক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ফর্ম হচ্ছে জনতাকে কাব্য থেকে বঞ্চিত করে রাখার ফর্ম। এই ফর্ম অ-গণতান্ত্রিক।

সোভিয়েত সঙ্গীত সম্পর্কে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে 'ফর্মালিজমকে অ-গণতান্ত্রিক এবং 'জনবিরোধী বলে বর্ণনা করা হয়েছে (Masses & Mainstream, April, 1948 দ্রষ্টব্য)। অ-গণতান্ত্রিকের মতো একটি রাজনৈতিক শব্দ ব্যবহারের একটু তাৎপর্য আছে।

গল্প-কবিতার যে একটা বক্তব্য আছে, সাহিত্যের 'কনটেন্ট' যে উদ্দেশ্যমূলক একথা আজ বুর্জোয়া সমালোচকদেরও মেনে নিতে হয়েছে। প্রগতিমূলক সমালোচনার কাছে এ হলো বুর্জোয়া সমালোচনার পশ্চাদপসরণ। পিছু হটে, তাঁরা তাই সুকৌশলে পেছন থেকে পাল্টা আক্রমণের প্রয়াস পেয়েছেন ; এখন আঁকড়ে ধরেছেন ফর্মকে। ফর্মকে তাঁরা শ্রেণী নিরপেক্ষ যুগ নিরপেক্ষ বলে চালাবার চেষ্টা করছেন।

সমাজনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের কাছে সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে বুর্জোয়া এবং তাদের দালাল দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্টরা সামাজিক ফর্মকে যুগ নিরপেক্ষ শ্রেণী-নিরপেক্ষ (absolute) এবং চিরন্তন বলে দাবি করছে।

আজ যখন সামাজিক কনটেন্ট হিসাবে সোশ্যালিজমকে অস্বীকার করা যায় না তখন তাঁরা সমাজের ফর্মকে অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে নির্বিশেষ এবং চিরন্তন বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় তাঁরা এখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ফর্ম—নির্বাচন এবং পার্লামেন্টারি কার্যক্রম মারফত সমাজতন্ত্রের ধ্বনি তুলছে। এটা পেছনের দরজা দিয়ে প্রতিক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখবার কৌশল। কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র নির্বিশেষ কিছু নয়, শ্রেণী সমাজের বুর্জোয়া স্তরের ফর্ম। এই ফর্ম মারফত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ফর্মকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আসলে বুর্জোয়া সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। দেশে দেশে দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকায় এ-সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছেও। ফর্মের শ্রেণী নিরপেক্ষ যুগ নিরপেক্ষতার ধ্বনি কনটেন্টের শ্রেণী নিরপেক্ষতার ধ্বনিরই নবরূপ।

আসলে ফর্ম বা কনটেন্ট কোনোটাই শ্রেণী নিরপেক্ষ, যুগ নিরপেক্ষ নয়। সমাজের কনটেন্ট বদলেছে বলেই তার ফর্মও বদলানো দরকার হয়ে পড়ছে।

বুর্জোয়া ফর্মকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ এই কনটেন্টকে ব্যর্থ (negate) করা। রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা এই কৌশলই গ্রহণ করছে।

সাহিত্য শুধু জীবনের প্রতিফলন নয়, শুধু নিষ্ক্রিয় সমালোচনা নয়, বিষ্ণুবাবুরই ভাষায় তারও একটা চালনা শক্তি আছে আর তাইতো সাহিত্য শ্রমিকশ্রেণীর হাতে বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া সমালোচকরা তাই ফর্মের জটিলতাকে সাহিত্যের উৎকর্ষের একমাত্র নিরিখ বলে প্রচার করে, সাহিত্যিকদের বিভ্রান্ত করে এই হাতিয়ারকে ভোঁতা করে দেবার প্রয়াস পায়। বিষ্ণুবাবু প্রগতির জন্য যতই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুন না কেন, তিনিও এই ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন।

মার্কসবাদীরা ফর্মকে তুচ্ছ করেন না। কিন্তু 'অ-গণতান্ত্রিক' ফর্মের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বক্তব্য উপস্থিত করা যায় না। গণতান্ত্রিক বক্তব্য জনসাধারণের কাছে যাতে আরও কার্যকর ভাবে উপস্থিত করা যায়, তদুপযোগী ফর্ম আয়ত্ত করার জন্য মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সাধনা করবেন, আপ্রাণ নিষ্ঠায় সাধনা করবেন। তাঁদের সে সাধনা ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাব গোপনের জন্য নয়।

ফর্ম বিচারেরও তা হলে একটা মার্কসিস্ট মান আছে। তা হলো সেই বিশেষ কনটেন্টকে সেই বিশেষ বিশেষ ফর্ম প্রকাশ করতে পেরেছে কি না। কারণ মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্যই ভাষার সৃষ্টি করেছে, ভাব গোপনের জন্য নয়।

এইভাবে দেখতে গেলে একমাত্র মার্কসবাদেরই শিল্প-সাহিত্য বিচারের একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে, যদিও ক্রোচের মতো মার্কস 'ঈস্থেটিকস' নামধেয় কোনো পুস্তক রচনা করেননি। 'নিছক সৌন্দর্য চেতনা' একটা ভাওতা মাত্র, কারণ বিষ্ণুবাবুর 'নিছক সৌন্দর্য চেতনায়' যে-লেখক শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধদেববাবুর 'নিছক সৌন্দর্য চেতনায়' সে লেখক নিকৃষ্টতম বলে প্রতীয়মান হলে তাঁর ওপর দোষারোপ করা চলে না।

মার্কসীয় সমালোচনার মানদণ্ড কি? এঙ্গেলসের একটি সমালোচনা আমি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করব:

"বর্ণনার যাথার্থ্যের উপরেও যথাযথ (typical) চরিত্রকে তার যথাযথ পারিপার্শ্বিকে উপস্থিত করাই আমার মতে 'রিয়ালিজমে'-র অর্থ। আপনি যতখানি বর্ণনা করেছেন তাতে আপনার চরিত্রগুলিকে যথাযথ চরিত্র বলা চলে।

তাদের পারিপার্শ্বিক, যা তাদের ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে কিন্তু ওকথা বলা চলে না। 'শহরের মেয়ে'-তে শ্রমিক শ্রেণীকে মনে হয় নিষ্ক্রিয় জনতা, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে এমন কি দাঁড়াবার চেষ্টা করতেও তারা অক্ষম। শোচনীয় দারিদ্র্য থেকে উদ্ধারের চেষ্টা হলো বাইরে থেকে, উপর থেকে। ১৮০০ বা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, সাঁৎ সিমেঁ। ও রবার্ট আওয়েনের কালে এ বর্ণনা হয়ত সত্য বলে গ্রহণ করা যেত; কিন্তু ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, যে মানুষ পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করছে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীরই দায়িত্ব এই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তার পক্ষে এই বর্ণনা সত্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। চারিপাশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সাড়া, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার অর্জনের জন্য তাদের সচেতন বা অর্ধসচেতন প্রাণাত্মক প্রয়াস আজ ইতিহাসের অঙ্গীভূত সুতরাং রিয়ালিজমের ক্ষেত্রে তার একটা দাবি নিশ্চয়ই আছে।

"লেখকের সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের গুণগানের জন্য খাঁটি সমাজবাদী উপন্যাস, আমরা জার্মানরা যাকে বলি tendenzroman, না লেখবার জন্য কোনো দোষ ধরছি না। আমার বক্তব্য মোটেই তা নয়। বরং লেখকের মত প্রচ্ছন্ন থাকলেই সাহিত্যের উৎকর্ষতা বাড়ে। আমি যে রিয়ালিজমের কথা বলছি, লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও (তার রচনায়) তা বেরিয়ে আসতে পারে।"

(মার্গারেট হার্কনেসের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি ;
লিটারেচার অ্যাণ্ড আর্ট, মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃঃ ৪১ ও ৪২)

'শহরের মেয়ে' মার্গারেট হার্কনেস প্রণীত একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের এঙ্গেলসকৃত সমালোচনাকে মার্কসবাদী সমালোচনার আদর্শ বলা যেতে পারে। এঙ্গেলস দাবি করছেন, লেখককে বাস্তবানুগ হতে হবে, বাস্তবতার সংজ্ঞাও তিনি নির্দেশ করেছেন: বর্ণনার যাথার্থ্যের উপরেও, যথাযথ চরিত্রকে তার যথাযথ পারিপার্শ্বিকে উপস্থিত করাই আমার মতে রিয়ালিজমের অর্থ।

এই হলো মার্কসবাদী সমালোচনার মূলসূত্র। এই কষ্টিপাথরেই 'শহরের মেয়ে'-র সমালোচনা করে এঙ্গেলস উক্ত উপন্যাসের ত্রুটি নির্দেশ করে বলেছেন, 'শহরের মেয়ে'-তে শ্রমিকশ্রেণীকে মনে হয় নিষ্ক্রিয় জনতা এবং সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিকভাবে আর নিষ্ক্রিয় দর্শক নেই সুতরাং

হার্কনেসের বাস্তবতা সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। এঙ্গেলস উক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে চরিত্রগুলির পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে ও কথা খাটে না।

বিষ্ণুবাবু বালজাকের কথা তুলেছেন। এঙ্গেলস ঐ একই সূত্র অনুযায়ী বালজাকের সমালোচনা করেছেন: "সাধারণভাবে, বাস্তব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের জন্য বালজাক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।" (মার্ক্স)—এই জন্যই মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন বালজাককে মহৎ স্রষ্টা বলেছেন—তাঁর রাজতন্ত্রী মতবাদের জন্য নয়।

এঙ্গেলস লিখেছেন: "রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে বালজাক একজন রাজতন্ত্রী (legitimist)। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় নিরন্তর অনুরণিত হয়েছে সু-সমাজের অ-প্রতিকার্য ক্ষয়ের বিষাদগাথা। যে শ্রেণীর ধ্বংস অনিবার্য বালজাকের সহানুভূতি তাদের দিকে।" (লিটারেচর এ্যণ্ড আর্ট—মার্ক্স ও এঙ্গেলস ; পৃঃ ৪৩) কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির জন্য এঙ্গেলস বালজাকের প্রশংসা করেন নি। বালজাককে তিনি মহৎ স্রষ্টার আসন দিয়েছেন এইজন্যেই যে তা সত্ত্বেও, যখন যাদের প্রতি তিনি সুগভীর সহানুভূতিসম্পন্ন সেই 'নোব্‌ল্‌'দের চরিত্র অঙ্কিত করেন তখনকার মত তাঁর ব্যঙ্গ আর কখনও তত তীব্র হয় না। তাঁর বিদ্রূপ আর কখনও তত নির্মম হয়ে ওঠে না। আর একমাত্র যাঁদের সম্পর্কে তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁরা হলেন তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী, Cloitre Saint Mer'y-র সাধারণতন্ত্রী বীরবৃন্দ। সেই সময়ে (১৮৩০-৩৬) তাঁরা সত্যই ছিলেন জনতার প্রতিনিধি।

"এইভাবে বালজাক যে তাঁর নিজের শ্রেণী সহানুভূতি ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি যে তাঁর প্রিয় নোবলদের পতনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের ভাগ্যে এছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি যে ভবিষ্যতের সত্যকারের মানুষদের (তখন একমাত্র যাদের দেখা গিয়েছিল) দেখেছিলেন—আমি একেই রিয়ালিজমের সর্বাপেক্ষা বড় জয় বলে মনে করি আর এই হল প্রবীণ বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।" (ঐ, পৃঃ ৪৩)

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বালজাকের লেখায় রাজতন্ত্রী, প্রভুদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। সে ঘৃণার ছিল একটা সক্রিয়

ভূমিকা আর তাই এঙ্গেলস বালজাকের সাহিত্যে রিয়ালিজমের সর্বাপেক্ষা বড় জয় দেখতে পেয়েছেন। এঙ্গেলসের এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যেই মার্কসবাদী সমালোচনার মূলসূত্র বিবৃত হয়েছে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-তারাশঙ্করের সাহিত্য এই নিরিখেই বিচার করতে হবে। অচিন্ত্যের চাষী চরিত্রগুলি কি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র? তার পারিপার্শ্বিকতা কি যথাযথ? অচিন্ত্য-তারাশঙ্করের চাষী চরিত্রগুলি কি 'শহরের মেয়ে'র শ্রমিক চরিত্রের মতই নিষ্ক্রিয় এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম নয়? অচিন্ত্যের লেখায় কি 'রাজনৈতিক সংস্কার' সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় শাসকশ্রেণীর পতনের প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে? এই মার্কসবাদী নিরিখে বিচার করলে যদি অচিন্ত্যের গল্প উৎরাত তাহলে হাকিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রগতিশীল বলতে আমরা এতটুকুও দ্বিধা করতাম না। মার্কসবাদীরা ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী নয়।

বালজাক তাঁর সাহিত্যে নিজের রাজনৈতিক মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন আর অচিন্ত্য প্রচার করেছেন বুর্জোয়া প্রভুদের মিথ্যাচারকে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর জবাবে নীহার দাশগুপ্ত ঠিকই লিখেছিলেন—"সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে গল্পচরিত্রের এই বিচার ও বিশ্লেষণের অভাব একদিকে অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্ট গল্পচরিত্রকে যেমন নিষ্প্রাণ ও সেইহেতু অবাস্তব করে তুলেছে, অন্যদিকে তার এই "অ-জ্ঞান" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বচ্ছতা দিতে পারে নি, তাঁর গল্পচরিত্রকে যথার্থ ও সুষ্ঠু পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে দেয় নি। এক এক সময় তাঁর এই আবিল দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপ্রাপ্ত কাঠ-খড়-কেরোসিনের গল্পে একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে বাধ্য। শঙ্কার কারণ শুধু তাঁর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য নয়। পাঠক সাধারণকে বিভ্রান্ত করার সু-কৌশলের জন্য। মঙ্গল চাপরাসী, রমজান বা হাস্য বিবির মত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে সমস্ত সমস্যাকে তিনি বিকৃত ও অসৎভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। (পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৪)

এ প্রসঙ্গে যা প্রণিধান করা দরকার তা হল এই যে অচিন্ত্যের এই অসৎ প্রয়াস আকস্মিক নয় মোটেই। যুগ পালটেছে—এখন আর রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে সাহিত্য-দর্শনের 'আপাত বৈপরীত্য' সম্ভব নয়। লেনিনের ভাষায় এখন এমন একটা যুগ এসেছে যখন 'থিয়োরী' 'প্রাকটিশে' পরিণত হচ্ছে। রাজনীতির মত, এখন আর সাহিত্যেও নিরপেক্ষতার কোনো ভূমিকা নেই।

এই জন্যই নিজের উদার গান্ধীবাদ (কালিন্দী, গণদেবতা, মন্বন্তর) ছেড়ে দিয়ে তারাশঙ্কর জনতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় একথা বলা যায়। তাতে যদি কারো প্রাণে ব্যথা লাগে তো নাচার !

বিষ্ণুবাবু মনে করেন যে, জনতাকে 'সাহিত্যভাত' করাই প্রগতির চরম বিচার। সাহিত্যে 'নিছক সহানুভূতি' (!) বা 'অবান্তর' (?) আশার দ্বারা উত্তেজিত করা, বা 'রাজনৈতিক কাঠামো' থাকার প্রয়োজন নেই। সহানুভূতির প্রশ্ন নয়—শ্রমিকশ্রেণী কতিপয় উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীর 'সহানুভূতি'র কাঙাল নয়। কিন্তু আজ রাজনীতি ছাড়া জীবন নেই। পেটভরে খেতে চাইলে বা ভাল করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলে আজ স্থান হয় জেলখানায়। সুতরাং নিজের দায়েই সাধু বুদ্ধিজীবীকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এ-কোন বিশেষ দলের প্রচার নয়—বিষ্ণুবাবুর দুর্ভাগ্য এই যে, এটাই আজকের দিনের বাস্তব সত্য। তা ছাড়া বিষ্ণুবাবুর সংজ্ঞা মেনে নিলে 'জাতীয়' টি-ইউকেও বিপ্লবী সংস্থা বলতে হয় আর তাহলে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট—কারণ সুরেশবাবু এবং জাতীয় টি-ইউ শ্রমিক নিয়েই বেসাতি করেন। বিষ্ণুবাবুর এই ব্যাপক সংজ্ঞা মোটেই নির্দোষ ঔদার্য নয়—প্রতিক্রিয়াকে পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকাবার কৌশল মাত্র। এই জন্য শুধু অচিন্ত্য-তারাশঙ্কর নয়, বিষ্ণুবাবু এলিয়টের মধ্যেও 'জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ' দেখতে পেয়েছেন। সেই জন্যই বলছি, তারাশঙ্করকে বিষ্ণুবাবু শ্রদ্ধা করতে চান করুন, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে হেমিংওয়ের তুলনা করতে চান (কারণ প্রগতি বিচারের শেষ মাপকাঠি তো আর হেমিংওয়ে নন) আপত্তি করব না—কিন্তু এদের রচনা প্রগতিশীল বলে চালাবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুবাবু তাঁর ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাকেই সমালোচনার মান ধরে নিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত নন তাঁদের মধ্যেই তিনি 'লাসালী ভ্রম' ও 'ডুরিং-এর বিচ্যুতি' দেখতে পেয়েছেন। বুর্জোয়া ধারার সমালোচনার এই সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ 'নিছক সৌন্দর্যানুভূতি' মানুষে মানুষে প্রভেদ হবেই।

অসাধুভাবে সম্পাদিত মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি সাজিয়ে প্রতিপক্ষদের নস্যাৎ করবার চেষ্টার মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, মার্কসবাদ নেই। শিল্প-বিচারের কোনো মার্কসীয় নিয়ম কানুন নেই—বিষ্ণুবাবুর এই দাবির সঙ্গে যদি কারো মতবাদের সামঞ্জস্য থাকে তবে তা ট্রট্স্কীর। ট্রট্স্কী বলেন : "এ

কথা অত্যন্ত ঠিক যে শিল্পকর্ম গ্রহণ বা বর্জন করা সম্পর্কে সব সময় মার্কসবাদী নীতি অনুসরণ করে চলে না। প্রথমত শিল্পকর্মের বিচার করতে হবে তার **নিজের নিয়মে** অর্থাৎ **আর্টের নিয়মে** (বড় হরফ আমার)। [লিটা-রেচার এণ্ড রেভল্যুশন, পৃঃ ১৭৯]

এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে তাঁরা অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছেন। এই উগ্র মতবাদ সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। কারণ সাহিত্য বিচারে সাহিত্য বস্তুই প্রধান বিবেচ্য—লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন, রাজনীতি বা পারিপার্শ্বিকতা বিচারের প্রয়োজন নেই। বিষ্ণুবাবুর মতে এই ধরনের বিচার গোয়েন্দাগিরির সামিল। এই ধরনের বিচার যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিচার। কারণ শিল্প সাহিত্যেরও একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। ইত্যাদি।

সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে উগ্রতার অপবাদ এই নতুন নয়—সুতরাং তার জবাব দেওয়া বাহুল্য। বিষ্ণুবাবু মাণিকবাবুদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিকতার অপরাধ যত তারস্বরেই প্রচার করুন না কেন—সাহিত্য বিচারে সাহিত্য বস্তুই প্রধান বিষ্ণু-বাবুদের এ তত্ত্ব বুর্জোয়া বুলি। কডওয়েল বলেন:

"ধরে নেওয়া হয় যে, উপায়, টেকনিক এবং শিল্পের যে সব 'শুদ্ধ' (abstract) গুণাবলীকে শিল্পী নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তার সবগুলিকে যখন বিশ্লিষ্ট করে তত্ত্বে পরিণত করা হয় তখনই আর্টকে তার **নিজের ভাষায়** (বড় হরফ আমার) বর্ণনা করা হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদের যা স্থান, তত্ত্বের দিক দিয়ে ঈসথেটিকসের ক্ষেত্রে এই মতেরও সেই একই স্থান।"

(ইলিউসন এণ্ড রিয়ালিটি, ভারতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯)

মার্কসবাদ বলে সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য দেহহীন প্রাণের মতই মিথ্যা। শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সে ইতিহাসও সমাজ-নিরপেক্ষ স্বয়ম্ভূ নয়।

'ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'র ভূমিকায় মার্কস বলেছেন:

"বাস্তব জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণ ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।"

শিল্প-সাহিত্য আকাশকুসুম নয়, মানসকুসুম। এই ভাবজগত, "ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি যা বহু শূন্যে বিচরণ করে" (এঙ্গেলস) তার সঙ্গে অনেক সময় হয়ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—কিন্তু তাতে

বিষ্ণুবাবুর পুলকিত হবার কোনো কারণ নেই। ঐ একই নিবন্ধে এঙ্গেলস বলেছেন, "কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি) নিজেরাই অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবল প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত।" (আর্ট এণ্ড লিটারেচার—মার্কস-এঙ্গেলস, পৃঃ ১১)

অর্থনৈতিক বিবর্তনে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভাবজগতও তাই শ্রেণীচেতনার বশীভূত। শিল্প-সাহিত্য এই ভাবজগতেরই অঙ্গীভূত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্যেও তাই শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পায়। লেখক কোন্ শ্রেণীভুক্ত সাহিত্য বিচারে তা জানা প্রয়োজন, তা গোয়েন্দাগিরি নয়। শিল্প-সাহিত্যের যে নিজস্ব ইতিহাস আছে তা আলোচনা করলেও এই কথাগুলিই প্রকট হয়ে উঠবে (কডওয়েল এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখই যথেষ্ট। কারণ স্বল্প পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়)। শেকসপীয়রের রচনাতেও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনদর্শনই আত্মপ্রকাশ করেছে।

সাহিত্য মাত্রেই লেখকের জীবন-দর্শন প্রতিভাত হয়। দর্শনের দলীয়তা সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন :

"উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দর্শনের ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া যুগে এ কথা আরও সহজে প্রমাণ করা যায়। হব্স হচ্ছেন প্রথম আধুনিক (অষ্টাদশ শতকের অর্থে) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। কিন্তু তিনি এমন একটা সময় স্বৈরতন্ত্রবাদী (absolutist) হয়েছিলেন যখন সারা ইওরোপে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগ, যখন ইংল্যাণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র বনাম জনসাধারণের সংগ্রামের সূচনা হচ্ছে। লক্ হচ্ছেন ধর্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেণী সমঝওতার সন্তান।"

(পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১ পৃঃ)

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রেণীচেতনা নিরপেক্ষ কোনো দর্শন নেই—সাহিত্যও থাকতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, সাহিত্য কোনো না কোনো শ্রেণীর পক্ষে প্রচার অর্থাৎ সাহিত্য মাত্রই পার্টিজান। সুতরাং সাহিত্য বিচারেও তৃতীয় পক্ষ বলে কোনো ভূমিকা নেই। বিপ্লবী সাহিত্যকে ধিক্কার দেবার জন্যই বুর্জোয়া সমালোচকেরা 'তৃতীয় পক্ষ' সেজে থাকেন।

রাজনীতির মতো, সাহিত্যক্ষেত্রে যখন প্রতিক্রিয়ার পক্ষে প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন বুর্জোয়া দালালেরা দল-নিরপেক্ষতার ধ্বনি তোলেন। তাঁদের

উদ্দেশ্য প্রগতির পক্ষে প্রচারকে নিরস্ত্র করা। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তারা পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেন। এই সুকৌশল পাল্টা আক্রমণ আসে নানাভাবে—নৈরাশ্য প্রচার করে (যেমন এলিয়ট) বুর্জোয়া সাহিত্যিকেরা বিপ্লবী শক্তিকে নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করেন। তারা বোঝাবার চেষ্টা করেন প্রতিক্রিয়ার শক্তি এত বেশি যে তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়; বা অলীক মোহ সৃষ্টি করে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে জনতার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেন—জনতার বিপ্লবী উদ্যোগ নষ্ট করার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করেন আপনা আপনিই বিপ্লব জয়যুক্ত হবে এমন কি অনেক সময় স্থানে অস্থানে মাদুলীর মতো বিপ্লবী বাক্য জুড়ে দিয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যকে উপাদেয় করে তুলবার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে 'জীবনের অঙ্গীকারের কোনো ছন্দই নেই, এঁরা তৃতীয় পক্ষও নন—এঁরা প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।

এই 'তৃতীয় পক্ষ' সুলভ সমালোচনা কতটা বন্ধ্যা, বিষ্ণুবাবুকৃত 'An Acre of Green Grass'-এর সমালোচনাই তার সাক্ষ্য। বিষ্ণুবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের দান মার্জিত রুচি, শালীনতাবোধ ইত্যাদি। বিষ্ণুবাবু লিখেছেন, "কবি রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা ও রোমান্টিক বিদ্রোহের তেজ ও পুনর্নির্মাণের শক্তি, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁরই দান। সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন **নিছক** সৌন্দর্যচেতনা (বড় হরফ আমার) এই প্রাথমিক অঙ্গীকারও রবীন্দ্রনাথে হলো প্রথম প্রতিভাত।" বিষ্ণুবাবুর মতে রবীন্দ্র-প্রতিভা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ'—প্রায় কোনো প্রাকৃতিক (ভগবানের) মাহাত্ম্যের মতো। বলাবাহুল্য, বিষ্ণুবাবুর এই সার্টিফিকেটে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা হানি করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত গলদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিদ্রোহকে তুচ্ছই করা হয়েছে।

বুর্জোয়া সমালোচনার দুর্বলতাই এখানে—তাঁরা নিজেদের অতীতের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সাহিত্যের আয়নায় দেখতে ভয় পায়। সেইজন্য তারা শেকসপীয়রের বিদ্রোহকে উড়িয়ে দিয়ে, মহাকবিকে ভ্রষ্ট করে দেবতার আসন দিয়ে শূন্যচারী করে রাখেন। বুর্জোয়া সমালোচনার আর একটি দিক হলো, আসল কথা এড়িয়ে খুঁটিনাটি সমালোচনায় ব্যাপৃত থাকা। বিষ্ণুবাবুর উক্ত সমালোচনাতেও দেখি বাক্যগঠনের ভ্রান্তি নিয়ে বিরক্তিকর দীর্ঘ আলোচনা; দেখি ধান ভানতে শিবের গীত—'মানিকবাবুদের' বিরুদ্ধে অকারণ গঞ্জনা।

বুর্জোয়াদের অপর ধর্ম মিথ্যাচার। বিষ্ণুবাবু ব্যতিক্রম নন। সেই জন্যই

নিজের বুর্জোয়া বক্তব্যকে মার্কসবাদী বলে চালাবার উৎসাহের আধিক্যে এঙ্গেলসের বাক্যাংশ অসাধুভাবে ব্যবহার করতেও বিষ্ণুবাবুর বাধেনি। এঙ্গেলসের যে উদ্ধৃতিটির কথা আমি বলছি সেটি নিম্নরূপ :

"As to the realms of ideology which soar still higher in the air, religion, philosophy etc. these have a prehistoric stock found already in existence and taken over in the historic period of what we should today call bunk." (লিটারেচার অ্যাণ্ড আর্ট, মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃঃ ৬)। বিষ্ণুবাবু কিন্তু prehistoric-এর পরই ফুলস্টপ বসিয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন। দর্শনের দলীয়তা প্রসঙ্গে এই নিবন্ধটিরই পরের অংশ আমি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এ-থেকেই দেখা যাবে যে, এঙ্গেলস যে অর্থে এটা লিখেছিলেন বিষ্ণুবাবু ঠিক তার বিপরীত অর্থে উদ্ধৃতিকে ব্যবহার করেছেন। আর এইভাবেই বিষ্ণুবাবু তাঁর অ-মার্কসীয় বক্তব্যকে মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি ভূষিত করেছেন।

বিষ্ণুবাবুর এই মহান প্রচেষ্টার তাৎপর্য খুবই সোজা। আজকের বাজারে 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই বস্তাপচা বুলির কাটতি হওয়া সম্ভব নয়—তাই মার্কসীয় চিনির প্রলেপ দিয়ে এই রদ্দি মাল কাটাবার চেষ্টা। কিন্তু এই ধরনের সৎ প্রচেষ্টা এই নতুন নয়—মার্কসবাদকে ভদ্রস্থ করার এবংবিধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন :

"তাঁদের (বিপ্লবীদের) মৃত্যুর পর অবশ্য সাধারণত তাঁদের নির্বিষ সাধু বানিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়, সেইভাবে তাঁদের গুণগান করা হয় এবং নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি 'সান্ত্বনা' এবং ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে খানিকটা অপ্রাকৃত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁদের নাম ব্যবহার করা হয়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বিপ্লবী তত্ত্বের সারমর্মকে নিবীর্য ও বিকৃত করে তার বিপ্লবী ধার ভোঁতা করে দেবার চেষ্টা হয়।" (স্টেট অ্যাণ্ড রেভল্যুশন, পৃঃ ১)

যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন না কেন, বিষ্ণুবাবু তৃতীয় পক্ষ নন, তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধ পক্ষ, তিনি একজন বুর্জোয়া ভাববাদী। এই জন্যই তিনি মার্কসবাদ সংশোধন করার চেষ্টা করেন, মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে দেবার প্রয়াস পান। এই জন্যই যান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর (বুদ্ধদেব বসুর) প্রতিবাদ 'বিষ্ণুবাবু'র সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। এই জন্যই শুধু অচিন্ত্য নয় এলিয়টের মধ্যেও তিনি জীবনের অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ

দেখতে পান। এই জন্যই তাঁর কলা-কৌশল কাব্য থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কৌশল! বিষ্ণুবাবু এবং তাঁর সমধর্মীরা নানা রকমের ইজমের ধূয়োর ফর্মের পাঁচিল তুলে সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীতকে জনসাধারণের নিষিদ্ধ এলাকা করে রাখার জন্য চেষ্টিত। আর এই জন্যই লেনিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—ফিউচারইজম, কিউবইজম ও অন্যান্য ইজমের ফলকে আমি শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে বিবেচনা করতে পারি না। (লেনিন অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচার, এ. ভি. লুনাচারস্কি সম্পাদিত, পৃঃ ৪২)

'ব্যক্তিনিরপেক্ষ সাহিত্য বিচার,' 'দলীয়তাহীন বুদ্ধি,' 'নিছক সৌন্দর্য-চেতনা' ইত্যাদি বুলির মধ্য দিয়ে বিষ্ণুবাবু সেই অতি পুরাতন বুর্জোয়া তত্ত্ব—আর্টের জন্যই আর্ট—পরিবেশন করেছেন। সেই জন্যই বুদ্ধদেব বসু উপলক্ষ হলেও, বিষ্ণুবাবুর আক্রমণের লক্ষ্য মানিকবাবুরাই। বিষ্ণুবাবু মার্কসিস্ট নন, মার্কসবাদের শিবিরে প্রতিক্রিয়ার ট্রোজান অশ্ব।

'সৃষ্টির স্বাধীনতা,' 'শিল্প-সাহিত্যে আজ ব্যক্তি রচয়িতাই প্রাথমিক,' 'এই অনেক মানুষের পথে আজও ওঅন-ওয়ে ট্রাফিকের নিয়ম চলে না—কি দক্ষিণে কি বামে' ইত্যাদি কথার ফুলঝুরি কেটে বিষ্ণুবাবু যা দাবি করছেন, তা হলো সাহিত্যিক Laissez fare, যা খুশী করার স্বাধীনতা। লেনিনের ভাষায়ই বিষ্ণুবাবুদের এই দাবির জবাব দেব—"বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদী ম'শায়েরা, আমরা আপনাদের জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাদের নির্বিশেষ স্বাধীনতার বুলি ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" (লেনিন অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটরেচার, পৃঃ ৪৬)

জনগণ বিষ্ণুবাবুর কাছে 'এ্যাবস্ট্রাকসন' হতে পারে—কিন্তু জনগণ কারোরই পকেটবরোর সম্পত্তি নয়—বিষ্ণুবাবু, বুদ্ধদেব বা সজনীচক্রের তো নয়ই এমন কি 'মানিকবাবুদের'ও নয়। বরং 'মানিকবাবুরাই' জনসাধারণের সম্পত্তি। 'আর্ট জনসাধারণের সম্পত্তি।' জনতার মর্মস্থলে আর্টের শিকড় প্রসারিত করতে হবে। তাঁদের ভাবনা-কামনা অনুভূতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, তাঁদের উন্নীত করতে হবে।

সাহিত্যের একটা 'চালনা শক্তি' আছে বিষ্ণুবাবুও তা স্বীকার না করে পারেন নি। আর এই জন্যই তো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্য কোন-না-কোন শ্রেণীর হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেই জন্যই লেনিন বলেছিলেন,—"সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতি-মানবদের পতন হোক। সাহিত্যকে হতে হবে শ্রমিক আন্দোলনের

অংশ,, সমগ্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন পুরোগামীরা সমগ্র সমাজযন্ত্রে যে গতির সঞ্চার করেছেন সাহিত্য হবে তার অঙ্গীভূত।" (লেনিন অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচর, পৃঃ ৪৭)

কিন্তু মানিকবাবু এতখানিও দাবি করেন নি। মানিকবাবু শুধু প্রশ্ন করেছেন: "তে-ভাগা আন্দোলন নাই বা এল গল্পে ··মুখ বুজে অত্যাচার না সয়ে গিয়ে চাষী মেয়ে-পুরুষ আজ সচেতন ভাবে সংগ্রাম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই সত্যকে গল্পের মধ্যে কোন আর্টের ধামায় চাপা দেওয়া চলবে?" (পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫৪)। মানিকবাবুর এই অতিমৃদু প্রশ্নেই বিষ্ণুবাবু সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেলা দেখতে পেয়েছেন কিন্তু যেখানে তাগিদটা আদর্শগত দায়িত্বের রজতখণ্ডের নয় সেখানে এটা স্বাভাবিক। রূপোর শিকল গলায় পরে বুর্জোয়াদের পোষা কুকুর বনাই তো দালাল সাহিত্যিকদের কাছে স্বাধীনতার চরম মার্গে বিচরণ।

সৃষ্টির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে, 'কোন বিশেষ দলের' রাজনৈতিক থিসিসকে কাব্যের মধ্যে প্রমাণ করার জন্য কেউই ফরমাস দিচ্ছে না, গল্পের কোন বিশেষ ফর্মুলা তৈরীরও প্রশ্ন আসে না। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী আজ জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে সাহিত্যের হাতিয়ার তার প্রয়োজন। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী তাই ডাক দিয়েছে—"আমাদের সাহায্য করুন, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিন্টার্নকে সাহায্য করুন—সংগ্রামে ব্যবহারের জন্য কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পের আকারে আমাদের হাতে তুলে দিন সাহিত্যের হাতিয়ার।" (ডিমিট্রভ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮১)

না, এ সাহিত্যিক স্পেশ্যাল পাওয়ার্স নয়—এ হলো সাহিত্যিকদের প্রতি সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর আহ্বান। কোন শিল্পী যদি নিজেকে মার্কসবাদী বলে মনে করেন তাহলে শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামকে রূপায়িত করা তাঁর পবিত্র কর্তব্য। মার্কসবাদী দর্শনের প্রতি আপনার নিষ্ঠা যদি আন্তরিক হয় তাহলে আপনার লেখনী নিয়ে এসে দাঁড়ান রণক্ষেত্রে—আপনার দায়িত্ব পালন করুন।

কিন্তু শুধু মার্কসবাদী কেন, প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী শিল্পীর উপরই আজ এই দায়িত্ব বর্তেছে। কারণ শ্রেণীসমাজে, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্য আজ সত্যই শৃঙ্খলিত। মানুষের মনোজগতের উপরও উঁচিয়ে আছে বেয়নেট—ধর্মের, আইনের, বে-আইনি স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের। তাই "বুর্জোয়া

প্রভাবিত স্বাধীন সাহিত্যের ভাওতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি উৎসর্গীকৃত মতবাদের স্বাধীন সাহিত্য প্রয়োজন।" (লেনিন : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৭)। কারণ শ্রমিকশ্রেণীই সেই বিপ্লবের অগ্রদূত যা শ্রেণীসমাজের অবসান ঘটাবে, শিল্প-সাহিত্যকে করবে শৃঙ্খলমুক্ত। যাঁরা মার্কসবাদী তাঁরা এই বিপ্লবীশ্রেণীর অংশ সুতরাং তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশি।

মার্কসবাদ নৈয়ায়িক তর্কের আসর নয়, মার্কসবাদ হলো Guide to action. সুতরাং কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই হয় কে মার্কসবাদী আর কে নয়—রালফ্ ফক্স, কডওয়েল আর আজকের দিনে হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রভৃতি শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করেই নিজেদের মার্কসবাদের প্রমাণ দিয়েছেন—বাগাড়ম্বরে নয়।

বিষ্ণুবাবুর লেখায় এই দায়িত্ব পালনের আগ্রহ তো ফোটেই নি বরং শিল্প-বিচারে মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রয়োজ্য নয় বলে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সমালোচনাকে নিরস্ত্র করার প্রয়াস পেয়েছেন। "সমাজ-বিপ্লবের আগে সাহিত্য-বিপ্লব কল্পনা বিলাস মাত্র" (কেন লিখি, পৃঃ ৬৪) বলে সাহিত্যে সংগ্রামী প্রচেষ্টাকে হতাশায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং বুর্জোয়া উন্মার্গগামিতার 'পবিত্র' অধিকার রক্ষার জন্য সাহিত্যের স্বাধীনতা দাবি করেছেন। সংগ্রামী সাহিত্য রচনার দাবিকে দেখেছেন স্পেশ্যাল পাওয়ার্সের খেল হিসাবে। লেনিন এই তথাকথিত মার্কসবাদীদের সম্পর্কে বলেছিলেন :

"আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি, একদল বিকারগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী এবংবিধ তুলনায় (সাহিত্যক্ষেত্রে মহামানবের পতন হোক শীর্ষক উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) ক্ষেপে গিয়ে অধঃপতনের চরম বলে রব তুলবেন। তাদের ধ্বনি হবে, আইডিয়ার স্বাধীন সংগ্রামের উপর, সমালোচনার স্বাধীনতা, সাহিত্য সৃষ্টির স্বাধীনতার উপর, আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। বস্তুত, এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্যবাদেরই পরিচয় দেবেন।"

এই কথা লেনিন বলেছিলেন ১৯০৫ সালে—রুশিয়ায় সোভিয়েততন্ত্র তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতবর্ষের মতো রুশিয়ার মার্কসবাদীরাও তখন সংগ্রাম করছেন নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়াসে। সুতরাং "মানিকবাবুরা মনে করেন বাঙালী ও সোভিয়েত মন একই ছন্দে চলছে" বিষ্ণুবাবুর এই জয়প্রকাশী উক্তিও লক্ষ্যভ্রষ্ট।

বিষ্ণুবাবুদের ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াকে ব্যর্থ করে প্রগতিবাদীদের জোর অগ্রগতি

হতে হবে—বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাহিত্যের অস্ত্র তুলে দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। ভাবপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত ফর্ম আবিষ্কার করে আপ্রাণ প্রয়াস ও নিষ্ঠায় সে অস্ত্রকে শাণিত করে তুলতে হবে—যেন তা শত্রুর মুখোস ছিঁড়ে দিতে পারে—যেন সে-শিল্প সে-সাহিত্য বেয়নেট হয়ে বাজে শত্রুর বুকে।

বাঙলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সমাজবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইওরোপে অনেকগুলি দেশেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আশু কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নানাজাতের সাম্রাজ্যবাদীদের এটা মনঃপূত নয়। তারা সমাজবাদকে ভয় করে। আমাদের সমাজবাদী দেশ সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের আদর্শস্থল—তাকে তারা ভয় করে। সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দার্শনিক ভৃত্যেরা, তাদের বশংবদ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক, তাদের রাজনীতিক এবং কূটনীতিকেরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা, সমাজবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে, সমাজবাদের কুৎসা গাইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই অবস্থায় সোভিয়েত লেখকের কর্তব্য, শুধু যে প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করা তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা, তাকে আক্রমণ করাও তাদের কর্তব্য।

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় কমরেড জ্দানভের বক্তৃতা, ১৯৪৬)

ভারতীয় মার্কসবাদীদের আত্মসমালোচনার বিবরণীতে লেখা গেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ ছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজ ধরে চলা, পচা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই সংস্কারবাদ এত দীর্ঘকাল ধরে সংগোপনে তার ধ্বংসাত্মক কাজ করে গেছে।

যে তার সর্বনাশা প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে—আন্দোলনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে কলুষিত করে গেছে। সংস্কৃতি আন্দোলনও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের রূপ দাঁড়িয়েছে—বুর্জোয়া 'সংস্কৃতিবিদদের' কাছে নতি স্বীকার, বুর্জোয়াদের কলুষিত ঐতিহ্য সম্পর্কে মোহাচ্ছন্নতা; এক কথায়, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ, বুর্জোয়াদের কলসীর কানার আঘাতের প্রত্যুত্তরে প্রেম বিলোবার প্রবৃত্তি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অনেকখানি এগিয়েছে বটে, কিন্তু সংস্কৃতি আন্দোলন থেকে সংস্কারবাদের ক্ষতিকর প্রভাব এখনও কাটেনি।

সমাজবাদের জন্য সংগ্রামে শিল্প-সাহিত্যের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কমরেড জ্দানভ বলেছেন:

"আমাদের সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং পার্টি সোভিয়েত সাহিত্যের সাহায্যে যুব সমাজকে সাহস এবং আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষিত করতে পেরেছে বলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পথের দারুণ বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করা গেছে। জার্মান এবং জাপানীদের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে।"

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় বক্তৃতা, ১৯৪৬)

উক্ত বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেছেন, এর অন্যথা হলে গত মহাযুদ্ধে সোভিয়েত পক্ষের পরাজয়ই ঘটত।

লেখকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে কমরেড স্তালিন বলেছেন, লেখকেরা হচ্ছেন "মানবাত্মার কারুকর্মী"।

শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই কারণেই যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প-সাহিত্য শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার। যা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী লড়েছেন, লড়বেন তাতেই যদি ঘুণ ধরে—তবে তা যে কি মারাত্মক তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে, সংস্কারবাদের মূল উচ্ছেদ করা, এই মুহূর্তের একটি অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু রোগ সারাবার আগে রোগটি কি তা জানা দরকার। তার উপসর্গগুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন।

বাঙলাদেশে নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অবিসংবাদী মুখপত্র প্রধানত 'পরিচয়'। 'অগ্রণী', 'লোকনাট্য' এবং আরও কয়েকটি ছোটখাটো পত্রিকা এই লড়াইয়ের অংশীদার। এর মধ্যে সরকারের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে (!) সম্প্রতি

'লোকনাট্যে'র কণ্ঠ রুদ্ধ। প্রধানত গল্প-কবিতাই অগ্রণীর উপজীব্য, আর গল্প কবিতা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। সুতরাং অগ্রণী সম্পর্কে আমরা বর্তমানে মোটামুটি নীরবই থাকবো।

যাহোক, এই তিনটি পত্রিকাই নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারক ও বাহক—নব্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃবর্গ এবং কর্মীরা এই পত্রিকাগুলির পরিচালনা ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর মধ্যে 'পরিচয়'ই প্রধান। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে 'পরিচয়ে'র আলোচনাই বেশি স্থান জুড়ে থাকবে।

গত কার্তিক মাস থেকে নব কলেবরে 'পরিচয়' প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নয়, এই রূপান্তরের পিছনে ছিল গুণগত পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি। এই রদবদলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মার্কসবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে 'পরিচয়' শুধু যে বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করবে তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া-সংস্কৃতিকে অস্বীকার করবে, আক্রমণ করবে—বুর্জোয়াদের গলিত সংস্কৃতির জঞ্জালকে বলিষ্ঠ বাহুতে সরিয়ে নব্য প্রাণবন্ত শ্রমিক সংস্কৃতি গঠনে "পরিচয়" হবে অগ্রণী, বুর্জোয়াদের কলুষিত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'পরিচয়' হবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার।

সংস্কৃতি সংকটের রূপ

এইভাবে রূপান্তরিত পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার (কার্তিক, ১৩৫৫) প্রথম প্রবন্ধ "সংস্কৃতির সংকট"। পরিচয় সম্পাদক গোপাল হালদার এই প্রবন্ধে "সংস্কৃতির সংকট" সম্পর্কে মনোজ বসু এবং তারাশঙ্করের বক্তব্যের 'জবাব' দিয়েছেন।

মনোজবাবুর চোখে সংকটটা দেশবিভাগ জনিত—পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতির উপর উর্দু ও হিন্দীর আক্রমণ। আর তারাশঙ্করবাবু সংকট আছে বলেই মানেন না। অর্থাৎ একজন সংকটকে চাপা দিতে চান আর অন্যজনের যুক্তি মূল সংকট থেকে জনতার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে। আর এঁদের দু'জনের যুক্তিই সংকট সমাধানের প্রচেষ্টাকে নিরস্ত্র করে, করে বিপথগামী। সুতরাং নব্য সংস্কৃতির পুরোধা হিসাবে মার্কসবাদীদের অবশ্য কর্তব্য এই যুক্তিজাল ছিন্ন করা। কিন্তু গোপালবাবু কি সে দায়িত্ব পালন করেছেন?

একটা বাঙলা প্রবাদ মনে পড়ল :

কোনো এক গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষুক এসেছে। ভিক্ষে দেওয়া হবে না বলে বাড়ির বৌ তাকে ফিরিয়ে দিল। গৃহিণী তাই শুনে ফের ভিক্ষুককে ডেকে

আনালেন। ভিক্ষুক ভাবল তবে বোধ হয় ভিক্ষে পাওয়া যাবে। কিন্তু গৃহিণী বললেন—ও বাড়ির বৌ, ভিক্ষে দেওয়া হবে কি না হবে তা বলবার অধিকার ওর নেই ; সে অধিকার আমার—আমি বলছি ভিক্ষে দেওয়া হবে না।

গোপালবাবুর জবাবটা ঠিক এই রকমের। অর্থাৎ মনোজ বসু ও তারাশঙ্করের বক্তব্যের সঙ্গে গোপালবাবুর বক্তব্যের কোনো তফাৎ নেই, পার্থক্যটা শুধু যুক্তির।

সংকট অস্বীকৃতির যুক্তি ভাববাদী তারাশঙ্কর দিয়েছেন এই বলে যে, সংস্কৃতির মৃত্যু নেই, আর তা কোনো শ্রেণী বিশেষেরও নয়। আর 'মার্কসপন্থী' গোপালবাবু লিখেছেন :

"বাঙালী সংস্কৃতির এ 'সংকট' আসলে সংকট নয়, বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবী, বাঙালী মজুর-কৃষক-বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কৃতিরূপে বিকাশোন্মুখ, বিকাশোন্মুখ তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবী সংস্কৃতির সঙ্গে মানব মহীরুহের খণ্ডিত শাখায়।"

খুবই চটকদার কথা। আপাতদৃষ্টিতে একে বিপ্লবী সিদ্ধান্ত মনে হলেও এ তারাশঙ্করেরই যুক্তি আর লড়াই এড়িয়ে যাবারই যুক্তি।

কারণ সংকট সত্যিই আছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবসান আরম্ভ হয়েছে—শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছে না। ধনিকের শোষণ শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত—তার অন্তরের আবেগ তাই পুরোপুরি সাহিত্যভাত হতে পারে না। যেটুকুও বা হয় তার উপরও নেমে আসে শাসকের দণ্ড। শোষকের হিংস্র পৈশাচিক হস্ত করে তার কণ্ঠরোধ, বন্ধ হয় শ্রমিক-শ্রেণীর পত্রপত্রিকা, তার সাংস্কৃতিক মুখপত্র হয় রুদ্ধকণ্ঠ, রক্তাক্ত বর্বর হস্ত কেড়ে নেয় তাদের কণ্ঠের গান, তাদের জীবননাট্য। সংস্কৃতিবর্জিত বুর্জোয়া বর্বরেরা সমগ্র মানবসংস্কৃতির বিরুদ্ধেই সুরু করেছে সর্বাত্মক অভিযান। এই হিটলারী অভিযান এমনকি তাদের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথকেও মার্জনা করে না। অন্যদিকে যে সব সংস্কৃতিবিদ শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে এসেছেন তাঁরাও পুরোপুরি শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি, তাই তাঁরাও সে আবেগকে ভাষা দিতে পারছেন না। বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক প্রগতিচিন্তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে, ব্যর্থ করে দিচ্ছে তার আবেদন ; অথচ বুর্জোয়া সংস্কৃতিভাণ্ডার শূন্য, দেয় তার কিছু নেই, আছে শুধু বিকৃতির কদাচার—সংকট এই। অর্থাৎ বুর্জোয়া মতাদর্শ শিল্পের আঙ্গিক এবং রীতি

সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণাই প্রগতি সাহিত্যকে পিছনে টেনে রাখছে। তাই সংকট সমাধানের পথ হলো, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির উপর বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথ। তাই বলছিলাম সংকটের অস্বীকৃতি আসলে লড়াই এড়িয়ে যাবারই যুক্তি।

লড়াই যাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী, সংকটকে চাপা দিতে চান তাঁরাই। অর্থনৈতিক সংকটের অগ্নিগিরির উপর বসেও ট্রুম্যান তাই প্রমাণ করতে চান যে মার্কিন অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথেই চলেছে—বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা পুঁজিবাদের সংকট নেই বলে চিৎকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তাদের উদ্দেশ্য 'সংকট' নেই বলে ধোঁকা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপান। সংকট পুঁজিবাদের—সমাজবাদের নয়, বলে যদি কোনো সমাজবাদী সংকটের দিকে পিছন করে থাকেন তাহ'লে তিনি পুঁজিবাদীদেরই সাহায্য করবেন। কারণ শ্রমিকশ্রেণী নিজের স্বার্থের অনুকূলে সংকটে সমাধান না করতে পারলে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের সমাধানের বোঝা চাপিয়ে দেবে জনগণের উপর।

কিন্তু সে চেতনা কোথায় গোপালবাবুর লেখায়? তিনি সংস্কৃতির রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার কোথায়? সে কি সংকটের অস্বীকৃতি? উটপাখীর মতো মাথা গুঁজে থাকলেই কি ঘূর্ণিঝড় তাঁকে ক্ষমা করবে? মোটেই না। এই সংকট অতিক্রম করতে না পারলে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—বুর্জোয়া 'সংস্কৃতি'র গলিত শবগন্ধ ব্যর্থ করে দেবে মানুষের সংস্কৃতির জয়যাত্রাকে। অন্ধভাবে ঘুরপাক খাবে অধ্যাত্মবাদ, অনিশ্চয়তাবাদ, ধোঁকাবাদের ঘূর্ণীপাকে। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন প্রচেষ্টাই পারে এই সংকটকে অতিক্রম করতে—মানবসংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাদেরই। নব্য সংস্কৃতির ভগীরথ তাই শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশ মার্কসবাদীরা—বিকৃতির জটাজাল থেকে মুক্ত করে নব্য প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ধারা একমাত্র তারাই প্রবাহিত করতে পারেন। সংস্কৃতির রূপান্তর মানবিক প্রচেষ্টারই প্রসাদ। বুর্জোয়া বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্ভেই হবে নব্য-সংস্কৃতির উদ্বোধন। সংকট নেই বলে গোপালবাবু এই সংগ্রামকেই অস্বীকার করেছেন।

আবার অন্যদিকে মনোজবাবুর যুক্তিও তিনি মেনে নিয়েছেন—অর্থাৎ মেনে নিয়েছেন, সংকট যা আছে তা ঐ দেশবিভাগ জনিত—বাঙলা সংস্কৃতির উপর হিন্দী-উর্দুর আক্রমণ। হিন্দী-উর্দুর আক্রমণে বাঙলা সংস্কৃতির বিপদের

আলোচনাই তাঁর প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে—যদিও এটা একটা নিতান্ত গৌণ দিক।

অবশ্য এ কথা ঠিকই, বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে অংশ প্রবল তারা তাদের 'সংস্কৃতি'কে অন্যান্য জাতীয় ইউনিটের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে—এ দেশেও তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হয়, যেমন ব্যর্থ হয়েছিল প্রাক্-বিপ্লব রুশ সাম্রাজ্যে রুশীয়করণের প্রচেষ্টা। ব্যর্থ হবে এ দেশেও—তার সূচনাও দেখা যাচ্ছে পূর্ব বাঙলার জনতার প্রতিরোধে, পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণের ধূমায়িত বিক্ষোভে। কিন্তু জনশক্তির এই জাগরণ সম্পর্কেই রয়েছে গোপালবাবুর অনাস্থা। আর সেই জন্যই তিনি লিখতে পারেন, "কতকটা চাকরির প্রলোভনে, কতকটা শাসকদের পীড়নে, কতকটা বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতি মমতার অভাবে, কতকটা পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতিধারীদের সংস্কৃতগন্ধী বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায়—আর সর্বোপরি তাদের ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের মোহে পূর্ববাঙলার মুসলমানদের পক্ষে বাঙলাভাষার উপর উর্দু'কে স্থান দেওয়া অসম্ভব নয়।" তিনি মনে করেন, জওহরলালজীর সামনে মুখ খোলবার সাহসও নেই পশ্চিম বাঙলার 'শিক্ষিত সমাজের'। তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপ—জনসাধারণকে তিনি মনে করেন শাসক-শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি। তাই তিনি লেখেন, "...শিল্পসৃষ্টিতে বা দর্শন বিজ্ঞানের অনুশীলনেই বা দু-বাঙলা একত্রে চল্‌বে কেন—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি কেবলই যদি একদিকে জন-জীবনকে বিভক্ত করে রাখে, অন্যদিকে ভিন্ন জীবনাদর্শ তাদের বিভ্রান্ত করে?"

অর্থাৎ সমস্যাকে তিনিও দেখেছেন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিতে—'জীবনযাত্রায় যারা বন্দী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নাগপাশে আর মানসিক ক্ষেত্রে যারা বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে বিমুগ্ধ'—মার্কস্‌বাদীর দৃষ্টিতে নয়। তাই এমন কি সাম্প্রদায়িকতাগন্ধী সিদ্ধান্তও তিনি করতে পারেন—ভাষাগত এই সংকটকে তিনি দেখেন হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা হিসাবে—আসলে যা শ্রেণীগত সমস্যা। তাই তিনি অবলীলাক্রমে সিদ্ধান্ত করেন, পূর্ববাঙলার বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বাঙালী সংস্কৃতিতে আর কোনো বড় দান যোগান সম্ভব হবে না। কারণ, তার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে—আর মুসলমানদের তো বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি মমতাই নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোপালবাবুর এই প্রবন্ধে মনোজ বসু বা তারাশঙ্করের

জবাব নেই—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আছে তাঁদের মতের সমর্থন। পূর্বেই বলেছি, তাঁদের এই যুক্তি সংকট সমাধানের প্রচেষ্টাকে নিরস্ত্র করে, করে বিপথগামী। গোপালবাবু এই অপপ্রচেষ্টারই হাতিয়ার বনেছেন। আদর্শগত সংগ্রামে অনীহাই গোপালবাবুর এই ট্র্যাজেডির মূল।

গোপালবাবু পা দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে ঠিকই ; কিন্তু মাথা রয়ে গেছে বুর্জোয়া শিবিরেই। তাই গোপালবাবু এই প্রবন্ধে বুর্জোয়া রাজনীতিক-দের সম্পর্কে যতখানি নির্মম হতে পেরেছেন—এই রাজনীতিকদের সাংস্কৃতিক মুখপাত্রদের সম্পর্কে তার সিকিমাত্র কঠিন হতে পারেননি। নেহরু-প্যাটেল-কিরণ-বিধানচন্দ্রকে গোপালবাবু সঙ্গতভাবেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করের 'ফিউডাল আধারের মোহ' এবং বনফুলের 'ন্যাশনালিজমের প্রতারণা'র উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার, তাও বন্ধনীর মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে। এ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহ, বুর্জোয়া ভাবধারা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদদের সম্পর্কে তাঁর লেখনী শাণিত হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে। অথচ এই সংস্কৃতি আন্দোলনই তাঁর সংগ্রামক্ষেত্র। এখানকার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে সাধারণভাবে সরকারের রাজনৈতিক সমালোচনা করা আসলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবারই একটা কায়দা। এই আস্ফালনে বীরত্ব কিছু নেই, আসলে তা সংগ্রাম বর্জন।

তাই গোপালবাবুর জবাব বুর্জোয়া যুক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ—তাঁর সিদ্ধান্ত আদর্শগত সংগ্রাম বর্জনেরই সিদ্ধান্ত।

ঐতিহ্য বিলাস

কার্তিক সংখ্যার আর একটি প্রবন্ধ নরহরি কবিরাজের 'বিবেকানন্দের মত ও পথ'। এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন :

"প্রথমেই বলতে হয়, যুগধর্মের প্রতি সহানুভূতি বিবেকানন্দের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। তাঁর ইতিহাসবোধ, তাঁর গণতন্ত্রবোধ, তাঁর প্রজাশক্তির উপর বিশ্বাস—তাঁর সচেতন ও প্রগতিশীল মনের নির্ভুল পরিচয় দেয়। ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবস্পীয়ার সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা, কলম্বিয়াকে (আমেরিকা) স্বাধীনতার পীঠভূমি বলে তাঁর সম্বোধন তাঁর যুগধর্মী মনের আর এক বলিষ্ঠ পরিচয়।"

অর্থাৎ নরহরিবাবুর মতে বিবেকানন্দ সে যুগের প্রগতিবাদীদের পুরোধা। বিবেকানন্দের 'সচেতন প্রগতিশীল মনের নির্ভুল পরিচয়' কি করে পেলেন—নরহরিবাবু তার 'আসল কথাটিও' বেশ পরিষ্কার করেই বলেছেন পৃষ্ঠান্তরে। তা হলো এই :

"আসল কথা, গণতান্ত্রিক জীবনধর্মের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ, প্রজাশক্তির উপর বিশ্বাস ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতি বৈরাগ্য বিবেকানন্দের মনে বিরাট আসন জুড়ে বসেছিল।"

কিন্তু বিবেকানন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে নরহরিবাবু অন্যত্র লিখেছেন :

"তবে বিবেকানন্দের মনের গণতান্ত্রিকতা ও স্বাদেশিকতা বরাবর প্রকাশ পায় ধর্মের ভাষায়। বঙ্কিমের মতো বিবেকানন্দও সে দিনের রাজনীতিকে কটাক্ষ করতেন মিথ্যা বাগাড়ম্বর বলে। রামমোহনের মতো তিনিও জাতির অসন্তোষকে, 'বিক্ষোভকে' প্রকাশের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অথচ বলিষ্ঠ রাস্তা বলে বেছে নেন ধর্মান্দোলনকে।"

এ রকম হলো কেন? নরহরিবাবু দেখিয়েছেন :

"কিন্তু এই ইতিহাসবোধ, এই অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারা অধ্যাত্মবাদের অন্ধগলিতে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা অনেকাংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। পরাধীনতার অভিশাপে আবেদন নিবেদনের পথে রাজনীতির ফুসফাসের সংকীর্ণতায় বিবেকানন্দের প্রতিভা ও স্বাধীনতাস্পৃহা বোধহয় আড়ষ্ট হয়ে থাকতে চায় নি। তাই তা অন্যপথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে—যে পথে শাসকের দণ্ড উদ্যত নাই। যেখানে বহিঃপ্রকাশের স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত, প্রবল।"

'লক্ষ্যভ্রষ্ট' বিবেকানন্দ হননি মোটেই—বিবেকানন্দের লক্ষ্যটাই অধ্যাত্মবাদ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন নরহরিবাবু নিজে মার্কসবাদের পথ থেকে—তাঁর এবংবিধ যুক্তি থেকেই এই আসল কথাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। নইলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠত, বিবেকানন্দের এই 'নিরাপদ অথচ বলিষ্ঠ রাস্তাটি' আসলে কার রাস্তা? কেন এ পথে 'শাসকদের দণ্ড উদ্যত নাই'? এ পথে শাসকের দণ্ড উদ্যত ছিল না এই কারণেই যে, বিবেকানন্দ রাজনীতিকে কটাক্ষ করতেন 'মিথ্যা বাগাড়ম্বর' বলে, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভকে চালিত করতেন ধর্ম-সংস্কারের বিপথে। এ পথ নিরাপদ হবে না তো, হবে কোন পথ?

বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় ধর্ম আন্দোলনও প্রগতিশীল হয়ে উঠতে

পারে তা ঠিক, কিন্তু তখন সে ধর্মের পথ আর নিরাপদ থাকে না—'শাসকের দণ্ড' তখন ধর্মের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়। কারণ, ধর্ম আন্দোলন তখন হয়ে ওঠে রাজশক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, যেমন হয়েছিল জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহে। অর্থাৎ ধর্ম তখন জনসাধারণকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না, উদ্বুদ্ধ করে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের এই 'নিরাপদ অথচ বলিষ্ঠ' রাস্তাটি—শাসকশ্রেণীকেই নিরাপদ করে। এই 'বলিষ্ঠ' পথটি প্রতিক্রিয়ারই পথ। জনবিক্ষোভকে বিপথগামী করার জন্য শাসকশ্রেণী ধর্মকে, এ ভাবেই ব্যবহার করে থাকে। লেনিনের Religion is the opium of the people (জনতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার মাদক দ্রব্যই ধর্ম) কথাটির যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তবে তা এই।

বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহে 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' না হলে নরহরিবাবুও তা দেখতে পেতেন। তা হলে বিবেকানন্দের যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের মতো ভারতের রাজা রাজড়াদের বৃটিশের চক্রান্তে ফকির হওয়া বা পশ্চিমী সভ্যতার রাজধানীতে বৃটিশ প্ল্যাণ্টার ও বণিকদের পৈশাচিক আক্রমণে নিরীহ কৃষক ও তাঁতীদের দলে দলে মরতে বসাটাই দেখতেন না—জনতার প্রতিরোধটাও তাঁর চোখে পড়ত।

বিবেকানন্দের যুগের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনা দিতে গিয়ে নরহরিবাবু লিখেছেন: "উনিশ শতকের মধ্যাহ্ন যতই অপরাহ্নের দিকে ঢলে পড়তে লাগল, ততই যেন বহু বিজ্ঞাপিত ইওরোপীয় সভ্যতার দেউলিয়াপনা লোকের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। বৃটিশের যে ন্যায্যতার প্রতি ভারতবাসী গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তা যেন রূঢ় আঘাতে দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগল। মানুষের চোখের উপর দিয়ে ভারতের রাজ-রাজড়ারা ফকিরে পরিণত হতে লাগল। পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বজাধারী বৃটিশ প্ল্যাণ্টার ও বণিকদের পৈশাচিক আক্রমণে নিরীহ কৃষক ও তাঁতীর দল মরতে বসল। বৃটিশ বড়-কর্তাদের চরিত্রহীনতা ও ঘৃণ্য প্রবৃত্তিপরায়ণতায় ভারতের নীতিশীল মানুষ শিউরে উঠল। শিক্ষিত বাঙালী কেরানী ও মাষ্টারী জীবনের ক্ষুদ্রতায় আড়ষ্ট হয়ে লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হলো। মহারাণী ভিক্টোরিয়া কায়েম হয়ে বসে ভারতবাসীকে বৃটিশ আমলের মৌরসী পাট্টা স্থাপনের কথা জানিয়ে দিল।"

নরহরিবাবুর বর্ণিত ইতিহাস যদি সত্য হতো, অর্থাৎ 'মরতে বসা' 'শিউরে ওঠা' 'অধোবদন হয়ে দিন কাটান' এটাই যদি তখনকার দিনের সত্যকার রাজনৈতিক ইতিহাস হতো তাহলে, বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হিসাবে বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলনকেও প্রগতিশীল আখ্যা দিতে কোনো মার্কসবাদীই আপত্তি করত না। কিন্তু ঘটনা আসলে অন্যরূপ। নরহরিবাবু বিবেকানন্দের ইতিহাসবোধের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে নিজের ইতিহাসবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছেন বলেই তাঁর মনে পড়েনি যে ঠিক এরই পূর্ব মুহূর্তে হয়ে গেছে সিপাহী বিদ্রোহ। নীলচাষীদের বিদ্রোহ বৃটিশ বণিককুলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে গিয়ে পৌঁচেছে তার ঢেউ, বৃটিশ রাজ্যের সিংহাসন টলমলিয়ে উঠেছে। সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসককুল বুঝতে পারল যে এদেশে রাজ্যপাট বজায় রাখতে হলে দেশীয় প্রতিক্রিয়াই পারবে মোহসৃষ্টি করে জন-বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে, তাই যাদের কাছ থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তারা সমঝওতা করল। এই নয়া শ্রেণী-আঁতাতেরই কবুলিয়তনামা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্র। এতে কাজও হয়েছিল কিছুটা—জন-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ প্রশমিত হয়েছিল। আর এই রকম সময়ে প্রতিক্রিয়া নিজের শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করে নানাবিধ উপায়ে। "ভগবান সৃষ্টি", "ধর্ম সংস্কার"—প্রতিক্রিয়ার এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। বিবেকানন্দ ছিলেন এই প্রতিক্রিয়ারই ক্রীড়নক। ঐতিহাসিকভাবে বিবেকানন্দ এই ভূমিকাই অভিনয় করে গেছেন।

নরহরিবাবু এদিকটা যে দেখেননি তা নয়—দেখেও তিনি তা ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ এই সময় আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে ইওরোপে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রগতিশীলতার পাশে তার প্রতিক্রিয়া-শীলতার রূপ যতই স্পষ্ট হতে থাকে, ভারতের চিন্তাবীর বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ততই হতাশ হতে থাকেন। হতাশায় তাঁরা ভারতের অধ্যাত্মবাদকে, ত্যাগধর্মকে শ্রেয় বলে প্রচার করতে জোর দেন।"

শুধু বিবেকানন্দ কেন, সংস্কারবাদী আবিলতা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে এতেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতাদের কাছে

'চিরস্মরণীয়' হয়ে উঠেছেন (মাঘ, ১৩৫৫—পুস্তক পরিচয় দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ, একবাক্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সব ক'কজন প্রতিনিধির শিষ্যত্বই তাঁরা বরণ করে নিয়েছেন নির্বিচারে।

বিবেকানন্দের মত ও পথকে মার্কসবাদের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখলে নরহরিবাবুরা কখনই শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ঐতিহ্যের এই জঞ্জাল বহনের পরামর্শ দিতেন না। শ্রমিকশ্রেণী এই জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে রাজী নয়—এর যথাযোগ্য স্থান ইতিহাসের ডাস্টবিন। তার মানে এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণী এতদিনকার সব ঐতিহ্যই বর্জন করবেন।

শ্রমিকশ্রেণী মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। হাওয়ার উপর কোনো সংস্কৃতিই গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তাই বলে নির্বিচারে গ্রহণও সে করবে না! জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবে—কিন্তু সে জাতীয় ঐতিহ্যের রূপ কি? লেনিন এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়:

"প্রত্যেকটি আধুনিক জাতির মধ্যে নিহিত আছে দুটি জাতি···প্রত্যেকটি জাতীয় সাংস্কৃতির মধ্যে নিহিত আছে দু'টি জাতীয় সংস্কৃতি। পুরিসকেভিচকো, গুচকভ এবং স্ট্রুভের উচ্চাঙ্গের রুশ সংস্কৃতি আছে আবার চের্নিশেভস্কি প্লেখানভের নাম বিজড়িত আর একটি উচ্চাঙ্গের রুশ সংস্কৃতিও বর্তমান।"

লেনিন এই শেষোক্তদেরই ঐতিহ্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ চের্নিশেভস্কি প্রমুখ অবাস্তব সমাজবাদী হলেও তাঁদের প্রত্যেকটি রচনা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় প্রাণবন্ত। তাহলে লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণী হবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যেরই রক্ষাকর্তা।

লেনিনের শিক্ষানুযায়ী রুশ সাহিত্যের ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে জ্দানভ বলেছেন:

"আমাদের রুশীয় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বিশ্লেষণশীল প্রত্যেকটি রচনায় স্পন্দিত জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে **প্রাণাত্মক ঘৃণা**। (বড় হরফ আমার—লেখক) জনতার মৌলিক স্বার্থ, তাদের শিক্ষা, তাদের সংস্কৃতি জারতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের মহান প্রেরণায় প্রত্যেকটি রচনা সমুজ্জ্বল।

(লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় বক্তৃতা)

জ্দানভের এই উক্তির মধ্যেই আমাদের দেশের ঐতিহ্য বিচারেরও নির্দেশ পাওয়া যায়। অতীতের কোন্ ঐতিহ্য আমরা গ্রহণ করবো শ্রমিক-সংস্কৃতির

ভিত্তিভূমি হিসাবে, তার নিরিখ হবে—কার রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা, জনতার মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রামের মহৎব্রত গ্রহণ করেছেন কে? গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠি হবে কার শিল্পকর্ম 'শ্রেণী সংগ্রামের প্রেরণায় প্রাণবন্ত'। এ ঐতিহ্য খুঁজতে হবে ১৮২৫-৭৫ সালে ভারতের যে সব গণ-বিদ্রোহ ঘটেছে তার নায়কদের মধ্যে। এই নিরিখেই যাচাই করে নিতে হবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সবাইকে।

তলস্তয় প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের সমালোচনা উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার হবে।

লেনিন তলস্তয়কে 'বিপ্লবের দর্পণ' আখ্যা দিয়েই আবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তলস্তয়ের দর্শন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর [১] শ্রমিক-শ্রেণী সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করবে তলস্তয়ের সাহসী বস্তুবাদকে, আর বর্জন করবে তার প্রতিক্রিয়াশীল অবাস্তব দর্শনকে [২]। এখানে মূল আলোচনার পক্ষে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা স্মরণীয়—লেনিন দার্শনিক তলস্তয় আর শিল্পী তলস্তয়কে আলাদা করে দেখেননি, দেখা যায়ও না। লেখকের জীবন-দর্শনই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে, শিল্পে—এই হলো মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের প্রথম প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তবু লেনিন তলস্তয়ের যে মূল্য বিচার করেছেন তা আপাত-

(১) তলস্তয়ের শিক্ষা যে অবাস্তব এবং প্রতিক্রিয়ার যথার্থ ও অন্তর্নিহিত অর্থ যা, ঠিক সেই অর্থেই সে শিক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই।

('লেনিন অন আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচার' হইতে উদ্ধৃত)

(২) লেনিন শিল্পী হিসাবে তলস্তয়ের চমৎকারিত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন। জমিদার-স্বৈরতন্ত্রী সমাজের নির্মম সমালোচক হিসাবে তলস্তয়ের ভূমিকা তুলে ধরে এবং তলস্তয়ের সৃষ্টি যে মানুষের শিল্প বিকাশের পথে একটি অগ্রপদক্ষেপ তাও লেনিন দেখিয়েছেন। আবার অন্যদিকে, তলস্তয়ের দার্শনিক তত্ত্ব যে সমাজবাদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর, নীতি হিসাবে সে কথাও লেনিন জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।

(সোভিয়েত লিটারেচার, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৪৯ পৃঃ ১৩৬)

বিরোধী নয়। কারণ তখন বিপ্লবের শিবিরই ছিল প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান। সবে তখন পুরনো সামন্তব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, বুর্জোয়াব্যবস্থার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি! পুরনো কায়দায় ভাবতে অভ্যস্ত কৃষক ও ভূমিদাসেরা বিক্ষুব্ধ, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বাস্তববাদী তলস্তয়ের লেখায় এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত হয়েছে[৩] —কিন্তু তাঁর নিষ্ক্রিয়তার দর্শন সত্ত্বেও তাঁর হতাশা এবং অন্যায় প্রতিরোধ না করার মনোভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে "পুঞ্জীভূত ঘৃণা, অতীতকে ঝেড়ে ফেলে উন্নততর জীবনযাত্রার পরিণত প্রয়াস।"

তলস্তয়ের সাহিত্যে এইটাই বড় কথা, আর এইজন্যই লেনিন তাঁকে 'বিপ্লবের দর্পণ' বলে বর্ণনা করেছেন!

তলস্তয় সম্পর্কে এত কথা বলতে হলো এই কারণেই যে, আমাদের

(৩) মানবতার মুক্তির নূতন দাওয়াই আবিষ্কর্তা যুগাবতার হিসাবে তলস্তয় হাস্যকর—আর এই কারণেই রুশীয় এবং অন্যান্য দেশের 'তলস্তয়বাদীরা' তাঁর নীতির সবচেয়ে দুর্বল দিকটাকেই অনুশাসনে পরিণত করতে চাচ্ছে—এদের সত্যিই করুণা করতে হয়। তলস্তয় মহৎ এই হিসাবেই যে, বুর্জোয়া বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের যুগে রুশিয়ার লক্ষ লক্ষ কৃষক-জনতার মনোভাব এবং ভাবনাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তলস্তয়ের প্রতিভা মৌলিক, কারণ তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষতিকর হলেও তা আমাদের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। আমাদের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, তা কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব। (পৃঃ ৩৭)
…তলস্তয়ের মতবাদ এবং নীতির এই পরস্পর বিরোধিতা মোটেই আকস্মিক নয়। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে রুশীয় জীবনধারায় যে আত্ম-বিরোধিতার প্রকাশ হয়েছিল এ তারই অভিব্যক্তি। শাসনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে সদ্য মুক্ত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক গ্রাম তখন পুঁজি এবং অর্থের লুণ্ঠনক্ষেত্র। কৃষি-অর্থনীতি এবং জীবনধারার পুরনো বনিয়াদ বহু যুগ ধরে যা চলে আসছিল, অতিদ্রুত তা লুপ্ত হয়ে গেল…নতুন যে ব্যবস্থা থিতিয়ে বসছিল, জনতার অধিকাংশের কাছেই তা অজানা, অপরিচিত, তাদের বুদ্ধির অগম্য। (পৃঃ ৩৭)

…যখন পুরনো ব্যবস্থা উলট-পালট হয়ে গেছে তখন পুরনো ব্যবস্থায় শিক্ষিত জনতা, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যে সব নীতি, আচার-আচরণ বিশ্বাসে সংক্রামিত জনতা, যে নতুন ব্যবস্থা "থিতিয়ে বসছে" তা দেখে না, দেখতে পারে না… তখন অবশ্যম্ভাবীরূপেই নেতিবাদ, আত্মসমর্পণ, 'আত্মার' কাছে আবেদন— ভাবাদর্শ হিসাবে জন্মলাভ করে। (অন আর্ট এণ্ড লিটারেচার পৃঃ ৩৫)

সমালোচকরা তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের উক্তি অনেক সময়ই যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করেন। কোনো প্রতিক্রিয়াবাদী যুগপ্রভাবে যদি দু-একটা ভালকথা বলে ফেলেন অমনি তলস্তয়ের নজীর তুলে তার পিছনে ছুটবার ঝোঁক দেখা যায়। বিবেকানন্দ বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কিন্তু এঁরা আসলে বিপ্লবের-পরিপন্থী বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই ধারক। এঁদের পাশে পাশে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি ধারাও অব্যাহতভাবে বয়ে এসেছে দীনবন্ধু থেকে নজরুল ও সে দিনের সুকান্তের লেখনীর ভিতর দিয়ে— আর এই ধারাটিই হবে শ্রমিক-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, শ্রমিক-সংস্কৃতির প্রথম উপাদান। এই ধারাটির সম্যক পরিচয় আজ লুপ্ত, অবহেলিত—ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদী এবং দেশী ধনিকদের চক্রান্তে বিকৃত, অবজ্ঞাত। এই লুপ্ত, অবজ্ঞাত ঐতিহ্যের ধারাটিকে উদ্ধার করতে হবে—মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের উপরেই এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত। নরহরিবাবু প্রমুখ ইতিহাসের উৎসাহী ছাত্ররাই একাজ করতে পারেন—একাজ তাঁদেরই করতে হবে; বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা তাঁদের সাজে না।

লেজুড় মনোবৃত্তি

কিন্তু শুধু বুর্জোয়া 'স্বর্ণযুগ' কেন—বুর্জোয়া-বর্তমান সম্পর্কেই কি মোহ নেই?

'টি. এস. এলিয়ট ও নোবেল পুরস্কার' শীর্ষক নিবন্ধটিই ধরা যাক (পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫)। এই নিবন্ধটিতে অবশ্য এলিয়ট সম্পর্কে লেখা হয়েছে "প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় প্রগতির মুখোস পরিয়া এলিয়টের মতো কবির কাব্যে।" কিন্তু সমস্ত রচনাটির মধ্যে যে সুরটি প্রবল হয়ে উঠেছে তা এই যে, এলিয়ট প্রতিক্রিয়ার সচেতন পোষা কুকুর নয়, অচেতন শিকার মাত্র। "পরাজিত মনের আত্মগ্লানির" বশবর্তী হয়েই তিনি "জীবনকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রাধান্য দিয়া তাহাকে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করিবার" চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও এলিয়ট লেখকের "দৃষ্টি ও প্রশংসা" আকর্ষণ করেছে, এই কারণে যে, তিনি এলিয়টের লেখায় পেয়েছেন—"তাঁহার (এলিয়টের) বাস্তব দৃষ্টির, চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখিতেছি তাহার প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠার।" লেখক যে এলিয়টের গুণমুগ্ধ হয়েছেন তার অন্য কারণ এই যে, এলিয়ট "সত্যকে প্রকাশ করিলেন সুন্দর বলিয়া নয়, শিব বলিয়া নয়, এই বলিয়া যে ইহা বাস্তব।"

এলিয়টের এই তথাকথিত 'বাস্তবনিষ্ঠা' পরিচয়ের উক্ত লেখককে এতই মুগ্ধ করেছে যে গলদশ্রুলোচনে 'পুরোন' এলিয়টকে শ্রদ্ধার্ঘ দিয়ে বলেন—"আজ কোথায় সেই এলিয়ট যিনি আর কিছু আমাদের না দিন, দিয়াছিলেন অবিমুগ্ধ বাস্তবদৃষ্টি যিনি অসুন্দরকে সুন্দর বলেন নাই, রূপহীনকে অপরূপ বলেন নাই ?" উক্ত লেখকের এই মতের সঙ্গে বিষ্ণু দের বক্তব্যের কি কোনো মূলগত পার্থক্য আছে ? বিষ্ণু দে-র মতো এও কি এলিয়টের কাব্যে "জীবনের স্পষ্ট অঙ্গীকার" আবিষ্কারের প্রচেষ্টা নয় ? আসলে এলিয়টের 'সত্য' অর্ধসত্য। আর অর্ধসত্য সত্য নয়। কারণ আজ বুর্জোয়া সমাজের ভাঙনটাই একমাত্র সত্য নয় বরং আরো বেশি সত্য নব-সমাজ গঠনের শক্তির অভ্যুদয়। আর সে শক্তি দেশে দেশে জয়যুক্ত হচ্ছেও। এলিয়ট এই শক্তিকে ইচ্ছা করে দেখেন না, দেখাটা তাঁর বুর্জোয়া প্রভুরা পছন্দ করেন না। বুর্জোয়া প্রভুদেরই স্বার্থ এলিয়ট তাঁর কাব্যের মাধ্যমে প্রচার করেন, এ সমাজ অসুন্দর তা সত্য, কিন্তু যেহেতু সমাজ অপরিবর্তনীয় সুতরাং এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নাও—ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। জনতা যাতে পরিবর্তন প্রয়াসী না হয়, সে জন্য তিনি অতীতের গুণকীর্তন করে জনতার মনকে অতীত অভিমুখী করতে চান। ভবিষ্যৎটা এলিয়টের বুর্জোয়া প্রভুদের পক্ষে সুখের প্রতিশ্রুতি নয় বলেই এলিয়টেরও কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং এলিয়টের বাস্তব দৃষ্টি মোটেই 'অবিমুগ্ধ' নয়—বুর্জোয়া সংস্কারের অজ্ঞানে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বিমুগ্ধ। আর এই জন্যই ফাদায়েভ এলিয়টকে হায়নার সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু এই সমালোচকের কাছে সে সব কথার কোনও মূল্য নেই।

কথা উঠতে পারে যে, উক্ত লেখকের মত 'পরিচয়ের' সম্পাদকীয় বক্তব্য নাও হতে পারে। এ নিতান্তই টেকনিকাল আপত্তি। উক্ত লেখকের এই মতকে ক্ষতিকর মনে করলে, পরিচয়ের সম্পাদক-মণ্ডলী তার প্রতিবাদ করেননি কেন ? এ ধরনের বিকৃত চিন্তার জঞ্জালে 'পরিচয়ে'র পৃষ্ঠা ভারাক্রান্তই বা করলেন কেন ?

বৈশাখের (১৩৫৬) পরিচয়ে সরোজিনী নাইডুর কবিতা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতেও বুর্জোয়া সংস্কৃতি সম্পর্কে এই মিথ্যা মোহই প্রকট হয়ে ওঠে। সরোজিনীর ঘুম পাড়ানিয়া গানের প্রশস্তিতে 'পরিচয়ের' ছ'টি মূল্যবান পৃষ্ঠা বাজে খরচ করবার অন্য কি যুক্তি থাকতে পারে ? প্রবন্ধটির উদ্বোধনী বাক্যে বলা হয়েছে—সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুতে ভারতীয় নারীসমাজের ক্ষতি

অপূরণীয়। মানুষ মৃতের সঙ্গে লড়াই করে না তা ঠিক—কিন্তু একথা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব যে, সরোজিনী নাইডু যখন যুক্তপ্রদেশের গবর্নর পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন সে সময়ে সেখানকার শ্রমিক কৃষকের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয়েছে, আর এই অত্যাচার থেকে শ্রমিক-কৃষক মেয়েরাও অব্যাহতি পান নি? শ্রমিক-কৃষক মেয়েরা বুঝি ভারতীয় 'নারীসমাজে'র অন্তর্ভুক্ত নন? লেখকের এই উদ্বোধনী বাক্যের আসল তাৎপর্যই এই যে—নারীসমাজে কোনো শ্রেণীভেদ নেই।

লেজুড় মনোভাবের কদর্য এবং উৎকট প্রকাশ হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসের সমালোচনায় (ফাল্গুন, ১৩৫৫)।

নরেন্দ্র মিত্র নিজেকে যতই 'উদ্দেশ্যহীন' বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বলে মনে করুন না কেন, 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসেরও একটা বক্তব্য আছে, থাকবেই—কোনো রচনাই উদ্দেশ্যহীন হয় না, হতে পারে না। প্রথমত আলোচ্য উপন্যাসটি গ্রাম সম্পর্কে একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গ্রাম-জীবনের বাস্তবতা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে রাখে। বাংলার গ্রামগুলি যেন মন দেওয়া নেওয়ার কেন্দ্র, এই নিয়েই যেন সেখানে যত বিরোধ দ্বন্দ্ব।

উপন্যাসটি অবশ্য রচিত হয়েছিল ৭।৮ বছর আগে (যদিও তা প্রকাশ হয়েছে ১৯৪৭ সালে এবং লেখক মূল কাহিনীর যথেষ্ট পরিবর্তন পরিবর্ধন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং করেছেনও)। তখন হয়ত গ্রামে গ্রামে আজকের মতো এমন রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়নি; কিন্তু সংঘর্ষের মূল কারণগুলি তখনও ছিল এবং অতিমাত্রায়ই ছিল। সে সমস্যাগুলিকে বাদ দিয়ে গ্রামজীবন সম্পর্কে এ-ধরনের অবাস্তব রোমান্টিকতা সৃষ্টি বুর্জোয়া অপপ্রচারেরই অঙ্গ। নরেন্দ্র মিত্রের উক্ত উপন্যাসেও এই প্রচেষ্টাই হয়েছে, তা লেখকের জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক। সুতরাং আপাত-বিশুদ্ধ-গল্পটি যা প্রচার করে তা মোটেই বিশুদ্ধ নয়।

নারী-চরিত্রগুলির ট্রিটমেন্টেও নরেনবাবুর বিকৃত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলিকে দেখি পুরুষের বিকৃত যৌন-লালসার ইন্ধন রূপে। নারী সে যতই শক্তিমতী হোন না কেন পুরুষের কলুষিত কামনার অগ্নিতে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—এ ছাড়া মুরলীর কাছে মঙ্গলার আত্মসমর্পণের আর কি যুক্তি থাকতে পারে?

কিন্তু পরিচয়ের সমালোচক উপন্যাটিকে দেখেছেন বিশুদ্ধ গল্প হিসাবে।

তিনি অবশ্য জানেন—"লেখক (নরেন্দ্র মিত্র) জীবনের রূঢ়তাকে অনেকখানি অযথা স্তিমিত করে আমাদের কাছে পরিবেশন করেন—আমরা যারা জীবনের রূঢ়তায় দীপ্ত।" কিন্তু তাহলে কি হয়, মার্কসবাদী বিবেকের দংশনকে উড়িয়ে দিতেও তাঁর কিছুমাত্র দেরি হয় না. পরমুহূর্তেই তিনি লেখেন—"লেখক (নরেন্দ্র মিত্র) আমাদের বিশ্বাস করাতে কিছু চাননি, কেবল গল্প বলতেই চেয়েছেন।" মঙ্গলাও পরিচয়ের এই সমালোচকটিকে একেবারে বিমুগ্ধ করেছে।

নরেন্দ্র মিত্র বা তাঁর উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের ভিড়ে কোনো বিশিষ্টতাই দাবি করতে পারে না, তবু তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় এতখানি স্থানের অপব্যয় করতে হলো এই কারণেই যে, তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' গল্প সম্পর্কে আমাদের মোহটা যে কী মারাত্মক রূপ নিয়েছে, এই সমালোচনার মধ্যেই তা প্রকট।

ফুচিকের বই

পুস্তক সমালোচনার মধ্যে অধিকাংশই এই ধরনের আবিলতায় তরল। উপভোগ্য কিনা তা নির্ণয় করেই সমালোচকেরা অবসর গ্রহণ করেন। দেখিয়ে দেন না বইয়ের দোষ-ত্রুটি, বিকৃত মতবাদের বিরুদ্ধে শাণিত হয়ে ওঠে না তাদের লেখনী, যুগোপযোগী শিক্ষাটুকু পাঠকের সামনে তুলে ধরার দায়িত্বও তাঁরা বিস্মৃত হন। এর চরম নিদর্শন ফুচিকের 'Notes from the Gallows' ('ফাঁসীর মঞ্চ থেকে')-এর সমালোচনা।

এখানে সমালোচকের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে বইয়ের সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচারে। বুকের রক্ত দিয়ে লেখা বইয়ের সাহিত্যিক গুণাগুণই যেন বড় কথা। ফাশিস্ত নির্যাতন উপেক্ষা করে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, গোপনে সংগৃহীত কাগজ-পেন্সিলে লিখে ফুচিক যে তাঁর জবানবন্দী বাইরে পাঠাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন—সে কি সাহিত্য যশের আকাঙ্ক্ষায়? না, বুকের রক্ত দিয়ে ফুচিক এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এবং প্রমাণ করতে পেরেছেনও—কমিউনিজম মানুষকে কতখানি মহৎ করে তোলে, শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ মানুষকে দেয় কী বিপুল প্রাণশক্তি, কী অপরিসীম আত্মবিশ্বাস—কমিউনিজম মানুষকে করে মৃত্যুঞ্জয়। ফুচিকের জবানবন্দী বুর্জোয়া জল্লাদদের চ্যালেঞ্জ করে বলে—পারবে না, রক্তের বন্যায় কমিউনিজমকে তোমরা ভাসিয়ে দিতে পারবে না; কমিউনিজম শ্রমিকশ্রেণীকে যে দুর্বার শক্তি দেয় তার সামনে তুচ্ছ তোমাদের মারণমন্ত্র। কমিউনিজম পৃথিবীর যৌবনমন্ত্র—পারবে না

তোমাদের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটি তার গতিরোধ করতে। অনিবার্যভাবে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে কমিউনিজমের দিকে—ইতিহাসের এই অমোঘ বিধান ফুচিক সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছিলেন—মানুষের মতো বাঁচতে চেয়ে তাই ফুচিক মানুষের মতই প্রাণ দিলেন। প্রাণ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল পেরীও, ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েও এতটুকু বিচলিত হননি তাঁরা—কমিউনিজমই তাঁদের দিয়েছে এই অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস। তাই প্রাণ দিচ্ছেন ভরদ্বাজ, প্রাণ দিচ্ছেন মাদ্রাজের অখ্যাতনামা মজুর সন্তান, প্রাণ দিচ্ছেন কাকদ্বীপ-চন্দনপীড়ির কৃষকরা—প্রাণ দিলেন কলকাতার রাজপথে চারজন বীরকন্যা। এ কোনো অতি-নাটকীয় বীরপনা নয়—কমিউনিজমই তাঁদের প্রাণদানকে মোহনীয় করেছে। এর মধ্যে নেই কোনো সন্ত্রাসবাদী ভাববিলাসিতা—কমিউনিজমের জয় হবেই, এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই মৃত্যুকে তাঁরা তুচ্ছ করেছেন। তাঁদের এই মহান প্রাণদানের মধ্য দিয়ে এ কথাটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, কত ঘৃণ্য নীচ নারকীয় জীব তারা, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য, যারা কমিউনিজমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সমালোচকের উচিত ছিল, প্রাণদানের এই শিক্ষাটিকে সমুজ্জ্বল করে তোলা—যেন তা পাথেয় হয়ে ওঠে এদেশের বিপ্লবী জনতার—শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের। আজকের দিনে এই পাথেয়ই তো দরকার। ফুচিকের বইয়ে আছে সে পাথেয়—সার্থক তাই ফুচিকের এ জবানবন্দী, সার্থক তা সাহিত্য হিসাবেও।

এই গ্রন্থটির সমালোচনা সোভিয়েত লিটারেচারেও প্রকাশিত হয়েছে (সোভিয়েত লিটারেচার, প্রথম সংখ্যা ১৯৪৯)। সমালোচক সেখানে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছেন, শান্তির জন্য সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে ফুচিকের বইকে। এইটাই সমালোচকের কর্তব্য। আমরা সাহিত্যকদের কাছে দাবি করছি, এমন সাহিত্য রচনা করো যা হবে শ্রমিক-শ্রেণীর হাতিয়ার—প্রাণের বিনিময়ে যখন সে হাতিয়ার তৈরি করে দিয়ে যান লেখক তখন সমালোচক যদি তা ব্যবহারের মন্ত্রটি তুলে না ধরেন—সে কি অপরাধ নয়? কারণ ফুচিকের এই বই সত্যিই সংগ্রামী মানুষকে নতুন আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত করতে পারে, করবেও।

আত্মশক্তিতে অনাস্থা

'কমিউনিজম' 'শ্রমিকশ্রেণী' এই সব কথা ব্যবহার করতে পরিচয়ের এই

সমালোচকের কেমন এক অহেতুক সংকোচ সারা সমালোচনার মধ্যে অতি-মাত্রায় প্রকট। এই সংকোচটা যে আসলে আত্মবিশ্বাসের অভাবেরই ফল, তা আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে চিন্মোহন সেহানবীশের 'সংস্কৃতির আহ্বান' (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫) প্রবন্ধে। পোল্যাণ্ডের ভেরস্লাভ শহরে ৪৫টি দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল, এই প্রবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কমিউনিস্টরা এই সম্মেলনে ছিলেন এবং নেতৃত্বও নিয়েছিলেন—এজন্য কত না কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে এ প্রবন্ধে। ভাবখানা এই যে, কমিউনিস্টদের থাকাটা যেন এখানে গোপন করাই দরকার। তাঁরা যেন বাস্তবিকই বড় অপরাধ করে ফেলেছেন।

চিন্মোহনবাবু লিখেছেন: "যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্য-মতাবলম্বীদের পাশাপাশি কমিউনিস্টরাও অবশ্য ছিলেন। কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্মেলনে আজ ঐ অজুহাতে জোলিও কুরী, হলডেন, প্রেনা, টার্ল, বার্নাল, ওয়ালসের মতো বৈজ্ঞানিক; পিকাসো, লেজর, পুদোভকিনের মতো শিল্পী বা পল এলুয়ার, ফাদায়েভ, শলোকভ, এণ্ডারসন নেকসো, আনা সেগার্স, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আমাদো বা লিওনভকে বাদ দেওয়া চলে?"

'কমিউনিস্ট শো'—সম্মেলনের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের এই মিথ্যা প্রচারের জবাব নিশ্চয়ই দিতে হবে এবং চিন্মোহনবাবু এর জবাবে অত্যন্ত সংগত ভাবেই উল্লেখযোগ্য অ-কমিউনিস্ট সংস্কৃতি নায়কদের উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ মিথ্যা প্রচারের জবাব দিতে হবে বলেই কি 'অবশ্য' রূপ পেছনের দরজা দিয়ে কমিউনিস্টদের ঢুকতে হবে? তা কি বুর্জোয়া প্রচারের কাছে আত্ম-সমর্পণেরই নামান্তর নয়? যুদ্ধবিরোধী লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা নেতৃত্ব নিতে সক্ষম, নিচ্ছেন এবং নেবেনও—এ সত্যকে 'অবশ্যে'র ধামায় চাপা দিতে হবে কেন? পুঁজিবাদ আর যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—যুদ্ধের মূল কারণই পুঁজিবাদ—পুঁজিবাদের উচ্ছেদই চিরস্থায়ী শান্তির অঙ্গীকার। সুতরাং শান্তির লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা নেতৃত্ব নেবে এইটাইতো স্বাভাবিক। এটা কি কোনো পাপকর্ম যে গোপনতার আশ্রয় নিতে হবে?

যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদ শতকরা ৯০ জন মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। যুদ্ধের বীভৎসতা এখনও তাঁদের মনে তাজা রয়েছে—পুঁজিবাদের স্বার্থে কামানের খাদ্য হতে তারা রাজী নন। এই জন্যই তাঁরা আসছেন শান্তি সম্মেলনে, আসছেন বিপুল সংখ্যায়—যুদ্ধের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে

ব্যাপকতম ঐক্য। স্বভাবতই এই সম্মেলনে 'অ-কমিউনিস্টরা' সংখ্যায় প্রচুর। এই সব সম্মেলনে কমিউনিস্ট নেতৃত্বও যেমন সত্য তেমনি সত্য অধিক সংখ্যায় অ-কমিউনিস্ট উপস্থিতি। বুর্জোয়া মিথ্যার জবাবে এই সত্যকেই তুলে ধরতে হবে। আর এ সত্যকে বুর্জোয়া মিথ্যাবাদীরা শত রয়টারী ঢক্কা নিনাদেও চাপা দিতে পারবে না। কারণ জোলিও কুরীর ভাষায়—সত্য বিনা পাসপোর্টেই পরিভ্রমণ করে। চিন্মোহনবাবুর এই অবশ্যের প্যাঁচ আত্মশক্তিতে অনাস্থারই পরিচায়ক।

আত্মশক্তিতে এই ধরনের অনাস্থা থেকেই হতাশার জন্ম। তাই আজ দিকে দিকে জনশক্তি জাগ্রত, যখন তাঁরা পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে রত, যখন পুঁজিবাদের সশস্ত্র দাপটকে অগ্রাহ্য করে নিরস্ত্র জনশক্তি এগিয়ে চলেছে, পুঁজিবাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সশস্ত্র হয়ে উঠছে, তখনও ননী ভৌমিক হতাশার গল্প লিখতে পারেন, ('বাদা' কার্তিক, ১৩৫৫)। গল্প কবিতাকে আমাদের এই স্বল্প পরিসর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবো না, তবু ননী ভৌমিকের গল্পটির উল্লেখ না করে পারছি না এই কারণেই যে, সংগ্রামশীল গল্প রচনা করে ননীবাবু ইতিমধ্যেই বাঙলা সাহিত্যে একটা আসন করে নিয়েছেন—'সলিমের মা', 'চোর', 'ভলান্টিয়ার' প্রভৃতি গল্পের লেখক যখন হতাশার বাদায় আটকে পড়েন তখন এইটাই পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, বাঙলা সংস্কৃতিজগতে বুর্জোয়া প্রচার কত প্রবল—নতুন সংস্কৃতি গঠনের সমস্যা কত জটিল।

সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনকে ননীবাবু রূপায়িত করলেন তিনটি ছন্নছাড়া লোককে কেন্দ্র করে—একজন ভয় পাওয়া কৃষক ঈশ্বর, তার অন্ধ অবলা বোন কামিনী আর ফেরারী কেদার। ননীবাবুর ঈশ্বর বলে—"সাহস কোথা আমাদের! সাহস কোথা!" সাহস কেদারও তাকে দিতে পারে না, কারণ নিজেই সে হতাশাচ্ছন্ন। নিজের চামড়াটুকু বাঁচাবার জন্য নিজের অন্ধ বোনকে নায়েবের বিকৃত লালসার কাছে সমর্পণ করতে যাচ্ছে ঈশ্বর—বাধা দিতে গিয়েও শেষ অবধি বাধা দেয় না কেদার—আত্মবিশ্বাস যে সে নিজেই খুইয়ে বসে আছে। সমস্ত গল্প থেকে এই সুরই প্রবল হয়ে ওঠে যে, শেষ হয়ে গেছে আন্দোলন, আর আশা নেই।

গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে কার্তিক মাসে। তার পরের ঘটনাবলী অন্যরূপ: সুন্দরবনের কৃষকেরা মাথা মত করেনি, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য কাকদ্বীপের ঈশ্বরেরা নিজের বোনকে নায়েবের বিকৃত কামনার

অগ্নিতে আহুতি দেয়নি। আজও তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

আজকের বাস্তব অবস্থা এমনই যে সংগ্রাম শেষ হলেও শেষ হয় না—দমন-নীতির সামনে জনতা সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হন অনেক সময়—কিন্তু যেহেতু যে বাস্তব সমস্যা তাদের সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয় তার কোনো সমাধান হয় না সেইজন্য দ্বিগুণ শক্তিতে আন্দোলন আবার ফেটে পড়ে। সাময়িক পরাজয়টা সত্য, কিন্তু আরো বেশি সত্য আন্দোলনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। আন্দোলন শেষ হয়নি—এই সুপ্ত সত্যটিকে তুলে ধরাইতো সমাজবাদী লেখকের কাজ। 'সমাজবাদী বাস্তবতা' কথাটির যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তো এই। কিন্তু আমাদের লেখকেরা এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে—সাময়িক পরাজয়টা তাঁদের একেবারে অভিভূত করে ফেলে। আর এই জন্যই দরকার আদর্শগত প্রস্তুতির।

আদর্শগত সংগ্রামে অনিচ্ছা

কিন্তু এদিক থেকে 'পরিচয়' চরম দায়িত্বহীনতারই পরিচয় দিয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আবিলতার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে সংগ্রাম সুরু করেছেন পরিচয়ের পরিচালকবৃন্দ তার থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না। জ্‌দানভ ও ফাদায়েভের সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ছাপাবার স্থান হয় না 'পরিচয়ে'। জ্‌দানভের লেখাকে সংক্ষিপ্ত করার মতো (কার্তিক, ১৩৫৫) ধৃষ্টতারও অভাব হয় না। 'বেশ লিখেছে ছোকরা' সুরে জ্‌দানভের লেখাকে সংক্ষিপ্ত করার অধিকার তাদের কে দিল ? জ্‌দানভের লেখা যথেষ্ট প্রাঞ্জল—তার কোনো টীকার দরকার হয় না। পরিচয়ে এসব জিনিস পত্রস্থ হয়নি—অথচ এই সব দলিলগুলিই সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে শাণিত হাতিয়ার। আদর্শগত সংগ্রাম সম্পর্কে পরিচয়ের অতীত সম্পাদকবর্গের বিরূপ মনোভাবের ঐতিহ্য এখনও বিলুপ্ত হয়নি। তাই বিষ্ণু দে-র কুৎসা প্রচারের জবাব দেবার কথা তাঁদের সাতমাস পরে মনে হয়। অথচ মার্কসবাদের উপর আক্রমণ বিষ্ণুবাবু শুরু করেছিলেন পরিচয়কে কেন্দ্র করেই।

মাত্র এই কয়টি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে ওয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব কতখানি !

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে অভূতপূর্বভাবে—

জনবল, আর্থিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা আজ অনন্যসাধারণ। যুদ্ধের মধ্যে ফাশিজমের বিরুদ্ধে সাফল্যমণ্ডিত লড়াইয়ে এবং যুদ্ধশেষে আর্থিক পুনর্গঠনের সাফল্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রাদর্শ এবং মতবাদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ আজ ক্ষীণবল আর যুদ্ধান্তে সমাজবাদের রণক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে—অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে প্রতিক্রিয়ার মর্মকেন্দ্র আমেরিকা ও বৃটেন অবধি। দেশে দেশে তা সশস্ত্র সংগ্রামের রূপও নিচ্ছে। চীনের মুক্তিফৌজ ক্যান্টনের দ্বারদেশে উপস্থিত, বর্মা, মালয়, ভিয়েতনামে জনবাহিনী দুর্বার, গ্রীসে মুক্তিফৌজ আজও অপরাজিত। ভারতীয় ধনিক সর্দাররাই কি আর নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে? দুনিয়া জুড়ে শাসকশ্রেণীর চোখে আজ ঘুম নেই। "আমরা আজ এমন একটা যুগে বাস করছি যখন সব পথই শেষ হয়েছে কমিউনিজমে" (মলোটভ)।

কিন্তু নাভিশ্বাসগ্রস্ত হলেও সাম্রাজ্যবাদ এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি--বাঁচবার প্রয়াসে আজ সে মরীয়া হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকট তাকে গ্রাস করছে। জনশক্তির আক্রমণে সে জর্জরিত—সাম্রাজ্যবাদ আজ তাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে শেষ মোকাবিলার জন্য পাঁয়তারা কষছে, অবশ্য যদি শক্তিতে কুলোয়। কিন্তু যুদ্ধ বাধাতে চাইলেই কি আর বাধান যায়? রণক্লান্ত মানুষ ধনিকের মুনাফা রক্ষার জন্য আবার কামানের খাদ্য হতে রাজী নয়। তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যবাদ আজ তাই দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি শুরু করেছে। যুদ্ধঘাঁটি স্থাপিত হচ্ছে দেশে দেশে। তাদের বৈজ্ঞানিক ক্রীতদাসেরা আণবিক মারণমন্ত্রের পিশাচ সাধনায় ঊর্ধ্বনেত্র। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আশ্বস্ত হতে পারছে না। কারণ তারা জানে শত আণবিক বোমার থেকেও শক্তিমান শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী মতবাদ—মার্কসবাদ। তাই বুর্জোয়ারা তাদের ভাঙা তলোয়ার নিয়ে নেমে গেছে মতবাদের লড়াইয়ে—বারট্রাণ্ড রাসেল থেকে রাধাকৃষ্ণাণ, বুর্জোয়াদের বশংবদ যত দার্শনিক জারজ সন্তানেরা (অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে নয়, নগদ পরমার্থিক মোক্ষের প্রতিশ্রুতিতে—তা সে কোনো পররাষ্ট্র দপ্তরেই হোক, আর অন্য কোথাও হোক) এলিয়ট-মলরো-সার্তার থেকে বনফুল অবধি দেশী-বিদেশী সাহিত্যিক পোষাকুকুরেরা, লুই-ফিসার থেকে এম-এন-রায় অবধি বিগত-যৌবন সাংবাদিক বারবণিতারা এই আদর্শগত ভাড়াটিয়া বাহিনীতে

নাম লিখিয়েছে। এই সব বীরপুঙ্গবদের ডন কুইক্সোটি বীরত্ব শেষ পর্যন্ত ইতিহাস-নাটকে হাস্যরসেরই সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এদের ভাঙা তলোয়ারের ধারে না কাটুক আস্ফালনের বনেদী কায়দায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বিভ্রান্তির সম্ভাবনা এই কারণেই যে বুদ্ধিজীবীরা বেশীর ভাগই আসেন ধনিক-শ্রমিক দোটানায় দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। তারা যখন মার্কসবাদের শিবিরে আসেন তখন তাদের সঙ্গে পচা বুর্জোয়া মতবাদ এবং সংস্কারও কিছু পরিমাণে চলে আসে। আর এই বুর্জোয়া সংস্কারের ধ্বংসাবশেষই পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা অভিনয় করে—তাঁদের অভ্যস্ত চিন্তা বুর্জোয়া প্রচারের বিষে সংক্রামিত হয়ে পড়ে, তাঁদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও। আর এই জন্যইতো জ্‌দানভ আদর্শগত সংগ্রামের উপর এত জোর দিয়ে বলেছেন, বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটি আঘাতের শুধু প্রত্যাঘাতই নয়, সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করতে হবে, তাকে ধিক্কার দিতে হবে।

এ কাজ যারা না করবেন সংস্কৃতিআন্দোলনের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার তাদের নেই। লেনিনগ্রাদ লেখক সংঘের সভাপতিপদ থেকে টিখনভকে অপসারণের কারণ এই।

সংগ্রামী ধারা

পরিচয়কেও আদর্শগত সংগ্রামের পথে এগুতে হবে, প্রয়োজন হলে নতুন নেতৃত্বে। মার্কসবাদের অপরিমেয় প্রাণশক্তিই এই নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে, করছেও। সংস্কারবাদী আবিলতার পাশাপাশি একটি সংগ্রামী ধারাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচয়ের পৃষ্ঠায়।

এ প্রসঙ্গে সবার আগে উল্লেখযোগ্য অনিমেষ রায়ের "বুদ্ধিবিলাসীর ডায়ালেকটিক" নিবন্ধটি। এই স্বল্প পরিসর নিবন্ধটিতে 'নিরপেক্ষ' আইয়ুবের ছদ্মবেশ ছিঁড়ে অনিমেষবাবু তাঁর ডলারী আত্মাকে নগ্ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে এবং সুতীক্ষ্ণ যুক্তিতে মার্কসবাদী বিপ্লবী নীতিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই প্রবন্ধে।

মার্কসবাদী বিতর্কনীতি আত্মরক্ষামূলক নয়, সর্বদাই আক্রমণাত্মক। লেনিন কখনও অধ্যাপকসুলভ মুরুব্বীয়ানায় প্রতিপক্ষের ভুল ধরিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হননি— ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে তাদের ধরাশায়ী করেছেন, প্রতিপক্ষের হাঁটু

ভেঙে দিয়েছেন যাতে তারা কখনও আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। আর এই ভাবেই লেনিন তাঁর স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। মার্কসবাদীরা নখদন্তহীন তৃণভোজী বা নপুংসক অহিংসবাদী নয়, - প্রত্যেকটি আঘাতকে দ্বিগুণ জোরে ফিরিয়ে দেওয়াই তাদের নীতি। কারণ (অনিমেষবাবুর ভাষায়) মানুষকে ভুলিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া যে সব দার্শনিকদের পেশা তাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্করুণ হওয়া প্রত্যেক মানবহিতৈষীর প্রয়োজন।

সাতমাস পর হলেও, সংগ্রামশীল লেখকেরা বিষ্ণু দের কুৎসার জবাব দিতে পেরেছেন পরিচয়ের পৃষ্ঠায় (বৈশাখ ১৩৫৬, "মার্কসবাদের নগ্ন ভাষ্য"---নরহরি কবিরাজ)। মার্কসবাদের সংগ্রামী পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দের মার্কসবাদী সিংহচর্ম ছিঁড়ে বুর্জোয়া ছাগশিশু রূপটিকে নগ্ন করে ধরে দিয়েছেন নরহরিবাবু। অসংখ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন 'মার্কসবাদী' বিষ্ণু দে আর 'সৌন্দর্যবাদী' বুদ্ধদেব বসু পচা বুর্জোয়া ভাববাদেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপন না করে পারছি না। নরহরিবাবু এক জায়গায় লিখেছেন: "অচিন্ত্যকুমারকে দেখেছি বুর্জোয়া আদালতের হাকিম-সুলভ উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের জীবন নিয়ে পুতুল নাচের আসর জমাতে।"

কিন্তু উদ্দেশ্যহীনতার মিথ্যা অপবাদ কোনো ক্ষেত্রেই কি অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে প্রয়োগ করা চলে? তাঁর প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসই কি জনজীবনকে বিকৃত করে দেখানোর অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়? 'কাঠ খড় কেরোসিন' থেকে এই সেদিনকার (আজগুবী?) 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'—এর মধ্যে উদ্দেশ্যহীন কোনটা? অবশ্য একথা সত্য "কাঠ খড় কেরোসিন" বা "যে যাই বলুক" এর প্রত্যক্ষ কমিউনিস্ট বিরোধিতা বা 'রাজনীতি' চর্চা একটি "গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীতে" নেই—কিন্তু তাই বলেই কি তা উদ্দেশ্যহীন? নরেন্দ্র মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ' সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয়েছে 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী' সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'র প্রাকৃতিক বর্ণনাটা গ্রামেরই, তার পাত্র-পাত্রীরা গ্রাম্য কৃষকের ভাষায়ই কথা বলে, তবু তারা কেউ গ্রামের লোক নয়, কৃষকের ছদ্মবেশে বুর্জোয়া বিকৃতির প্রতীক। বর্ণনাটা গ্রামের হলেও গল্পটি মোটেই গ্রাম্য কাহিনী নয়—শহরের জলো রোমান্টিক গাঁথুনীর উপর গ্রাম্য মাটির প্রলেপ। এ গ্রামে কোনো সমস্যা নেই—আছে শুধু প্রেমের লীলাখেলা। আর গ্রামকে এভাবে দেখানোটা

মোটেই উদ্দেশ্যহীন নয়, একটি বিশুদ্ধ অসদুদ্দেশ্য রয়েছে এর মূলে। তা হচ্ছে, গ্রামে আসলে কোনো সমস্যা নেই, জোতদার নেই, পুলিস ক্যাম্প নেই—রক্তপাত যা তা কমিউনিস্ট কারসাজি—নলিনী-বিধান চক্রের এই মিথ্যা প্রচারকে সাহিত্যভাত করা। তথাকথিত উদ্দেশ্যহীনতাটা একটা ভঙ্গী মাত্র—উদ্দেশ্য-হীনতার প্রসাধনে জনতার মন ভুলাবার প্রয়াস। সুতরাং অচিন্ত্যকুমারকে উদ্দেশ্যহীনতার সার্টিফিকেট দেওয়া আসলে তার সুপরিকল্পিত ফাঁদে পা দেওয়া।

সংগ্রামী ঐতিহ্যে উজ্জ্বল আর একটি প্রবন্ধ হলো, পিনাকীলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'সোভিয়েত বায়োলজী' (চৈত্র, ১৩৫৭)। সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী লাইসেঙ্কোর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারকে উপলক্ষ করে সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসার এক নতুন ঝড় উঠেছে। বিলেত আমেরিকার ভাড়াটে বৈজ্ঞানিক থেকে এদেশে সাম্রাজ্যবাদের অতি পুরাতন ভৃত্য 'স্টেটসম্যান' পর্যন্ত বিজ্ঞানের ভবিষ্যত নিয়ে নাকিকান্নায় একেবারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। পিনাকী-বাবুর প্রবন্ধ এই সব কুৎসার স্পষ্ট জবাব। তিনি দেখিয়েছেন লাইসেঙ্কোর অপরাধ তিনি মানুষকে জেনের অসহায় মুখাপেক্ষী করে রাখতে রাজী নন, তিনি মানুষের হাতে এমন হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন যার ফলে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হবে। সোভিয়েত সরকারের অপরাধ তাঁরা বিজ্ঞানকে মানব নিধনের পিশাচতন্ত্রে নিয়োগ করাকে অপরাধ বলে মনে করেন—তাঁরা মনে করেন প্রকৃতিকে জয় করার হাতিয়ারই বিজ্ঞান। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামেই বিজ্ঞানের জন্ম আর এইভাবেই বিজ্ঞান অগ্রগতির পথ বেয়ে এগিয়ে যাবে নব নব আবিষ্কারের জয়রথে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপ-মানবদের নাকি কান্না সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গোর্কির ভাষায়—'History is zealous and no patron of loafers !'

লোকনাট্য

সংস্কৃতিআন্দোলনে এই সংগ্রামশীল ধারাটি যে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে—'লোকনাট্য' তারই স্বাক্ষর। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী আদর্শ লোক-নাট্যের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল। সংগ্রামী চেতনায় তার দৃষ্টি অনেক সুস্থির, আবিলতাহীন, সহজ ও স্বচ্ছ। প্রতিক্রিয়ার দুর্গকে সে সোজাসুজি আক্রমণ করেছে আর সে আঘাত যে যথাস্থানে পৌঁচেছে তার প্রমাণ, ছ'মাসের মধ্যেই

লোকনাট্যের কণ্ঠরোধ। কিন্তু দু'মাস আয়ুষ্কালের মধ্যেই 'লোকনাট্য' সংগ্রামী সংস্কৃতির যে আদর্শটিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে পেরেছে তা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই—শত সরকারি হামলা তার পথরোধ করতে পারবে না।

প্রধানত গণনাট্য আন্দোলনের মুখপত্র লোকনাট্য। সংগ্রামের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল গণনাট্য আন্দোলনের—তার মূলমন্ত্র ছিল People's Theatre Stars the People (গণনাট্য জনতাকে তারকায়িত করে)—স্বভাবতই সচেতন মার্কসবাদী শিল্পীরাই ছিলেন এই আন্দোলনের ভগীরথ। মার্কসবাদী-দের সংস্কারবাদী বিভ্রান্তি এই আন্দোলনকেও বিপথগামী করে। জনতার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্থক গণনাট্য রচনার চেষ্টা হয় স্টুডিওতে বসে। 'সার্থক' শিল্প রচনার মিথ্যা মোহে জনতার আঙ্গিককে বর্জন করে 'ফর্মালিজমের' বদ্ধ জলায় গাঁজিয়ে ওঠে আন্দোলন। গণনাট্য আন্দোলনের এই মর্মান্তিক অবস্থার বাস্তব বিবরণ ফুটে উঠেছে মৃত্যুঞ্জয় অধিকারীর 'গণনাট্য সংগঠন (১)' শীর্ষক আত্মসমালোচনামূলক প্রবন্ধে—"...মরা শহুরে শিল্পীরা হলেন মাস্টার আর নবনাট্য আন্দোলনের স্রষ্টারা হলেন ছাত্র।

প্রযোজিত হলো নবান্ন, নবজীবনের গান, ভারতের মর্মবাণী, অমর ভারত, আরও কত কি। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করা হলো, অনুষ্ঠান হলো পেশাদারী কায়দায়। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলনের সেই বিরাট বৈপ্লবিক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে গণনাট্য সংঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসলো। রিহার্শাল হল শো, শো হল রিহার্শাল—এই ঘূর্ণীপাক থেকে আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রে যাবার সময় কোথায়?"

লোকনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও হলো এই 'গণনাট্য সংগঠন (১) ও সলিল চৌধুরীর 'আধুনিক বাঙলা গানের ভবিষ্যৎ।'

শেষোক্ত প্রবন্ধটি সম্পর্কেই আমরা প্রথমে আলোচনা করবো। চাঁদ-চামেলী সংক্রান্ত যে নির্জলা ন্যাকামী আধুনিক বাঙলা গান নামে এদেশে পরিচিত তা যে ক্রমশ সংগীত-শিল্পকেই স্বাভাবিক অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছে—সলিলবাবু তা সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এ পথে সংগীতের মৃত্যু অনিবার্য—কারণ, সমস্যা কন্টকিত সংগ্রামোন্মুখ মানুষ বেশিদিন এ ঘুম-পাড়ানিয়া গান বরদাস্ত করবে না। এ পথ শিল্পীর পথ নয়—সংগীত ব্যবসায়ী বুর্জোয়াশ্রেণীর পথ। জনতার সংগ্রামী চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাটাই তাদের কাছে বড় আর তারি জন্য সংগীত তারা বিকৃত করছে, তাতে সংগীতের মৃত্যু হলে

তাদের কিছুযায় আসে না। শিল্পীদের তাই সলিলবাবু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : "শিল্পীদের মনে রাখতে হবে তাদের শ্রোতা মুষ্টিমেয় ধনিক নয়; সংগ্রামশীল জনতা।" সুতরাং জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্মকরণ, তাদের সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্যেই রয়েছে সংগীত-শিল্পের মুক্তি, শিল্পীরও। তাই শিল্পীদের নিছক পেশার খাতিরে রেডিও-রেকর্ড-সিনেমা মালিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে সংগীতকে এই পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তবে সলিলবাবু এক জায়গায় লিখেছেন, "চ্যাংড়া, চোরাবাজারির পয়সায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্তদের জীবন-দর্শন আছে এই সমস্ত গানে।" বোঝা দরকার এই 'চ্যাংড়া দর্শনই' আজকের বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবন-দর্শন। এই চ্যাংড়ামিই বুর্জোয়া শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সলিলবাবুর উক্তির মধ্যে এই উপলব্ধি পরিস্ফুট নয়।

পূর্বেই বলেছি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রবন্ধ গণনাট্য আন্দোলনের আত্ম-সমালোচনা। সাথক শিল্পের বুর্জোয়া বুলির ভাওতায় গণনাট্য আন্দোলন কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কি ভাবে গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়া-শিল্পীদের লেজুড় হয়ে উঠলো।—মৃত্যুঞ্জয়বাবু নির্মমভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে মোটামুটি সঠিক পথের নির্দেশও তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন—ষ্টুডিওতে বসে শিল্প রচনা নয় "প্রতিটি লড়াইয়ের ব্যারিকেডে যে সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হবে।" পেশাদারী শিল্পীদের নয়, "এই সমস্ত সংগ্রামের শিল্প কর্মীদের নেতৃত্বের পদে আনতে হবে।"

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রবন্ধে কতকগুলি ত্রুটি থেকে গেছে। আর তারি ছিদ্রপথে সংস্কারবাদ তার আক্রমণ চালাচ্ছে। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে মনে হবে, গণনাট্য আন্দোলন বিপথগামী হবার জন্য সবটা দোষই যেন পেশাদারী শিল্পীদের। আসলে মার্কসবাদী নেতাদের মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণই এর জন্য দায়ী। আর এই লেজুড় মনোবৃত্তির জন্যই পেশাদারী শিল্পীদের শিক্ষিত করার পরিবর্তে গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব এদের বুর্জোয়া কুসংস্কারের তোয়াজ করেছেন—না হলে কি সাধ্য গুটিকয়েক পেশাদারী শিল্পীর যে তারা গণনাট্য আন্দোলনকে বিপথগামী করবে? নেতৃত্বের নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার না করলে আত্মসমালোচনা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

সংস্কারবাদের ভূত

এলাহাবাদ সম্মেলনে গণনাট্য আন্দোলন সংস্কারবাদের যে ভূতটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে এসেছে, তা যে এখনও তাদের সঙ্গ ছাড়েনি, পুনরায় কাঁধে চড়ার সুযোগের সন্ধানে আছে তারি প্রমাণ ফাল্গুন-চৈত্রের 'লোকনাট্যে' প্রকাশিত সুরপতি নন্দীর আলোচনা, 'গণনাট্য সংগঠন (২)'। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর প্রবন্ধের যে দুর্বলতা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেই দুর্বল স্থান থেকেই সুরপতিবাবু সংস্কারবাদী প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেন—"কি করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী এসে এত বড় আন্দোলনকে ভুলপথে চালিত করে দিল তা ধারণাতীত।" সুরপতিবাবুর এই প্রশ্ন খুবই সঙ্গত হতো যদি এর থেকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার চেষ্টা করতেন? কিন্তু তিনি তা করেননি। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি তার সংস্কারবাদী দৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গণনাট্য আন্দোলন মোটেই বিপথগামী হয়নি, "গণনাট্য সংঘ কোনদিনই নিজেদেরকে পেশাদারী শিল্পী দাদাদের কাছে বিক্রী করেনি।" তাঁর মতে, "গণনাট্য সংঘের অতীতের বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টিকে গণনাট্য সংঘের ভুল পথে চলার দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরাও অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল।" এর পর পাছে তাকে সংস্কারবাদী বলা হয়, এ জন্য তিনি গণনাট্য আন্দোলনের 'দুর্বলতা'ও (ভুল নয়) দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এই 'দুর্বলতা' দূর করার জন্য একটা 'কর্মসূচী'ও উপস্থিত করেছেন। সুরপতিবাবুর মতে গণনাট্য সংঘের 'দুবলতা' ছিল যে তারা "নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করল না।'

এখন দেখা যাক, গণনাট্য সংঘের এই অতীত 'শিল্পসৃষ্টি' যাকে 'ভুল বলে দেখান মারাত্মক ভুল'—তার আসল চরিত্রটা কি। সুরপতিবাবু এ প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের 'গৌরবময়' ঐতিহ্য হিসাবে নবান্ন, নবজীবনের গান ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এগুলো নিরক্ষর শ্রমিক কৃষকের মধ্যে পরিবেশন করলেই গণনাট্য সংঘের আর কোনো 'দুর্বলতা' থাকত না।

গণনাট্য সংঘের এই তথাকথিত ঐতিহ্য প্রথমে খতিয়ে দেখা যাক। 'অগ্রণীর' জনৈক সমালোচকও 'লোকনাট্যে' 'নবান্নের' অবদানের স্বীকৃতি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং প্রথমে 'নবান্ন'রই আলোচনা করা যাক।

'নবান্ন' নাটকে যে কৃষককে আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না, লড়াইয়ের চিন্তাও করে না। 'নবান্ন' নাটক কাঁদায়, কিন্তু

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে না। কি করে করবে? দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী প্রধান আসামী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে সেখানে অনুপস্থিত। যাদের দেখি—মজুতদার, নারী-ব্যবসায়ী—তারা ঘৃণ্য বটে কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র, কোন শ্রেণীর প্রতিভু নয়। আর বাঁচবার পথ?—(যা নাটকের শেষে জোর করে জুড়ে দেওয়া একটা ক্রোড়দৃশ্য) সব জমি এক করে চাষ করো তাহলেই সব দুঃখ কষ্ট মিটে যাবে। অর্থাৎ কোনো লড়াইয়ের দরকার নেই, শ্রেণী-সংগ্রাম মিছে কথা। অল্প কথায়, এই হলো নবান্ন নাটকের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে বিপ্লবটা কোথায়? কৃষক পাত্রপাত্রী নবান্ন নাটকে পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন তা সত্যি, তাঁরা কৃষকের ভাষায় কথা বলেছেন এটাও ঠিক; কিন্তু তবু কি তাঁরা কৃষকের কথা বলেছেন? শ্রমিক কৃষক নিয়ে নাটক রচনাই কি গণনাট্যের শেষ কথা? তাহলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'কে গণ-সাহিত্য বলতে দোষ কি? আসলে জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয় না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হলো, সে জনতার শ্রেণীচরিত্র যথার্থভাবে ফুটেছে কি না, শত্রুর বিরুদ্ধে সে নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা—এইটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা। এই ভাবে বিচার করলে, নবান্নকে কি বিপ্লবী নাটক বলা যায়? না তা নিয়ে গর্ব করা শোভা পায়? তার উপর আঙ্গিকের দিক থেকেও নাটকটি এমনভাবে রচিত যে নাটমঞ্চের বাইরে তার অভিনয় এক প্রকার অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ত্রুটির জন্য লেখকদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ এইটাই ছিল সে সময় মার্কসবাদীদের রাজনীতি। লেখকদের দোষ দিতে কেউ বলছে না। তাই বলে, যে ভুল রাজনীতিকে বর্জন করা হয়েছে, যে রাজনীতিকে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে—লেখকদের দোষ নেই অজুহাতে তার প্রচারটাকে আঁকড়ে থাকতে হবে, তা নিয়ে গর্ব করতে হবে?

কিংবা ধরা যাক, বহুকথিত 'ভারতের মর্মবাণী'র দৃষ্টান্ত। এই নৃত্যনাট্যের 'মর্মবাণী' আসলে জওহরলাল 'আবিষ্কৃত' ভারতেরই প্রেতাত্মা। এই নৃত্য-নাট্যেরও বক্তব্য, ভারতের মর্মবাণী অপরিবর্তনীয়—ভারতেতিহাসের অব্যাহত স্রোতের মধ্য দিয়ে তা যুগে যুগে সত্য হয়ে উঠেছে। একে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কি বলা যায়? ভারতের ইতিহাসে যেন কোনো উত্থান-পতন নেই, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব নেই, মসৃণ পথ বেয়ে যেন যুগ থেকে যুগান্তরে তা প্রবাহিত। ইংরেজদের শাসনই শুধু যা কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে,

তাতেও ভারতের মর্মবাণী লুপ্ত হয়নি, হয়েছে অন্তঃসলিলা। ভারতের সেই মর্মবাণীকে উদ্ধার করার জন্যই সব সংগ্রাম—কিন্তু সে মর্মের বাণীটি কি? তা শ্রেণী-সাম্যের বাণী, সমঝওতার বাণী? অর্থাৎ, কি ছিল সেই ভারত বলে হাপুস নয়নে কাঁদতে হবে, জওহরলাল আবিষ্কৃত প্রেতাত্মার প্রতিষ্ঠার জন্যই? অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভারত সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়—মার্কসবাদ এদেশে অচল?

ইতিহাসের এই বুর্জোয়া বিকৃতির পুংখানুপুংখ জবাব কমরেড ডাঙ্গের বই। কমরেড ডাঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং প্রধানত রামায়ণ-মহাভারত বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, ভারতেতিহাসের বুর্জোয়া ভাষ্যে আর যাই থাক ইতিহাস নেই। ভারতেতিহাসও আদিম সমাজবাদ, মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতন্ত্র—এই সব পরিচিত পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছে—এই অগ্রসরের ধারাটিও অব্যাহত নয়। সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তা উৎক্রান্ত হয়েছে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে। ভারতের মর্মবাণীও তাই শাশ্বত নয়—রূপান্তরিত হয়েছে তা যুগে যুগে, রূপান্তরিত হচ্ছে তা আজও। সেই রূপান্তরিত মর্মবাণী আজ সমাজবাদ। সুতরাং নৃত্যনাট্য 'ভারতের মর্মবাণী' আসলে জওহরলাল প্যাটেলের মর্মকথা, বিড়লা গোয়েঙ্কার বাণী—ভারতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

এই সমস্ত "শিল্পসৃষ্টি" নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে পরিবেশন করলেই কি সব দোষ খণ্ডিত হয়ে যেত? বরং ফল উলটোই হতো—শ্রমিক-কৃষকের সুস্থ শ্রেণী-চেতনাকে তা কলুষিত করত। সে দিক থেকে এই না দেখানটাকে শাপে বরই বলতে হবে।

গণনাট্য সংঘের 'দুর্বলতা' সম্পর্কে যার ধারণা এরূপ—তার উপস্থাপিত কর্মসূচী যে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুরপতিবাবু যে তিনদফা কর্মসূচী উপস্থিত করেছেন তার মোদ্দা কথা এই যে, ভবিষ্যতে 'সুপরিকল্পিত' (?) ভাবে এবং অধিকাংশ অনুষ্ঠানই শ্রমিকদের মধ্যে করতে হবে, যেখানে গণনাট্য সংঘ অনুষ্ঠান করবে সেখানে শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে—সেখানকার কোনো 'একক প্রতিভা'কে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এই শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির সঙ্গে বসে একসঙ্গে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার জন্য সব সময় নজর দিতে হবে। যাত্রার দল, কবি গান, কাজরী ইত্যাদি গানের দলকে সংঘের মধ্যে আনার জন্য সংগঠক প্রেরণ করতে হবে। এবং জনতার জীবন

থেকে 'নিরলসভাবে' শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই হলো সুরপতিবাবুর পাল্টা 'কর্মসূচী'।

অর্থাৎ তিনি অনুষ্ঠান করবেন শ্রমিকদের মধ্যে—শ্রমিকদের নিয়ে নয়। শিল্প রচনার ব্যাপারে তিনি গণপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করবেন না—গণপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু তাঁদের লোক ধরে দেবে। যাত্রা দল, কবিয়াল ইত্যাদির মধ্যেই তিনি 'নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার' সম্ভাবনা খুঁজবেন—আন্দোলনের মধ্যে নয়, 'নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে নয়।' জনসাধারণের জীবন থেকে তিনি নিরলস ভাবে শিক্ষা নেবেন (অবশ্য দূরে থেকে—স্টুডিওতে বসে)—এটুকু 'কনশেসন' তিনি মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে দিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু এ 'কনশেসন' দেওয়াও যে আসলে তাঁর অভিপ্রেত নয়—নিচের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন:

"ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্বন্ধে তিনি (মৃত্যুঞ্জয়বাবু) বলেছেন যে, 'শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে যেতে হবে,' 'গণনাট্য সংঘে শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্ব গড়তে হবে,' 'রক্তের স্বাক্ষরে যে সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হবে', 'প্রতিটি শোষিত মানুষের জীবন ও লড়াইকে মূর্ত করে প্রতিক্রিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও', প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে' ইত্যাদি। কথাগুলি বড়ই অনির্দিষ্ট ও এ ধরনের কথা আমরা বহুবার শুনেছি। কথাগুলি অনেকটা গ্রামে ফিরে যাও বা 'গো ব্যাক টু দি পিপল'-এর মতন।"

দুর্ভাগ্য সুরপতিবাবুর যে, মার্কসবাদটাই একশ' বছরের পুরনো—বহু শতবার তা শুনতে হচ্ছে। সুরপতিবাবুর আরও দুর্ভাগ্য যে, গণসংস্কৃতি রচনার পথ এইটাই। দূরে বসে জনতার জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় না—তার জন্য শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সারিক হতে হয়, তাদের প্রতিদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হয়। গণসংস্কৃতি রচনার স্থান স্টুডিও নয়—লড়াইয়ের ময়দান।

এলাহাবাদ সম্মেলনে গণনাট্য সংঘ এই সঠিক কর্মসূচীই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন:

...প্রত্যেকটি (গণনাট্য আন্দোলনের) কর্মী হবে সংগ্রামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক সৈনিক, আর হতে হবে বৃহত্তর লড়াইয়েরও সৈনিক।

হাঁ, এইটাই সত্যকারের গণসংস্কৃতি রচনার পথ। গণসংস্কৃতি রচনা নিভৃত

সাধনা নয়—সে সংস্কৃতি রচিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে, বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর। আর এই চেতনাই দিয়েছে 'লোকনাট্যকে' ইস্পাতের তীক্ষ্ণতা। প্রবন্ধ কবিতা থেকে পত্রিকাপ্রসঙ্গ সর্বত্রই রয়েছে এই সংগ্রামশীল চেতনার ছাপ। আর তাই তো, 'লোকনাট্যে'র লোককবি সহজ কথাকে সহজ করেই বলতে পেরেছেন :

নির্বিচারে নরনারী ছাত্র ছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

বিষ্ণু দের মতো তথাকথিত 'ভদ্র' কবিরা রচনা করুনতো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি! কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদেরা এই প্রাণশক্তি?

—:o:—